KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : নীড় প্রকাশন
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৮/২ ৫৮/৩ ৫৮/৪	Year of Publication : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫ কার্তিক-পৌষ ১৪০৫ মাঘ-চৈত্র ১৪০৫
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ২
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫

বাঙালি মুসলমান আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে ভুগেছে দীর্ঘকাল। তাদের এই সঙ্কটাবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে ভাষাব্যবহারের প্রশ্নেও। বাংলাভাষায় আরবি ফারসি শব্দব্যবহারের বাহুল্য থাকবে নাকি ভাষাবিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম মেনে নেওয়া হবে—সঙ্কট দেখা দেয় এই প্রশ্নে। শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যেসব বাঁক পেরিয়ে বাঙালি মুসলমান আত্মস্থ হয় সেই বাঁকগুলিকে অসামান্য দক্ষতায় চিহ্নিত করেছেন ড. অশ্রুকুমার সিকদার।

জন্মশতবর্ষে কাজী নজরুল ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা, তাঁর 'চিরত্ব', তাঁর 'উচ্চারণের ধ্রুবত্ব' ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে এই কবিকে 'আবহমান বাংলার লোকায়ত ধারার প্রতিভূ' হিসাবে চিহ্নিত করে বাংলাসাহিত্যে তাঁর ঠিকানা নির্ধারণ করেছেন ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ।

বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষিতে নজরুলের ভূমিকার মূল্যায়ন করেছেন ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ নিয়ে নতুন তথ্য হাজির করেছেন গোপালচন্দ্র রায়।

'বাসমতীর উপাখ্যান' অবলম্বনে ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্যগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। এই কবি-ঔপন্যাসিকের জন্মশতবর্ষে এটি বিশেষ রচনা।

সদ্যপ্রয়াতা গৌরী আইয়ুব স্মরণে নিবন্ধ লিখেছেন অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ), শঙ্খ ঘোষ, ডাঃ কামাল হোসেন প্রমুখ।

গৌরী আইয়ুবের অপ্রকাশিত রচনা 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি'।

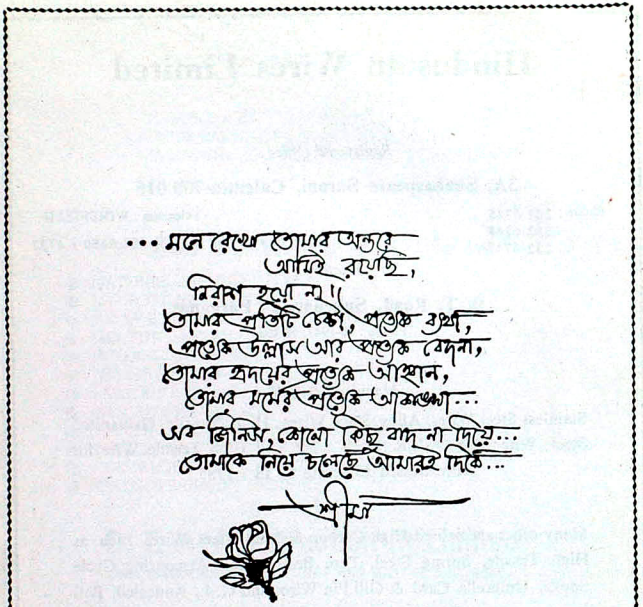

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ২
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৫

■ বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় ও ভাষা-দ্বন্দ্ব	অশ্রুকুমার সিকদার	৮৭
■ রোদ ওঠার পর	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৯২
মাধবীকে বর্ণনা	সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	৯৩
আমাদের মুদ্রাদোষ	বাসুদেব দেব	৯৪
কেন দেব ফুল	দেবী রায়	৯৫
শিল্প	মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৯৬
দৃশ্যপট কলকাতায় মধ্যরাত্রি	দীপংকর রায়	৯৭
ভুল পিপাসায় আমি গ্রাস করি	সন্তোষকুমার মাজী	৯৮
আলোক	সুশান্ত মুখোপাধ্যায়	৯৯
■ নজরুলের ঠিকানা	জ্যোতির্ময় ঘোষ	১০০
■ বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষিতে নজরুল-বিচার	শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	১০৫
■ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ	গোপালচন্দ্র রায়	১১৪
■ শান্তিনিকেতনের দিনগুলি	গৌরী আইয়ুব	১২২
■ ওই দেখা যায় ভুবনডাঙা	লীনা গঙ্গোপাধ্যায়	১২৯
জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য		
■ নিউইয়র্ক (দফতর আর ধিক্কার)	ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা / দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৪
■ বাসমতীর উপাখ্যান	আনন্দ ঘোষ হাজরা	১৩৬
গ্রন্থসমালোচনা		১৪৩
সুধীর চক্রবর্তী ■ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ■ ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ■ রত্না বসু ■ রণেন্দ্রনাথ দেব ■ মালবিকা সেনগুপ্ত ■ শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়		
চলচ্চিত্র		
■ দহন — ভাবনোর মতো ছবি	হাফিজুর রহমান	১৫৬
স্মরণে		
■ গৌরী আইয়ুব	অমিতাভ চৌধুরী	১৫৮
■ মহিমময়ী পরমাত্মীয়া	গৌরী আইয়ুব	১৬২
■ আত্মবিশ্বাসে সহজ	শঙ্খ ঘোষ	১৬৪
■ গৌরীদিকে যেমন বুঝেছি	আবদুর রউফ	১৬৫
■ গৌরী আইয়ুব : এক অনন্য ব্যক্তিত্ব	কামাল হোসেন	১৬৭

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত,
অক্ষর বিন্যাসে র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত
শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত
দূরভাষ : ২৭-৩৭৭০
সম্পাদক : আবদুর রউফ

Philips, Siemens, Siemens Matsushita, Tatas
Reliance, Helios, GEC Alsthom, Dun & Bradstreet
Price Waterhouse, Gestetner, Simoco, Modi Telstra,
RPG Sprint, IBM, HCL-HP, Sema, Apple, Telequartz

The Key Players are in action

In West Bengal

Today electronics majors from India and the world crowd the planned infrastructure of Saltlec, India's only fully integrated electronics complex in Calcutta. With a modular, walk-in, Standard Design Factory and an in-home, modern, all world telecommunication network run by Videsh Sanchar Nigam Ltd (VSNL). With several test houses of international standard, an Indo-German Vocational Training Centre for Electronic Test Engineering (CETE), a Software Technology Park. A future compatible infrastructure for IT - Infinity, the Intelligent City is coming up. The work on the first phase of Infinity, Think Tank Towers, is progressing as scheduled. Work on many more such facilities are commencing shortly. Training centres, finishing schools and new technical institutes are coming up with special emphasis. Exclusive electronic complexes are coming up in various districts of the state.

All of these have made Webel the leading electronics industry development agency in India – a resource base for the country and beyond. Today West Bengal is the choice of key electronics companies from across the globe.

Webel West Bengal Electronics Industry Development Corporation Limited
Webel Bhavan, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Bidhannagar, Calcutta 700 091, India.
Phone : 91-33-357 1710/7565/8188/1740 Fax : 91-33-357 1739/1708
e-mail: webel@giascl01.vsnl.net.in Internet: http: //www.webel.com

PARICHAY/WL315

বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় ও ভাষা-দ্বন্দ্ব

অশ্রুকুমার সিকদার

বাংলায় মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। তাঁরা সংস্কৃত জানতেন না, সংস্কৃতে নিবদ্ধ কাহিনী শোনবার আগ্রহে তাঁরা অনুবাদকদের উৎসাহ দিতেন। রুকনুদ্দিন বারবক শাহ মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সুলতান আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ শ্রীধর ব্রাহ্মণকে দিয়ে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়েছিলেন। পরাগল খাঁ মহাভারতের অনুবাদ করান। ছত্র-সিংহাসনধারী হুসেন শাহের দরবারে 'পণ্ডিত অউ বুধবন্ত সয়ানা / পঢ়ে পুরাণ অরথ সব জানা।' বাংলায় হিন্দু লেখকদের পাশাপাশি কাব্য লিখেছিলেন দৌলত কাজী এবং আলাওলের মতো কবি। ইসলাম ধর্মপ্রচারক আদি ইমামদের যুদ্ধজয় ও আত্মবিবাদের কাহিনী নিয়ে বাংলায় লেখা হয়েছিল জঙ্গনামা। একদিকে যারা সংস্কৃত জানে না তাদের জন্য, অন্যদিকে যারা আরবি জানে না তাদের জন্যও বাংলায় হয়েছে কাব্যচর্চা শাস্ত্রচর্চা। তাই বাঙালি মুসলমান কবি লিখেছেন,

হিন্দুস্থানে লোক সবে না বুঝে কিতাব
না বুঝিয়া না শুনিয়া নিত্য করে পাপ।
তে-কাজে সংক্ষিপ্ত করি পাঁঞ্চালি রচিলু
ভালমতে পাপপুণ্য কিছু না জানিলুঁ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা 'কিফায়িতুল মুসল্লীন' গ্রন্থে শেখ মুত্তালিব লিখেছেন,

আরবিতে সকলে না বুঝে ভালমন্দ।
তেকারণে দেশিভাষে রচিনু প্রবন্ধ॥
মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলু।
এই পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানলু॥

বাংলা ভাষার প্রতি আসক্তিবশত পাপ হতে পারে এমন সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই কবিরা দেবভাষা আরবিতে নিবদ্ধ শাস্ত্রকথাকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন। কবি সৈয়দ সুলতান লিখেছিলেন,

বঙ্গদেশী সকলেরে কিরূপে বুঝাইব।
বাখানি আরব ভাষা এ বুঝাইতে নারিব॥
যারে যেই ভাষে প্রভু করিছে সৃজন।
সেই ভাষ তাহার অমূল্য সেই ধন॥

সুতরাং কবি বদিউদ্দিনের কথা মতো, 'দিন ইসলামের কথা... দেশীভাষে রচিলে বুঝিবে সর্বজন ', সেই কারণেই শুধু নয়, যার যেই ভাষা 'সেই ভাষা তাহার অমূল্য সেই ধন ', এই কারণেও এইসব কবি বাংলায় শাস্ত্রচর্চা করেছেন, কাব্য লিখেছেন। তাই কবি হাজী মুহম্মদ বলেছিলেন 'দেশী ভাষা দেখি মনে না করিও ক্ষীণ।' ঘৃণা তো করেনই নি, বরং এই ভাষায় সাদরে লেখা হয়েছে পীরমাহাত্ম্যের কাব্য, লায়লা-মজনুর প্রেমকাহিনী। শাহ মুহম্মদ সগীর লিখেছেন ইউসুফ-জুলেখার কাহিনী। সৈয়দ মুর্তজা, শাহ আকবর, নাসির মাহমুদ, গরিবুল্লাহ লিখেছিলেন বৈষ্ণব পদাবলী।

এইসব মুসলমান কবি বাংলায় কাব্য লিখেছেন, আবার কবিকঙ্কন চণ্ডীতে পাচ্ছি মুসলমান সমাজ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ বর্ণনা।

ফজর সময়ে উঠি   বিছায়া লোহিত পাটি,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
সোলেমানি মালা ধরে,   জপে পীরে পেগম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাজ॥
দশ বিশ বেরাদরে   বসিয়া বিচার করে
অনুদিন পড়য়ে কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে   পীরের শিরনি বাঁটে
সাঁজে বাজে দগড় নিশান॥

আচার-বিচারের ভিন্নতা সত্ত্বেও হিন্দু আর মুসলমানের ধর্মমত যে মূলত এক এমন কথা বলতে পারেন ভারতচন্দ্র। 'ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ' আর কোরাণ-ও 'ঈশ্বরের বাক্য'। ভারতচন্দ্রের মতো অসামান্য গুণী কবি বাঙালি মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত বিশিষ্ট শব্দাবলী অবলীলাক্রমে ব্যবহার করতে পারতেন। কারণ ওই কালপর্বে রাজভাষা ফারসি জানতেন উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজেরও মানুষ। ভারতচন্দ্র লিখেছেন,

এখানে রহিল গীত পালা হৈল সায়
আল্লা আল্লা বল ভাই দিন বয়া যায়।
আল্লাতালা সালামৎ রাখিবে বাদশারে
সের সালামৎ রাখ বাদশার উজিরে।
দোজখ আজব হৈতে জরাও করতারে
ইমান বজায় রাখ মোমিন সবারে।

বাঙালি মুসলমান কবিদের রচনায় মধ্যযুগে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের বাড়াবাড়ি কখনও যে হয়নি তা নয়। যেমন আমরা এমন রচনাও পাচ্ছি,

সের আলি ফতেমা বন্দো একিদ করিয়া
হাচেন হোছেন পেয়দা হৈল যাহার লাগিয়া।
রছুলের চারি ইয়ার বন্দো শত শত
চারি দহ ইমামের নাম লব কত।
এবরাহি খলিলের পায়ে করি নিবেদন
বেটারে করবানি দিল দীনের কারণ॥

সুনীতিকুমারের হিসাব তুলে আনিসুজ্জামান দেখিয়েছেন, "যেখানে বাঙালি মুসলমান পরিবারে কথোপকথনের ক্ষেত্রে শতকরা পনেরো ভাগের বেশি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার হয় না, সেখানে গরিবুল্লাহ্-র 'আমির হামজা'-য় প্রায় বত্রিশ ভাগ বিদেশি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।"

কিন্তু এইসব আতিশয্য ব্যতিক্রম। যেমন বাঙালি মুসলমান কবিরা বাংলার সঙ্গে আরবি-ফারসির কিছু মিশ্রণ ঘটিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, তেমনই কবিকঙ্কন এবং রায়গুণাকরের মতো কবি প্রয়োজনে ওই জাতীয় মিশ্রণ ঘটাতে দ্বিধা করেননি, ব্যবহার করেছেন 'যাবনী মিশাল' ভাষা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বহুকাল মুসলমানের সংস্রবে থাকাতে বাংলা ভাষাও অনেক পারসি শব্দ এবং কিছু কিছু আরবিও স্বভাবতই গ্রহণ করেছে। বস্তুত বাংলা ভাষা যে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আপন, তার স্বাভাবিক প্রমাণ ভাষার মধ্যে প্রচুর রয়েছে। যত বড় নিষ্ঠাবান হিঁদুই হোক না কেন ঘোরতর রাগারাগির দিনেও প্রতিদিনের ব্যবহারে রাশি-রাশি তৎসম ও তদ্ভব মুসলমানী শব্দ উচ্চারণ করতে তাদের কোন সংকোচ বোধ হয় না। এমনকি, সে-সকল শব্দের জায়গায় যদি সংস্কৃত প্রতিশব্দ চালানো যায় তাহলে পণ্ডিতী করা হচ্ছে বলে লোকে হাসবে। বাজারে এসে সহস্র টাকার নোট ভাঙানোর চেয়ে হাজার টাকার নোট ভাঙানো সহজ।" ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরব, তুর্কি, মোগল, আফগান বিজেতাদের প্রভাবে, পাণ্ডাপাট বসবাসের দরুন বাংলাভাষা আরবি-ফারসি শব্দ আত্মসাৎ করেছে; এইভাবে সংস্কৃতের তৎসম আর তদ্ভব শব্দ নিয়ে, দেশজ শব্দ নিয়ে, আরবি-ফারসি বেশ কিছু শব্দ নিয়ে বাংলা কাব্যের ভাষা নিজস্ব নিয়মে বিবর্তিত হচ্ছিল।

ইংরেজ-আক্রমণ ও ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা কাব্যের, বাংলা সাহিত্যের ভাষার বিবর্তনে স্বাভাবিক গতি খণ্ডিত হয়। ড. শহীদুল্লাহ লিখেছিলেন, "যদি পলাশীর ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যবিপর্যয় না ঘটিত তাহা হইলে এই পুথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।" অধ্যাপক শহীদুল্লাহ বাড়িয়ে বলেছেন। মুসলমানী পুথির ভাষা বাংলা বইয়ের ভাষা হত না, যাকে ভারতচন্দ্র 'যাবনী মিশাল' ভাষা বলেছেন, সেই ভাষা হয়ত হত। অর্থাৎ বর্তমানে বাংলায় আরবি-ফারসি শব্দ শতকরা যত ভাগ থাকে, তার চেয়ে বেশি থাকত। বাঙালি মুসলমান সমাজে যেসব উর্দু শব্দ স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হয় অথচ বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না, সেই সব শব্দের বেশ কিছু বাংলা সাহিত্যের ভাষার অঙ্গ হয়ে যেত। সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন, যত দিন ফারসি রাজভাষা ছিল তত দিন উচ্চবর্গীয় বর্ণহিন্দু অভিজাতদের ভাষাতেও ফারসির সংমিশ্রণ যথেষ্ট থাকত। কিন্তু ইংরেজ আমলের, মুদ্রণের যুগের বাংলাভাষা গড়ে উঠল ফোর্ট উইলিয়মের কলেজের পণ্ডিতদের হাতে। তাঁদের হাতে পড়ে বাংলায় ইতিপূর্বে নিত্য ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ, যাবনিক শব্দ বাংলা থেকে নির্বাসিত হল। বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন ঘটল। গড়ে উঠল যেন দুই রকমের বাংলা। উইলিয়ম কেরি ১৭৯৪ সালে সাটক্লিফকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, দুটো স্বতন্ত্র বাংলা ভাষা সারা দেশে কথিত হয়, 'the Bengali, spoken by the Brahmins and the higher Hindoos, and the Hindoostani spoken by the Musulmans and lower Hindoos; it is a mixture of Bengali and Persion." উচ্চবর্ণের হিন্দুর ব্যবহৃত বাংলাই হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্যের ভাষা। তা ছাড়া এই নতুন কালপর্বের বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠল ইংরেজি-শিক্ষিতের হাতে। ইংরেজ তাদের হাত থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে এই কারণে, ধর্মের হানি হতে পারে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, দারিদ্রের কারণে, বাঙালি মুসলমান ইংরেজি-চর্চায় পিছিয়ে থেকেছে। ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় যেহেতু গ্রহণ করল হিন্দুরা, আর ইংরেজি-জানাদের হাতেই যেহেতু গড়ে উঠল আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য, সেই কারণে মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক এলাকার বর্ণহিন্দুরাই হলেন এই বাংলা সাহিত্যের নির্মাতা। বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান সমাজের অনাগ্রহও এই পারিস্থিতির জন্য দায়ী। বাংলার প্রতি মুসলমান সমাজের এই অনাগ্রহের কারণ সবিস্তারে চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর The Bengali Muslims 1871–1906 গ্রন্থে। সেই অনাগ্রহের প্রধান কারণ এই সমাজের আশরফ আতরাফ বিভাজন। ১৮৭২ সালের জনগণনা অনুসারে মাত্র ১.৫২% ভাগ মুসলমান বহিরাগত আফগান বা মোগল অভিজাত বলে দাবি করেছে।

কিন্তু এই মুষ্টিমেয় উর্দুভাষী মুসলমানই ছিলেন মুসলিম সমাজের নেতা। এই আশরফদের বাংলা ভাষা কেন, বাঙালি মুসলমান সম্বন্ধেও ছিল নিঃসংকোচ ঘৃণা। তারা বাংলা ভাষাকে মুসলমানের উপযোগী ভাষা বলে মনে করত না, বাংলাভাষাকে মনে করত হিন্দুভাষা। বাংলাভাষী মুসলমানগণও একটু বিতশালী হয়ে উঠলে এই উর্দুভাষী আশরফদের অনুকরণ করত। 'অনুস্বার' কবিতা গুচ্ছের অন্তর্গত 'উর্দু বনাম বাংলা' কবিতায় এই উচ্চবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের স্বরূপ ফরক্কর আহমদ চমৎকারভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন।

দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাতে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।

মুসলমান সমাজের শুদ্ধি আন্দোলনও এই অবস্থার জন্য দায়ী। এইসব শুদ্ধি ও সংস্কার আন্দোলনের আগে নসিহৎনামা বাংলা ভাষায় লেখায় কোনও দ্বিধা ছিল না। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে পরবর্তীকালে মনে করা হল বাংলা অন্-ইসলামিক ভাষা, সুতরাং বর্জনীয়। ফলে শুধু শহরে আসরফরাই বাংলা-বিরোধী ছিল না, গ্রামাঞ্চলের মৌলবীরাও অন্-ইসলামিক বলে বাংলা ভাষার বিরোধী ছিল। মীর মোশারফ্ হোসেন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, বাংলা শেখানো হত গুরুমশাইয়ের পাঠশালায়। মৌলবিসাহেব বাংলা লিখতে জানতেন না, তিনি বাংলা শেখা ব্যাপারটিকেই ঘৃণার্হ মনে করতেন। ময়দান থেকে এই সব কারণে মুসলমান সমাজ সরে গেল, ফলে ইংরেজি-জানা হিন্দুরা পুরো বাংলা সাহিত্য হিন্দুমীয় অনুষঙ্গের দ্বারা আচ্ছন্ন হল, আর যতই হিন্দুধর্মীয় অনুষঙ্গ, রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্য রচিত হল ততই বাঙালি মুসলমান বাংলা সাহিত্যকে বিজাতীয় মনে করতে আরম্ভ করল। তাই বলা হতে পারল, "এই সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়, এর বিষয়বস্তুও মুসলমানী নয়, এবং ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।" একটা সময়ে স্কুল-পাঠ্য সাড়ে তিনশো বইয়ের মধ্যে মাত্র দুটি ছিল মুসলমানরচিত। মৌলবি আবদুল করিম এমন একটিও বাংলা পাঠ্যপুস্তক পাননি যা নিশ্চিন্তভাবে তরুণ মুসলমান ছাত্রের হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে। কেরি-কথিত ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুর ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় সাহিত্যের মূলধারাটি গড়ে উঠল, আর দ্বিতীয় ধারাটি যেটি বাংলা ও ফারসির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল সেটি সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হয়ে যেন মাটির তলায় আশ্রয় নিল।

যেন মাটির তলায় বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি হল, 'মুসলমানী বাংলা' (জেমস লঙ), 'ইসলামি বাংলা' (সুকুমার সেন), 'মিশ্রভাষা' (আনিসুজ্জামান)-য় লেখা পুথি সাহিত্য। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ফারসি আর শাসনকার্যের ভাষা না থাকায় আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি বন্ধ হল, 'উপরন্তু স্বল্প পরিচিত আরবি-ফারসি শব্দের নিষ্কাশন শুরু হল।' উনবিংশ শতাব্দীতে এই পুথি-সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের ভাষার সংস্কৃতায়নের প্রতিক্রিয়ায়। সুনীতিকুমার চমৎকারভাবে লিখেছিলেন, 'It is the Maulavi's reply to the Pandit's sadhubhasa...' এই মিশ্র ভাষার সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য অপরিচিত আরবি-ফারসি শব্দের বাহুল্য। এই সাহিত্য সমকালীন বিমুখ এবং বিষয়ের দিক থেকে হিন্দু দেবদেবীর তুলনায় মুসলিম পীর-পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পুথিসাহিত্যের লক্ষ্য। লায়লা-মজনুর প্রেমকাহিনীতে পাই,

কিছু নাহি কহা যায় তকদিরের বাতে।
নহিবের লেখা যাহা কে পারে চিনিতে॥
এই যে ফরজন্দ পয়দা হৈল আপনাকে।
আনাকে ছাদকে রবে না যাবে ফাছেকে॥

নবীকাহিনীর শাস্ত্রকথায় পাই,

মুনশি রেজাউল্লা নামে বড় কবিকার।
পহেলা জেলেদ কেচ্ছা সায়েরি তাহার॥
আউল জেলেদ যিনি সায়েরি করিয়া।
জেন্নাত নছিব হৈল ওফাত পাইয়া॥

এই সব দোভাষী বা মিশ্রভাষার পুথিতে যেমন ইউসুফ-জোলেখা, লায়লা-মজনুর প্রেমকথা পাই, পাই 'আমীর হামজা', 'জঙ্গনামা'-য় কাফের দলনকারী মুসলিম বীরদের কাল্পনিক কাহিনী, পাই ইসলামের ধর্ম ইতিহাস ও নবীদের জীবনকথা, তেমনই পাই কেলুয়া সুন্দরী, বেহুলা-লখিন্দর, সত্যপীরের কাহিনী। এই দোভাষী বা মিশ্র ভাষার পুথিসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের মূলধারার বাইরেই থেকে গেছে। একবার মাত্র যেন চকিতে ছাই সোনাভান, জৈগুন বিবির কেচ্ছা, গাজী-কালু, আলেফ-লায়লার পুথি সাহিত্য ধৃত কাহিনী প্রভাবিত করেছিল অবনীন্দ্রনাথকে, যখন তিনি নিজস্ব পুথি সাহিত্য লেখায় মেতে উঠেছিলেন। "বাইরের চেহারায় নয়, গল্পে নয়, এমনকি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতাতেও নয় — ইসলামি পুথিগুলি অবনীন্দ্রনাথকে সাহায্য করছিল কেবল এইখানে, এই কল্পনার বাঁধনকে আলগা করে দেবার আয়োজনে।"

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলাভাষার সংস্কৃতায়নের ফলে এবং সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে হিন্দুত্বের প্রকোপে বাঙালি মুসলমানের মনে সংশয় জন্মিয়েছিল বাংলা আদৌ বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কি না। ১৩১০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'নবনূর' পত্রিকায় ঘোষণা করা হয়েছিল 'বাঙ্গালাভাষা হিন্দুদিগের ভাষা।' 'আমার সংসার জীবন' রচয়িতা ইবন মাজুদ্দিন আহমেদের

নিজস্ব ভাষা, একটু অসতর্ক হলেই, বেশ সংস্কৃত প্রভাবিত, কিন্তু তিনিও লিখেছিলেন, মুতিচাদর পরিহিত মুসলমান যেমন, তেমনই তৎসম শব্দবহুল বাংলা সমান ঘৃণার্হ। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমেদ লিখেছিলেন, "বাংলাদেশের মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে।" এমন ভাবনা কতদূর পর্যন্ত মুসলমান সমাজের মনে শিকড় গেড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে, রবীন্দ্রনাথকে সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে তাঁকে যে অভিনন্দনপত্র দেবার প্রস্তাব হয় সেটা কোন ভাষায় লেখা হবে সেই নিয়ে বিতর্কে। বিবরণটি পাওয়া যাবে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ'-এর প্রথম খণ্ডে। মানপত্র বাংলায় না ইংরেজিতে লেখা হবে তা নিয়ে বাদানুবাদ হয়। জনৈক মি. রফিক উর্দুতে অভিনন্দনপত্র লেখা উচিত বলে জানান। তিনি মনে করেন "কবিবরকে বাঙ্গলায় মানপত্র দেওয়া হইলে উহা সম্পদ্রায় বিশেষের মানপত্র বলিয়াই বিবেচিত হইবে।"

কিন্তু বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরও ছিল। 'মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র' সংকলনে আনিসুজ্জামান সেই সব বিরোধী মতও তুলে দিয়েছেন। কেউ-কেউ আলংকারিক প্রশ্নের ভঙ্গিতে মত জানিয়েছেন নিজের, "বঙ্গভাষা বাতীত বঙ্গীয় মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে?" অন্যেরা সরাসরি সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, "হউক হিন্দুর ধর্ম ভিন্ন, আর মুসলমানের ধর্ম অন্য, কিন্তু জন্মভূমিগত ও ভাষাগত হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক।" নিদ্রিত না থেকে বাংলা ভাষার সেবায় মুসলমানদের নিয়োজিত হওয়া উচিত বলে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কোনও কোনও পত্রিকায়। "মুসলমানগণ বাদশাহী জাত, উর্দু-ফারসিতে কথা না বলিলে সম্মানের লাঘব হয়।" এই জাতীয় মনোভাবকে আক্রমণ করেছেন 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় আবদুল হক চৌধুরী। একই ভাবে 'বাসনা' পত্রিকায় হামেদ আলী লিখেছিলেন, "আমাদের অনেকের মোহ ছুটে নাই। তাঁহারা বাংলার বাঁশবন ও আম্রকাননের মধ্যস্থিত পর্ণকুটিরে নিদ্রা যাইয়া এখনও বোগদাদ, বোখারা, কাবুল, কান্দাহারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। কেহ-কেহ আবার বাঙ্গালার পরিবর্তে উর্দুকে মাতৃভাষা করিবার মোহে বিভোর।" সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী লিখেছিলেন, "মুসলমানের আদব-কায়দা, ধর্ম ও সম্পর্কসূচক কয়েকটি শব্দ ত্যাগ করিলে মুসলমানের কথিত বাংলাও যা, হিন্দুরও তাই; যা কিছু প্রভেদ কৃত্রিম ভাষায়, মাতৃভাষায় নহে...।" 'কোহিনূর' পত্রিকার মাঘ ১৩২২ সংখ্যায় 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে এয়াকুব আলী চৌধুরী লিখেছিলেন, "বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গলা ইহা দিনের আলোর মতো সত্য। ...ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানীর প্রতিষ্ঠা করা লক্ষগুণে প্রয়োজন।" ১৩২৩ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা 'আল্ এসলাম' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লেখেন, "জীবিতা বাংলাকে মৃতা মনে করিয়া উর্দুর চাদরে ঢাকিয়া রাখিতে যতই চেষ্টা হউক না কেন বাংলা উর্দুর চাদর গা ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া যখন উঠিবে তখন তাহাকে চাপিয়া রাখা যাইবে না।"

গরিষ্ঠসংখ্যক বাঙালি মুসলমান নামে-মাত্র হিন্দু থেকে, অথবা নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে বৌদ্ধধর্মে, আবার বৌদ্ধধর্ম থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের উপর উর্দু চাপানো অসম্ভব ছিল। ভাষাগত হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যখন এক, তখন রাজনৈতিক কারণে ভাষাগত ভেদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হয় আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির অঙ্গ হিসাবে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে। অভিজাত আশরফ মুসলমানেরা বাংলাকে অবজ্ঞা করত, তাদের মতো রঙ্গস আদমি উর্দুকেই নিজস্ব জবান বলে মনে করত। কিন্তু বাংলাভাষী গরিষ্ঠ সংখ্যক মুসলমানের সমর্থন ব্যতিরেকে এই মুষ্টিমেয়ের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। তাই কবি যথা নিম গেলে মুদিয়া নয়ন, অন্যোপায় হয়ে মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাংলাকে মেনে নিল। আর মোল্লারা বাংলা ব্যবহার করল বাংলাপ্রীতির জন্য নয়, মুসলিম সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের অনন্যোপায় পন্থা হিসাবে।

> এতেক বাঙ্গালাদেশে আমাদের জন্ম।
> আরবি ফারসি সবে না জানে মরম।
> তে কারণে বাঙ্গলায় লিখিনু কালাম।
> বুঝিয়া দিনের কাম করহে এহলাম...
> বাঙ্গালাতে সিখি কাম করহে দিনের।
> কোন মতে হক চিনি আল্লারছুলের।

শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মূলত কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের মহিমা প্রচারের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্যত মৌলবি-মোল্লাদের বাংলা ভাষাকেই আশ্রয় করতে হয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক দায়ে, ধর্মীয় নেতৃত্ব ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাকে মেনে নিলেন, কিন্তু সেই বাংলাকে করতে চাইলেন হিন্দুদের ব্যবহৃত, সংস্কৃতায়িত মূলধারার বাংলা থেকে, দোভাষী-মিশ্রভাষী পুথিসাহিত্যের আদলে, যথাসম্ভব পৃথক। হিন্দু আধিপত্যের বাইরে যেমন পৃথক ভূখণ্ড চাই, তেমনই সংস্কৃতায়িত বাংলার থেকে পৃথক এক অন্য চেহারার বাংলা ভাষা চাই। নবাব আবদুল লতিফ প্রস্তাব করেছিলেন, অন্যান্য ইসলামি ভাষার সঙ্গে যোগাযোগের অনিবার্য প্রয়োজনে উচ্চবর্গের মুসলমানদের জন্য উর্দু চাই, আর মুসলিম সাধারণের জন্য চাই হিন্দু পাঠশালায় শেখানো সংস্কৃতায়িত বাংলা ও বাঙালি মুসলমানের কথ্য বাংলার মধ্যবর্তী, 'আরবি-ফারসি শব্দের দ্বারা পরিশুদ্ধ' এক নতুন বাংলা। বেসরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি ১৮৭১ সালে সরকারি

উদ্যোগে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এক মুসলমানী বাংলা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সরকার মেনে নিয়েছিল বাংলাই বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা, কিন্তু সেই ভাষা হিন্দু বাঙালির বাংলা থেকে স্বতন্ত্র। ইসলামি বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই মুসলমানী বাংলা সৃষ্টির সরকারি উদ্যোগ সফল হয়নি, কারণ রফিউদ্দিন আহমেদ জানাচ্ছেন, "Government even considered the possibility of creating a Muslim language with Musalmani Bengali as its basis. But they had to give up because its cultivation was found to be disrespectable and unsophisticated."

নবাব আলি চৌধুরী ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য বিষয়ে মুসলমান সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাভাষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে। ভাষা-সংস্কার চেষ্টার একদিকে ছিল আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যা যথাসম্ভব বাড়ানো। হিন্দুয়ানী বাংলা ও মুসলমানী বাংলার মধ্যে যাদিকটা পার্থক্য আছে; শতকরা দশ থেকে পনেরো ভাগ আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলাই মুসলমান বাঙালি কথাবার্তায় ব্যবহার করে থাকে। আবার হিন্দুসমাজে ব্যবহৃত বাংলাতে, তুলনায় কম হলেও, অনেক আরবি-ফারসি শব্দ আত্মপরিচয় হারিয়ে একেবারে বাংলা হয়ে গিয়েছে। এই দুই ভাষার মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক কারণে ব্যবধান বাড়ানোর জন্য সমস্ত ঝোঁক গিয়ে পড়ল আরবি-ফারসি শব্দের অনুপাত বাড়ানোর দিকে। অন্যদিকে ধর্মধ্বজীদের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল 'Islamization of contents'। 'বাংলাদেশের ইতিহাসে'র তৃতীয় খণ্ডে মোহাম্মদ শাহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "সাহিত্যে এই প্রতিযোগিতার ফল হল সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব। একটি স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানেরা নিজেদের প্রয়োজনে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল।" ধর্মীয় প্রবোচনা ছিল, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভেদবুদ্ধি কাজ করছিল, সবই ঠিক, কিন্তু পুথিসাহিত্যের অনুকরণে এই ইসলামি বাংলাচর্চার পিছনে সংস্কৃতায়িত পণ্ডিতি বাংলাভাষার, হিন্দু ধর্মানুষঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটা ন্যায্য প্রতিক্রিয়াও যে ছিল সেটা ভুলে যাওয়া হয়। তাই 'শনিবারের চিঠি'তে হলধর ভড়ের ছদ্মনামে 'উদ্দেশ্যত প্রচারিণী সভা' নামে যে ব্যঙ্গরচনা প্রকাশিত হয় তাতে মুসলমান চরিত্রের মুখ দিয়ে বলানো হয়, "হিঁদুদের হাতে পড়ে বাংলা বাত একদম পয়মাল হয়ে গ্যাছে। আমি এই বাংলা লিংগুয়েজে উর্দু ও আরবি বাত ঢুকিয়ে এমন একটা চীজ বানাবো যে দুনিয়াশুদ্ধ লোক অবাক হয়ে যাবে।" তবে সন্দেহ নেই এই কৃত্রিমভাবে তৈরি ইসলামি বাংলা গড়ে তোলার প্রধান প্ররোচনা ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের, দ্বিজাতিতত্ত্বের। সাধারণ বাঙালি মুসলিমকে বোঝানো হয়েছিল এই কৃত্রিমভাবে তৈরি মুসলমানী বাংলাতে কথা বলা, লেখা এবং পড়া তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি প্রতিষ্ঠার অঙ্গ। হিন্দু আধিপত্যের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাবে মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি প্রতিষ্ঠার অঙ্গ হিসাবে, আরবি-ফারসি তথা উর্দু শব্দের অনুপাত বাড়িয়ে মুসলমানী বাংলাকে এক স্বতন্ত্র, প্রায়-অচেনা চেহারা দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিষজর্জর প্রাক-স্বাধীনতার কালপর্বে। উর্দু শব্দের অনুপাত বাড়িয়ে সংস্কৃতায়িত বাংলার হাত থেকে ভাষাগত স্বাধীনতা দাবি করা হয়েছিল। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, ১৯৫২-পরবর্তীকালে এই উর্দুর আধিপত্য থেকেই বাংলা ভাষার স্বাধীনতার দাবিতে পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, যার চূড়ান্ত পরিণাম হয়েছিল বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণায়। দীর্ঘদিনের ভাষাদ্বন্দ্বের সংকটময় পথ অতিক্রম করে বাঙালি মুসলমান আপন ভাষার মধ্য দিয়ে নিজের ঘরে ফিরেছিল। ভাষার মধ্য দিয়ে বাংলা দেশের এই আত্মপরিচয়ের আন্দোলন সমগ্র বাঙালি মুসলমান সমাজকেই আস্বস্থ করেছে। □

রোদ ওঠার পর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তিন দিন তিন রাত্তির ধরে
দুপুরকে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যাকে মিশকালো রাত বানিয়ে
কখনও ঝিরঝির আর কখনও ঝমঝম
বৃষ্টির পর
আকাশটা আজ সকালেই যে আবার
এমন করে হেসে উঠবে,
তা কেউ জানত?

কেউ কি জানত যে, পুকুরের জলে,
মাঠের ঘাসে, আর
গাছগাছালির পাতায় এইভাবে ফের
ঝিকিয়ে উঠবে
সকালবেলার রোদ্দুর?

আসলে, ওই যে ওরা হুড়মুড় করে রাস্তায় বেরিয়ে
এ ওকে দেখে এখন
একগাল হেসে বলছে, কেমন আছেন মশাই,
যদিও একই পাড়ায় থাকে, তবু
অ্যাদ্দিন পর্যন্ত ওরাও বোধহয়
কেউ কাউকে জানত না।

মাধবীকে বর্ণনা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

নীললোচন সাগরপল্লার পাশে এনে মাধবীকে দাঁড় করাই
তার দীর্ঘ এলোচুলে বেড়াতে এসেছে হাওয়া,
দু'বুকে শঙ্খের শৈলী, ফুঁ-দিলে তুলসীতলা আজও যাবে পাওয়া।
মাধবীকে বলি তুমি কোনও দিকে না তাকিয়ে — ওই
চিত্ররূপময় মেঘে বিহঙ্গবীক্ষণে চোখ রেখে দাঁড়াও
এসো তোমার তোমাকে আঁকি, যৌনগুলি ভিজিয়ে নাও
আমি চিহ্ন চাই, সাবলীল নারীক্ষেত অক্ষর ছাড়াই
বহুবার অশ্রু হয়ে ভ্রমণ করেছে চোখ, আমি চাই
মাধবীর পর্যালোচনায় যেন বর্ণ এগিয়ে আসে, অংগ নেবে বলে
আসে ঘুমভাঙা কুসুমনৃত্য, কুহুপাখির সঙ্গত সঙ্গীত জাগে
সূর্যের উজ্জ্বলে
একরকম আলো ভেঙে সাতটি তুখড় রঙ আমাদের বলে
চোখের দেখাকে শেষ দেখা ভাবা কখনও উচিত নয়
আমরা যে লোচনদাস, যে আমরা সমুদ্রকে বলি নীল
যে চোখ তন্ময়
বিপরীতরীতির শরীরে চট-জলদি সাক্ষর সাজিয়ে
বলি এই দেখো অক্ষর কবিতা হচ্ছে — যদিও তা নিয়ে
গন্ধ তুলব না, গন্ধ তো প্রকৃত অন্ধ, চিরকাল চোখ বুজে থাকে
শুধু অনুভব করা যায়, বুকের ভিতরে যখন এক ডাকপাখি ডাকে,
ওই পাখি বলে মাধবীকেও ছন্দে কবি করো
মোট নম্বর একশো, দেখি তুমি কত পেতে পারো।

আমাদের মুদ্রাদোষ

বাসুদেব দেব

তুমি কেবল উদ্দেশ্য খোঁজো অর্থ খোঁজো
এ-ও তোমার মুদ্রাদোষ যেমন শরীরের ব্যবহার যেমন ভালবাসা
সাদা অ্যাম্ব্যাসাডর গাড়ির ওপর ঝরে পড়ছে শহুরে কৃষ্ণচূড়া
এ কোনও পদ্যটদ্য নয় সম্পূর্ণ কাকতালীয়, কেবল দেখার চোখ
তোমার চশমা, মুদ্রাদোষ, এই জন্ম, এই সময়

এই যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল
কিছুক্ষণের এই কাছাকাছি থাকা...
প্লাস্টিকের কেনা ফুলও কখনও কখনও আশ্চর্য জীবন্ত মনে হয়
এসো একদিন, না কিছু খুঁজতে নয়, কাউকে খুঁজতে নয়

তবু তুমি ভাব উড়ে আসা ঘুড়িটা ঈশ্বরের অভিপ্রায়
এই সব আশ্চর্য ও চমকের রাংতার নীচে...হায়
তোমার রক্তমাংস, জায়মান জীবানু, এই জন্ম, এই সময়

কেন দেব ফুল

দেবী রায়

হাজার হাজার ভোটার খোলা আকাশের নীচে!

আশ্রয়স্থল বলতে আপাতত উঁচু বাঁধ,
নয়ত স্কুলবাড়ি...
ধানখেতের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই
সব এখন কোমর থেকে গলা, জলের তলায়!

কেউ কেউ আজই ভিটেয় পা রাখলেন, প্রথম!
—কেমন কেটেছে, দুঃস্বপ্নের দিনগুলি?
প্রথম নৌকোয়, তারপর স্কুলবাড়ির ছাদে...

সাহেবি মতে, খুব গ্রাম্ভারী শোনায়—
যখন শিরোমণি প্রভুরা সরজমিনে হেলিকপ্টারে
তদন্তে যাবেন, না পাঠাবেন ত্রাণসামগ্রী?

—কেন দেব ফুল, কী দুরাশায়?
—কেন পূজা সেই দেবতাকে!

শিল্প

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আমি ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করে ফুল ফোটাই।

এই ফুল চোখ জুড়ায় বুক জুড়ায়
আমার স্বপ্ন তবু ফুরায় না।

আমি ছেঁড়াখোঁড়া পৃথিবীতে শিখে নিয়েছি রিফু করার কৌশল।

আমার চোখ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে
ছেঁড়া কাঁথার সুষমা অসীমের গান গায়
সত্যিকার ভালবাসা কাকে বলে? জানিয়ে দেয়।
সব রঙের একটাই মানে
যাকে জানার কখনও শেষ নেই।

দৃশ্যপট কলকাতার মধ্যরাত্রি

দীপংকর রায়

ভীষণ বৃষ্টি থেমে গিয়ে এবার
রাত্রি ভাসিয়ে জ্যোৎস্না এসেছে।
কিন্তু তোমার তিন হাত ফুটপাথ
ভেসে গেছে আকাশের জলে আর চাঁদে।

তোমার হাড়ের ওপর মাংসাতার চামড়া
এবং তার ওপরে নাছোড়বান্দা কাঁথা
তোমার নাড়ির থেকেও ঢের বেশি ভেজা।
তোমার তিন হাত ফুটপাথে তোমার
কুড়িয়ে আনা ইঁটের ওপরে তোমার
কুড়িয়ে পাওয়া হাঁড়ি, টানা তিনদিন
তোমার স্মৃতির থেকেও শূন্য থেকে আজ
ভরে গেছে আকাশের জলে আর চাঁদে।

কঞ্চিতে টাঙানো তোমার এত প্রিয়
তিন হাত ছেঁড়া প্লাস্টিক টেনে ফেলে দিয়ে
ভীষণ ঘৃণায় সেটিকে মাড়িয়ে
তুমি উঠে দাঁড়ালে। পা দিয়ে উল্টে দিলে
তোমার কুড়িয়ে পাওয়া হাঁড়ি
জীবনের সব ঘৃণা একত্রিত করে।

তুমি দু' পা এগোলে নির্মম ফুটপাথে
কিন্তু বুড়ো মানুষ, কোথায় তুমি যাবে?

ভুল পিপাসায় আমি গ্রাস করি

সন্তোষকুমার মাজী

জলে শুদ্ধ ছায়া খেলা করে, খেলা করে রতি ও আরতি

জলের সন্ন্যাস দেখে জলেই তর্পণ করি, জলজ সম্পদে
জলের তৃষ্ণা শুধু জেগে থাকে, জলে থাকে নেশা
জলে অভিশাপ থাকে, জলে জন্ম, জলে এক নিবিড় তিয়াসা

প্রলয়ের শেষে থাকে জল, জলে থাকে মীন অবতার
জলে সৃষ্টি, অনাসৃষ্টি — জলময় প্রাণীর শরীর
জলে প্রাণ, জলে ত্রাণ, জলের সৌজন্যে এই সবুজ পৃথিবী
জলের তারুণ্য দেখো আকাশে বাতাসে, অর্বাচীন নীলে

দাও তবে নতজানু বোধ, জলময় কলতানে দোতারা বাজাব
জলের আগুন নিয়ে খেলা করে কোন আগন্তুক নয়ন সম্বল!

ভুল পিপাসায় আমি গ্রাস করি জলের নীলিমা, সূর্যতৃষ্ণা বাড়ে

আলোক

সুশান্ত মুখোপাধ্যায়

শতাব্দী শেষ হয়ে এল
আর গুঁড়ো গুঁড়ো নশ্বর জীবনের পৃথিবীতে
মোমবাতির শান্ত আলোয়
কেউ নিচু হয়ে লিখে নিচ্ছে
আমাদের প্রতিশ্রুতি ও পতন
উত্থান ও হাহাকার

আর মনীষীদের দীর্ঘশ্বাস জড়ানো কুয়াশায়
ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে শরশয্যা

দূরে কোথাও ভেসে উঠছে দু' একটা নীল জোনাকি

নজরুলের ঠিকানা

জ্যোতির্ময় ঘোষ

আবির্ভাবলগ্নেই সচকিত হয়েছে দেশকাল-পাত্র, এমন ব্যক্তিত্ব বিশ্বে বিরল নন, এমন বাঙালিও আমরা পেয়েছি। কিন্তু জীবদ্দশাতেই এবং প্রায় আবির্ভাবলগ্নেই কিংবদন্তি : এমন মানুষ সত্যিই ক'জন? আমাদের এই আলোচনার প্রসঙ্গ : সাহিত্য। বিশেষত, বাংলা সাহিত্য। আমরা তাই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করে দৃষ্টি সংহত করছি, বাংলা সাহিত্যসংসারের প্রতি। আধুনিক কালেই বাংলা সাহিত্য ব্যাপক বিশ্বপরিচিতি অর্জন করেছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বাগ্রগণ্য পুরুষ — অনুপুঙ্খ বিচারে — অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। সেই রবীন্দ্রনাথও কিন্তু ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির আগে পর্যন্ত দ্বিধাহীন ব্যাপক স্বীকৃতি পাননি। বস্তুত, প্রাক ১৯১৩ সালের রবীন্দ্রনাথ এবং ১৯১৩ পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভার বিকাশবৈচিত্র্যের বিচারে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বরূপেই প্রতিভাত।

জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তিরূপে শ্রুতকীর্তি সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব বাংলাভাষার প্রেক্ষিতে প্রাক রবীন্দ্রযুগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একজনকেই বলা যায় : তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রবীন্দ্র সমকালেই প্রথম-বিশ্বযুদ্ধের পরে ভালমতো বিচারে যে সময়টিকে আমরা রবীন্দ্রোত্তর যুগ হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিহ্নিত করতে পারি, সেই কালপর্বটিতে বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তি-পুরুষ কাজী নজরুল ইসলাম।

রবীন্দ্র বিচিত্র প্রতিভার ব্যাপ্তিতে অটল, প্রতিষ্ঠায় হিমালয় পর্বতমালার মতো। গভীরতার বিচারে রবীন্দ্র-শিল্প ও সাহিত্য মহাসাগর জাতীয়; নির্ভরতার ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ স্নিগ্ধ, শুভ্রজ্যোৎস্নার দিক থেকে মহাবনস্পতি তুল্য — কিন্তু এই সমস্তই তিলে-তিলে, বিন্দুতে-বিন্দুতে, পর্ব থেকে পর্বান্তরে আশি বছরের জীবনপ্রবাহের সামগ্রিক মহাব্যাপ্তির ফল পরিণাম। এমন সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি মহান প্রতিভা ক্রমাগ্রগতির মাধ্যমে 'রবীন্দ্রনাথ' হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিকাশের পথে কোথাও আকস্মিকতার চমক আমাদের আমূল কাঁপিয়ে দেয়। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, কীটস বা শেলীর বয়সে যদি রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হত, তাহলে রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে স্মরণীয় ঐশ্বর্য কী থাকত?

যখন নজরুলের কথা ভাবি, তখনও মনে না হয়ে পারে না, ১৩২৮ সালের ২২ পৌষ তারিখে 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি যেদিন প্রথম ছাপা হল, সেদিন নজরুলের (জ. ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬) বয়স ছিল বাইশ বছর। 'বিদ্রোহী' পরের মাসেই অর্থাৎ মাঘ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, অনেক পত্রপত্রিকাতে 'বিদ্রোহী' কবিতাটির পুনর্মুদ্রণের খবর পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় লেখা আর কোনও কবিতা নিয়ে অনুরূপ উন্মাদনা সৃষ্টির ঘটনা কি আমাদের মনে পড়ে?

এমন দাবি আমাদের নয় যে, এত কম বয়সে অথবা এর চেয়েও আরও উল্লেখযোগ্য কম বয়সে উল্লেখযোগ্য ভাল বা জরুরি কবিতা আর কেউ নজরুলের আগে বা পরে লেখেননি। হাতের কাছেই দৃষ্টান্ত হিসাবে আছেন সুভাষ-সুকান্ত। এবং গদ্যরচনার ক্ষেত্রে সোমেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কবিতায়, কথাসাহিত্যে, সমালোচনামূলক প্রবন্ধে এবং সর্বোপরি সঙ্গীত রচনায় উৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন রেখে গেছেন। তবু কেউ যা অর্জন করতে পারেননি, এমনকী রবীন্দ্রনাথও, একমাত্র নজরুলই তা পেরেছিলেন — তা হল এই একটিমাত্র কবিতা লিখবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু তাৎক্ষণিক নয়, কালোত্তীর্ণ খ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন।

এই কবিতা রচনার প্রায় আশি বছর পরে, এখনও নজরুল এই কবিতাটির শিরোনামের দ্বারাই উল্লিখিত ও চিহ্নিত হয়ে আছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে এই ঘটনার তুলনা মেলা ভার।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক তথ্যোল্লেখ এই সূত্রে অবান্তর হবে না। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) এবং বউ-ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩) প্রকাশিত হওয়ার পরে অতি তরুণ বয়সে যথাক্রমে একুশ ও বাইশ বছর বয়সের কবি-কথাশিল্পী সেদিনের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সস্নেহ অভিনন্দন লাভে চরিতার্থ হয়েছিলেন। উল্লেখ বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কোনও গ্রন্থ উৎসর্গ করেননি।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কবি তথা সাহিত্যিকদের এবং বিজ্ঞান ও রাজনীতির জগতে বিশিষ্ট কোনও কোনও ব্যক্তিত্বকে গ্রন্থ উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে কোনওরকম কার্পণ্য করেননি। তবু 'বিদ্রোহী' কবিতাটিতে নজরুল প্রতিভার এমন কোনও মৌলিকতা ও উৎকর্ষ বিশ্বকবিকে নিতান্ত অভিভূত করেছিল যে, স্বভাব-সংযত রবীন্দ্রনাথও তাঁর সেই পরিণত বয়সেও একমাসের মধ্যে একটি নতুন গ্রন্থ লিখে নজরুলকে উৎসর্গ করে নিজের অগণিত স্বজন-বন্ধুসহ তরুণ ভক্তদেরও অবাক করে দিলেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ও তরুণ সাহিত্যবন্ধুদের অনেকেই রীতিমতো মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন — কবি নজরুলকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পক্ষে বিরল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বরণ করে নেওয়ায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভক্ত ও পার্ষদদের মনোভাব অনুধাবন করেছিলেন। প্রসঙ্গটি তাঁদের কাছে উত্থাপনও করেছিলেন। নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরেও আসেননি।

অনুজ তরুণ কবি-লেখকদের মধ্যে যাঁদের মেধা ও মনন রবীন্দ্রনাথের কাছেও সম্ভ্রম উদ্রেককারী বলে মনে হয়েছিল, তাঁদের তিনি সাদর স্বীকৃতি জানালেও সম্ভবত নিজের উত্তরাধিকারীরূপে একমাত্র তরুণ নজরুলকেই স্বতঃস্ফূর্ত-স্নেহ-মমতা-দরদ ও ভালবাসাভরে বরণ করে নিয়েছিলেন।

বিনম্র চিত্তে স্মরণ করতে পারি, 'নন্দন' পত্রিকার ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-শ্রাবণ যুগ্ম ও শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত সুদীর্ঘ 'সাহিত্য-বিতর্কের নেপথ্যে' নামাঙ্কিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে নজরুলকে উৎসর্গীকৃত 'বসন্ত' নাটিকার সমাপ্তি-সঙ্গীতটিকে নজরুল প্রতিভার রবীন্দ্রকৃত সঠিকতম মূল্যায়ন রূপে উল্লেখ করেছিলাম। এই ধরনের আরও একটি রবীন্দ্রকৃত নজরুল-মূল্যায়ন আমরা পেয়ে যাই নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীটি থেকে। এই বাণীটিকে মুজফ্ফর আহমদ সর্বাগ্রে সঠিকভাবে 'রাজনীতিক আশীর্বাদ' — রূপে চিহ্নিত করে গেছেন।

'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রদত্ত আশীর্বাণীটে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ উচ্চারণ বলে পাঠক-সমালোচকগণের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু 'বসন্ত' নাটিকার সমাপ্তি সঙ্গীতটিও যে কবি ও রাজনৈতিক সংগঠক নজরুলের উদ্দেশেই রচিত, এই সত্যটি গভীরতর উপলব্ধি সাপেক্ষ। নজরুলসহ প্রগতি — পথিক সংগ্রামী তরুণদের রবীন্দ্রনাথ এখানে 'ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক'-রূপে আহ্বান করে লিখেছিলেন —

আয়রে সবে
প্রলয়জ্ঞানের মহোৎসবে

আসলে রবীন্দ্রসাহিত্যে 'বলাকা'-সহ 'সবুজপত্র' পর্বটির সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি না করতে পারলে কিছুতেই স্পষ্ট হবে না, কেন রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্রোহী'-র কবিকেই নিজের যথার্থ উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করলেন। 'পূরবী'র 'তপোভঙ্গ' কবিতায়ও আছে 'বিদ্রোহী নবীন ধীর স্থবিরের-শাসন-নাশন'-কে দ্বিধাহীন বরণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা। 'ঐকতান' কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ অখ্যাত জনের মর্মের বেদনাকে রূপদানের যোগ্য স্রষ্টাকে 'এসো কবি' বলে আহ্বান জানালেন।

সমকালের বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই স্পষ্ট হয় — কেন 'বিদ্রোহী' প্রকাশোত্তর বিশের দশক থেকে নজরুলকেই রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে 'পথিকৃৎ'-এর মর্যাদায় ভূষিত করলেন। একদিকে 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি', অন্যদিকে 'শনিবারের চিঠি' — কোনো গোষ্ঠীকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-সাহিত্য ও কর্মসাধনার সুযোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করতে পারেন না।

উল্লিখিত সমকালীন দুটি প্রধান সাহিত্যগোষ্ঠীর একটিকেও কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনঃপুত উত্তরসাধকরূপে গ্রহণ করতে পারেননি, তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অসাধ্য নয়, তবে দীর্ঘতর পরিসরসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে তাঁর পরবর্তী অভিভাবকস্বরূপ প্রমথ চৌধুরীকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন — 'সবুজপত্র'-এর প্রকাশনারম্ভ (১৯১৪) ছিল সেই অভিপ্রায়েরই রূপায়ন প্রচেষ্টা। সাময়িক ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথই স্বয়ং। 'সবুজপত্র' একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরিতে ভূমিকাও নিয়েছিল। যেমনটি চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু বছর সাতেকের সীমায় 'সবুজপত্র' সময়ের দাবি মিটিয়ে ক্রমশ প্রাক্তিক ও সাহিত্যিক বিশীর্ণতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব ও সেই বিপ্লবোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং শিল্পসাহিত্যে তার প্রতিবিম্বন একটি নবোদ্ভিন্ন চেতনায় রবীন্দ্রনাথের ক্রমিক উত্তরণ-সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। ১৯২০ সালের ৬ জানুয়ারি 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রকাশমাত্রই রবীন্দ্রনাথ চিনে নিতে পারলেন তাঁর বহু-প্রতীক্ষিত 'অখ্যাত জনের কবি'কে!

বস্তুত, অনেকের কাছে অস্বস্তিকর ও আপাত-অগ্রাহ্য মনে হলেও আমার বিবেচনায় রবীন্দ্রোত্তর যে তিনজন কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও কমবেশি প্রাণিত করেছিলেন তাঁরা হলেন : সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দ। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, অগ্রজ প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের দলিত ও ব্রাত্যবোধের

দ্বারা, নজরুল ইসলামের সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবী দর্শনের দ্বারা এবং জীবনানন্দের অশান্ত ও অস্থির আধুনিকতার দ্বারা কমবেশি প্রাণিত হয়েছিলেন।

তবু সমৃদ্ধ একজন রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক একজন জীবনানন্দ সত্ত্বেও নজরুল এখনও নজরুল। নজরুল বিগত আশি বৎসর ব্যাপী মন্ত্রের মতো নিত্য-উচ্চারিত হয়েও কেন এখনও নিঃশেষিত নন? কোথায় তাঁর প্রাণশক্তি? কোথায় তাঁর পথিকপ্রেমের চিরত্ব? কোথায় তাঁর উচ্চারণের ধ্রুবত্ব?

ভাষা ও সমাজ নিয়ে যাঁরা বিচ্ছিন্ন কেতাবিচর্চায় নিবেদিত অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ তাঁরা সম্ভবত দুটি বিষয়েই এমন অনেক নিগূঢ় সংবাদ রাখেন, যেগুলি তাঁদেরই একান্ত অনুশীলনের বিষয়। তাঁদের নিজস্ব ভাষা সকলের বোধগম্য না হতেও পারে। ভাষা আর সমাজ: দু'টি এলাকা জুড়েই যাঁদের কাজ, তাঁদের ভাষাও সর্বজনবোধ্য না হলেও বহুজনবোধ্য অন্তত। সেই 'বহু' জন, যাঁরা এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলেও কিছু কৌতূহল কিছু জিজ্ঞাসা পোষণ করেন।

ভাষা ও সমাজ বস্তুত বিচ্ছিন্ন চর্চার বিষয়ই নয়। কিন্তু সকলেই জানেন, কেতাবিচর্চার জগতে অনেক সময়েই বিচ্ছিন্ন নিরবয়ব প্রতীকিতা নিয়েও কারবার চলে।

ভাষা নিয়ে ভাবুকতা আছে এমন ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, ভাষা চারিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে বহু আবেদনময়। অনুভবের ভাষা, চিন্তার ভাষা, মুখের ভাষা, লেখার ভাষা: প্রক্রিয়া ও ব্যবহার-অনুসারে ভাষার নানা ধরন আছে।

কেননা, যেভাবে যা অনুভব করছি, গুছিয়ে চিন্তা করতে গেলেই তার অল্পস্বল্পটা, এমনকী তার চেয়েও বেশি পরিবর্তন ঘটে যায়, অন্তত চেহারাটা একই জায়গায় অটল থাকে না। অমর সেই কথাই (অর্থাৎ বক্তব্য) যখন মুখের ভাষায় অনুবাদ করি (একরকম অনুবাদই তো!), তার চেহারা-চরিত্র-ঝোঁক এবং এমনকী অর্থও শেষ পর্যন্ত বদলে যায়। সেই বদল অল্পও হতে পারে, হতে পারে বিস্তরও। অবশেষে লিখতে গিয়ে আরও একবার অনুবাদ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যেতে হল।

এইভাবে প্রথম অনুভব থেকে মুদ্রিত রচনাটি বেশ কয়েক ধাপ সরে গেল। কতটা আর কী ভাবে, তার অনুপুঙ্খ গবেষণা করতে পারেন একজন মনোবিজ্ঞানী। ব্যক্তিগত সাহিত্যপাঠও সাহিত্যসৃষ্টির মতোই প্রথমত 'ব্যক্তিগত' হলেও সাহিত্যের সম্যক আলোচনায় সাহিত্যবোধের পাশাপাশি ভাষা-ইতিহাস-দর্শন-সমাজবিজ্ঞান ছাড়া মনোবিজ্ঞানের ধারণাও জরুরি হয়ে ওঠে।

সাহিত্য-'পাঠের' প্রসঙ্গ এসেছে। 'ব্যক্তিগত' একান্ত-পাঠের কথাও। কিন্তু, সে-সমস্তই অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের দান। কেননা, মুদ্রণশিল্পের ব্যবহারিক বাস্তবতাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক অভিজ্ঞতা।

সাম্প্রতিক কবি এবং পাঠক-সমালোচক কবিতার সৃষ্টি ও আস্বাদনব্যাপারকে মুদ্রণশিল্পের বাইরের জিনিসরূপে সহসা ভাবতে না পারলেও প্রাক মুদ্রণ যুগের সৃষ্টি ও পাঠ তো অন্যরকমই ছিল। দুটিই ছিল কমবেশি লোকায়ত। বিশুদ্ধ সামাজিক প্রক্রিয়া। এমনকী পুথির যুগেও, ছাপাখানার প্রথম পর্বেও ব্যক্তিগত নিভৃত পাঠ ছিল বিরল ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা।

ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত পাঠের মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ অথবা কোন পদ্ধতিটি রসগ্রহণ ও আস্বাদনের ক্ষেত্রে শ্রেয়, তা নিয়েও তর্ক আছে, মতভেদ সম্ভব। বস্তুত, কোনও বিদগ্ধ ও বিচক্ষণ সমালোচক এ-রকম ভাবতেই পারেন, এ-রকম অভিমত পোষণ করতেই পারেন যে— 'মুদ্রণশিল্প আমাদের সাহিত্যিক অনুধাবনসামর্থ্যকে ভোঁতা করার ক্ষেত্রে বহুলাংশে দায়ী'। বস্তুত, অধ্যাপক বুচার এই সূত্রে আরও বলেছেন, 'শব্দের দু'রকম বৈশিষ্ট্য বা গুণধর্ম আছে। একদিকে তার অবস্থান আমাদের চেতনায়, অন্যদিকে তার অবস্থান ধ্বনিতে। সৌন্দর্যবেদনের উচ্চারণশক্তিবিহীন শব্দাবলী মুদ্রিত পৃষ্ঠায় অর্ধমৃত। কবিতার অন্তর্নিহিত সাংগীতিক সামর্থ্য শুধুই মনের অভ্যন্তরের শ্রুতিতে পুনরাবৃত্ত হলে বিবর্ণ, প্রতিধ্বনিত, পর্যবসিত হয় মাত্র।'

বুচার তাঁর হার্ভার্ড বক্তৃতামালায় আর একটি বিস্মৃতপ্রায় ও স্বল্পজ্ঞাত ঘটনা স্মরণ করেছেন, যা আমাদের প্রাসঙ্গিকধারণাকে সমৃদ্ধ করতে পারে—

গ্রীক যুগেও রোমান সাম্রাজ্যের দিনগুলিতে পর্যন্ত, আমাদের কালের তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতেও গদ্য ও পদ্যের একক ও নিভৃত পাঠের রেওয়াজ তৈরি হয়নি, গদ্য ও পদ্যপাঠ চলত সোচ্চারে ও সম্মিলিতভাবে।

প্রচীন সাহিত্যপর্যায়ে নীরব পাঠের অন্যতম বিরল দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায় অগাস্টিনের 'কনফেশান্‌স্‌'-এর একটি অংশ থেকে— সে তার প্রভু অ্যামব্রোজকে একেবারেই ফাঁকায় পাচ্ছে না, কেননা অ্যামব্রোজ তাঁর বিরল অবসরের সময়টুকু গ্রন্থপাঠেই খরচ করেন এবং এমনকী একদিন এমনও দেখা গেছে, বইয়ের পাতায় নীরবে তিনি তাঁর চোখ বুলিয়ে চলেছেন, এবং কী অবিশ্বাস্য— তাঁর কণ্ঠ ও জিহ্বা স্তব্ধ ও নিথর! প্রচলিত অভ্যাসের বাইরে এত বড় বিস্ময়কর ব্যতিক্রম কীভাবে সম্ভব হল, তার বিবিধ কারণ অন্বেষণ চলতে লাগল। 'কনফেশান্‌স্‌' থেকে উদ্ধৃত অংশ পুনরুদ্ধৃত করছি—

'His eyes scanned the pages, but his voice and tongue were silent....whatever the reason, no doubt it was a good one in such a man.'

অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশ ও উপমহাদেশ ভারতবর্ষের বয়স তো মাত্রই অল্পাধিক দুশো বছর। আর, বিশ্বসংস্কৃতির ইতিহাসেই বা মুদ্রণশিল্প কতটা প্রবীণ? তুলনায়, মানুষের গলার ভাষা— গানের সুর আর কবিতার ছন্দ পেয়েছে ঠিক কত হাজার বছর আগে, কে তা বলে দেবে? কিন্তু এ নিয়ে তো তর্কের কিছুমাত্র সুযোগ নেই যে, মানুষের সংশয়ে সঙ্গীত-কাব্য-নৃত্য অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থে 'মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড' জন্মমুহূর্ত থেকেই লোকায়ত! 'সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড' অবশ্য মানুষেরই হতে হবে। বিশ্বসংসারে সাংস্কৃতিক জীবন শুধু মানুষেরই আছে। কেননা শুধু মানুষেরই আছে আর্থিক জীবন।

এই আর্থিক জীবনের বৈশিষ্ট্যবশতই আমাদের নজরুল সমস্ত অর্থেই, সর্বাঙ্গীণভাবেই লোকায়ত। তাঁর জীবদ্দশা ১৮৯৯-১৯৭৬ অদীর্ঘ নয় কিন্তু বহুমুখী কর্মময় জীবনের সময়সীমা ১৯১৯-১৯৪১ দীর্ঘ ছিল না। এই বাইশটি বছরের মধ্যেই তাঁর সাহিত্যকর্ম উৎসারিত হতে পেরেছিল। আরও একটি সহজ সরল তথ্য মনে রাখা দরকার। এই বাইশটি বছরের কালপর্ব জুড়ে অবিভক্ত বঙ্গ ও ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণের শিকার। বলাই বাহুল্য, সেই শাসন ও শোষণপর্বের সূত্রপাত আনুষ্ঠানিকভাবে ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ থেকে এবং আনুষ্ঠানিক অবসান ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে।

শৈশবেই দারিদ্র্য-অবরুদ্ধ, প্রতিকূল জীবনের বিরুদ্ধে নজরুলকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল আত্মক্ষয়কারী এক ভয়ঙ্কর অসম যুদ্ধে। বিশেষত ১৯০৮ সালে পিতার প্রয়াণের পরে। আক্ষরিকভাবে দু'বেলা দুইমুষ্টি অন্নের জন্য কাজী পরিবারের দিনযাপনই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ন'বছরের শিশু নজরুল এই পারিবারিক সঙ্কটকালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত হলেন, সুস্থিতি তাঁর জীবনে রইল না, তাঁর বহুমুখী সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ ডানা মেলার মতো প্রত্যাশিত আকাশটুকু খুঁজে পেল না।

মক্তবের শিক্ষা শেষ করে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে যখন তাঁর পড়ার কথা, তখন তাঁকে বাধ্য হতে হচ্ছে কিশোর বয়সেই মক্তবে শিক্ষকতার কাজ করতে। স্বাভাবিক কোনও ছাত্রজীবনও পাননি তিনি। অর্থোপার্জনের জন্য কত রকম সব কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। গ্রামে গ্রামে মোল্লাগিরি, মাজারে খাদেমগিরি, মসজিদের ইমামগিরি— এই সবই তাঁকে করতে হয়েছে ক্ষুধার তাড়নায়। নজরুল স্বার্থ সচেতন ছিলেন না, পারিবারিক আর্থিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় নিজের সুখ-শান্তি-ভবিষ্যৎ সবকিছু ভুলে নজরুলের যে আত্মদান কৈশোর থেকেই শুরু হয়েছিল, তাঁর পরবর্তী জীবনেও আত্মীয়-বান্ধব এবং নিঃসম্পর্কিত বিপন্ন মানুষের জন্য সেই একই আবেগতপ্ত হিতৈষণা ও অকাতর অর্থব্যয় লক্ষণীয়: এই স্বতঃস্ফূর্ত ও অপরিমিত মানবতাকেই নজরুলের খেয়ালখুশি ও অমিতব্যয় বলে মনে করেছেন বায়কুণ্ঠ শহুরে আধুনিকের দল।

ছেলেবেলা থেকেই যাঁকে সমগ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য 'প্রফেশান'-এর সন্ধানে উন্মত্তবৎ ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, কখনও কখনও তাঁরও ভাগ্যে 'প্রফেশান আর প্যাশন' সম্মিলিত হয়েছে— লেটোনাচের গান, পালা অথবা নাটক লিখেও তিনি অর্থোপার্জন করেছেন। বাংলার লোকসমাজে গীতধারা, বৈষ্ণব বা শাক্ত ভাবের গান, কীর্তন, কথকতা, যাত্রা, মিলাদ মাহ্‌ফিল তথা ভক্তিমূলক লোকায়ত গানের আসর, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদ দ্বিতীয়ার্ধের আগমনী-বিজয়ার গানের পসরা, নিধুবাবুর টপ্পা এবং ব্যাপক অর্থে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাউল, সুফি, বৈষ্ণব তথা মরমিয়া সাধকদের পরোক্ষ ও অপরোক্ষ প্রেরণা-সঞ্চার —এককথায়, যে-সম্মিলিত বিচিত্র গান- কবিতাকে 'বাংলা গান' বলে চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ: সেই বিচিত্র সম্ভার ছেলেবেলাতেই মর্মস্থ হয়েছিল নজরুলের!

আপাত-উদ্ভট শোনালেও রামপ্রসাদের সঙ্গে নজরুলের মর্মের মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। অন্তত জীবনানন্দের অনুভবে এসেছিল। সময়ের ব্যবধানটুকু মনে রেখে বলা বোধ হয় তেমন দোষের হবে না যে, লোকায়ত স্বভাবের সূত্রে মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের সঙ্গে যে-অর্থে, সেই অর্থে রামপ্রসাদ ও লালনের সঙ্গেও নজরুলের আত্মীয়তা অন্তর্গত রক্তের ধারায় সুড়ঙ্গ-গভীর।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ বহুলাংশে ভিন্নতর কিন্তু আবহমান বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের লোকায়ত ধারাটির অর্থাৎ মূল ধারাটিরই প্রতিভূ, দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, নজরুল এবং সম্ভবত আধুনিক এই উপমহাদেশে একমাত্র নজরুলই।

তাঁর কবিতা, কথাসাহিত্য ও অন্যান্য গদ্যরচনা (সাংবাদিক কর্মকাণ্ডময়) নিভৃত, নীরব ও একক পঠনীয় রচনারূপে বিচার্য নয় ততটা, যতটা সেগুলি সম্মেলক পরিবেশনযোগ্য! তাঁর গানগুলির বৃহদংশই সম্ভবত 'সম্মেলক'-রূপে উপস্থাপনযোগ্য। বস্তুত, নজরুলের গান ও কবিতার বৃহদংশই গান-কবিতা। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই সুরসংযোগে সহজেই 'গেয়' হয়ে ওঠে, অন্য কোনও আধুনিক কবির পক্ষেই এই কথা এতদূর পর্যন্ত খাটে না। শুধু বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' প্রসঙ্গে 'গানে'র দাবি বহুদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য।

নজরুলের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা ও ফলশ্রুতিও লোকায়ত। তাই নজরুল-সাহিত্যের আস্বাদনপদ্ধতিটাও হওয়া উচিত: লোকায়ত।

এখন যদি বলা যায়, নজরুল সাহিত্যের মূল্যায়ন যে ভাবে হয়ে এসেছে, সেই পদ্ধতিই মূলত ভুল? সেইজন্যই নজরুল এ-পর্যন্ত ভুলভাবে নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়ে এসেছেন? রবীন্দ্রোত্তর অন্যান্য আধুনিক বাঙালি কবিদের সঙ্গে তাঁর মিল যতটা, অমিল তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি?

এ কথা কি ঐতিহাসিকভাবেই সত্য নয় যে, আধুনিকতা এক অর্থে 'আড়াল'? আমার মতে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের যিনি শ্রেষ্ঠ সমালোচক, সেই জীবনানন্দও নজরুল-মূল্যায়নে অসামান্য কালজ্ঞান ও মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েও কেন লিখে বসবেন—

১. '....এ রকম পরিবেশে হয়ত শ্রেষ্ঠ কবিতা জন্মায় না কিংবা জন্মায়, কিন্তু মননপ্রতিভা ও অনুশীলিত সুস্থিরতার প্রয়োজন। নজরুলের তা ছিল না। তাই তাঁর কবিতা চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়।'
২. '.....তিনি অনেক সফল কবিতা উৎসারিত করতে পেরেছিলেন। কোনো কোনো কবিতায় এত বেশি সফলতা যে কঠিন সমালোচকও বলতে পারেন যে নজরুলী সাধনা এইখানে—এইখানে সার্থক হয়েছে; —কিন্তু তবুও মান এড়িয়ে গিয়েছে।'
৩. '.....কিন্তু নজরুলের ব্যক্তিকতা ও সময় এই বুদ্ধিসর্বস্বতার হাত থেকে তাঁকে নিস্তার দিয়েছিল। আধুনিক অনেক কবিতা থেকে তাঁর কোনো কবিতার অঙ্গীকার তাই বেশি, ধ্বনিময়তাও উৎকর্ণ না করে এমন নয়। কিন্তু নিজেকে বিশোধিত করে নেবার প্রতিভা নেই এ-সব কবিতার বিধানে, শেষরক্ষার কোনো বিধান নেই।'

উপরের তিনটি উদ্ধৃতাংশে 'চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়', 'তবুও মহৎ মান এড়িয়ে গেছে', 'নিজেকে বিশোধিত করে নেবার প্রতিভা নেই এ-সব কবিতার বিধানে' প্রভৃতি 'মূল্যায়ন' বা 'মূল্যায়ন-পদ্ধতি' নজরুলের কবিতা প্রসঙ্গে যে তেমন খাটে না, তা জানেন জীবনানন্দ—'যে কবিতা সমাজ, স্বদেশ ও নরনারী সম্পর্কে অনেক কিছুই যথাশক্তি স্পষ্টবাদিতায় বলতে চেয়েছে, নজরুলের সেই কাব্য সম্পর্কে কথা-নিরপেক্ষ, প্রায় নির্বিকল্প—সুর-বিশুদ্ধতার দাবি অসঙ্গত', তবু তিনি ভিন্নতর মর্জি থেকেই বলেন, 'কাজীর কবিতা বিশেষ একটা মাত্রার দেশে তার অতীতের ভিতরে পরিসমাপ্ত। ....মন বিষয়ান্তর খোঁজে দিকনির্ণয়ী মহৎ কবিদের'।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে আমার সর্বাধিক মনঃপূত ব্যক্তিত্বের নাম যদিচ জীবনানন্দ, তবু নজরুল-মূল্যায়নেও তাঁর দুর্ধর্ষ প্রতিপত্তির কাছে নতজানু (নজরুলের কয়েকটি কবিতা প্রসঙ্গে যখন জীবনানন্দ বলেন, 'ভাষা, ভাব ও বিশ্বাসের আশ্চর্য যৌবন রয়েছে এই কবিতাগুলোর ভিতর। প্রেম—নারীপ্রেম, তার চেয়েও হয়ত বেশি করে দেশ ও নবীন সমাজ-প্রেম বাংলা কাব্যে নজরুলের অভ্যুদয়ের মুহূর্তে যে মুক্তকণ্ঠ স্পষ্টতা চেয়েছিল, তিনি তা যৌবনোচিত উৎসবে উৎসাহে দিতে পেরেছিলেন।) হতে গিয়েও তার কোনও কোনও মন্তব্য প্রসঙ্গে আমার প্রতিবাদস্পৃহাও সুস্পষ্ট। নজরুলের কবিতার জীবনানন্দ-নির্দেশিত সীমাবদ্ধতাগুলি যুক্তিবিন্যাসের যে প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য হতে পারত, সেই মাপকাঠিটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বস্তুত, 'রূপসী বাংলা'-র কবিতাগুলি এবং জীবনানন্দ দাশের অন্যান্য কবিতার লোকধর্মী অনুষঙ্গসমূহ স্মরণে রেখেও বলতে হবে, নজরুলের বিশ্বাসের জগৎ আর তাঁর মূল্যবোধের গভীরতা থেকে জীবনানন্দের মতো বিশ্বের 'নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান বা মনোবিকলনের নতুন সত্যে অর্পিত' পাশ্চাত্য চৈতন্য ও দর্শনের সংলগ্ন অতি-আধুনিক একজন কবি স্বভাবত স্বতন্ত্র।

নজরুল ব্রিটিশ উপনিবেশের কবিরূপেই গুরুতর পীড়াবশত কবিতার অনুশীলন শেষ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, জীবনানন্দ স্বাধীনতা-উত্তরকালের তাৎপর্যপূর্ণ এক দশক প্রায় কলকাতা শহরের শ্বাসরোধী নাগরিকতায় দীর্ণ, ক্লিষ্ট ও হৃতসত্তার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে আত্মশত্রুতার সম্মুখীন।

স্বভাবতই, নজরুল যে-অর্থে লোকায়ত, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও দার্শনিকতা-অভিমুখী জীবনানন্দ ততদূরে হাত বাড়াবেন কীভাবে, নজরুলের চেতনায় প্রোথিত চিরায়ত বোধ-বিশ্বাসগুলি থেকে জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতাটির দূরত্ব সহস্র যোজনের এবং সর্বোপরি মনোবিজ্ঞানের প্রধান তিন বিভাজন থিঙ্কিং, ফিলিং আর উইলিং নজরুলের মতো মৃত্তিকা ও মানবতার সন্তানের কাছে জটিল ত্রিধা-বিভক্ত হয়ে থাকে না—একযোগে একসূত্রে কাজ করে ও উৎসারিত হয়। অভিজ্ঞতায়, চিন্তায়, অনুভবে ও সক্রিয়তায় কোনও ভেদরেখা থাকে না বলেই উচ্চারণ হয় ঋজু ও দ্বিধাহীন, উষ্ণ ও আবেগতপ্ত নাট্যোৎকণ্ঠায় দীপ্র ও কম্পমান, আপাত-স্লোগানও উন্নীত হয় কবিতায়: এই হলেন নজরুল আর তাই প্রতিটি উচ্চারণেই কবিই থেকে যান নজরুল। প্রেমে ও রণে সততজয়ী সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের অপর নাম: নজরুল ইসলাম।

ব্যাস-বাল্মীকি-হোমার-শেক্সপীয়ার থেকে জয়দেব-চণ্ডীদাস-লালন সকলেই তো কিংবদন্তি। কে জানে তাঁদের সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি? জীবদ্দশাতেই নজরুলের গান আর কবিতার তথ্য আর পরিসংখ্যান এবং জীবনের ঘটনাবলি হয়ে ওঠে রহস্যরোমাঞ্চময় গল্পমালা। জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তি তিনি যে! □

বাংলার নবজাগরণের প্রেক্ষিতে নজরুল-বিচার

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন বিচার বৈগুণ্যে তাঁরা কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। ফলে নজরুলকে আমরা জেনেছি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের এক অতি সাহসী যোদ্ধা-কবি হিসাবে। বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশ বা জটিলতার সামগ্রিক ইতিহাসের কোনও প্রেক্ষিত থেকে তাঁকে তেমনভাবে চেনা হয়নি। কবি হিসাবে তাঁর মূল্যায়নে তাই এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা থেকে গেছে। আমরা মনে করি কবি হিসাবে তাঁর এই বিচ্ছিন্নতা কাটাতে বাংলার নবজাগরণের আলোকে নজরুল-বিচার একান্ত জরুরি।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে উনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল তা আবহমান বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে এমন একটা গতিময় বর্ণবিভঙ্গতা নিয়ে আসে বা নিয়তি-সূত্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় যে তার কথা বিস্মৃত হয়ে উনিশ-বিশের কোনও বিখ্যাত বাঙালি ব্যক্তিত্বের যথার্থ মূল্যায়ন অসম্ভব। কাজী নজরুল ইসলামের মতো সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবার কথা নয়।

দ্বিভঙ্গ জাগরণ: অর্ধশত বৎসরের ব্যবধান

অনেকের এরকম মনে হতে পারে নজরুল নামক এক মুসলমান কবির মূল্যায়নে বাংলার রেনেসাঁস, যা কিনা মূলত 'Hindoo Awakening' ছাড়া কিছু নয়, তা কতটা কার্যকরী সূত্রের ভূমিকা পালন করতে পারে। এর উত্তরে বলে নেওয়া প্রয়োজন বাংলার রেনেসাঁস সম্পর্কে এই অতি সরল ধারণাটির নিশিডাকে সাড়া না দেওয়াই ভাল। বাংলার রেনেসাঁস ছিল চরিত্রগত ভাবে হিন্দুত্ববাদী অর্থাৎ 'anti Muslim' এবং মুসলমান সমাজ বরাবর রেনেসাঁস বৃত্তের বাইরে থেকে গিয়েছিল—এই দু'টি ধারণাই অর্ধসত্য। আর কে না জানে অর্ধসত্য অসত্যের চেয়ে ভয়ঙ্কর। আসলে যা ঘটেছিল তা হচ্ছে ধনবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে উনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল ঐতিহাসিক কার্যকারণে সেই জাগরণের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ক্রিয়াশীল হয়নি। জাগরণের প্রক্রিয়া হিন্দুসমাজে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সূচিত হলেও মুসলিম সমাজে সেই জাগরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় বিলম্বিত দ্বিতীয়ার্ধে। আবদুল লতিফ প্রতিষ্ঠিত 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩) বা মীর মোশাররফ হোসেনের (১৮৪৭–১৯১১) সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ (১৮৬৯) থেকে এর শুরু ধরা যায়। অর্থাৎ দুই সমাজের জাগরণের মধ্যে অন্যূন পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এ. এফ. সালাহ্‌উদ্দীন লিখেছেন, এই ব্যবধান 'profoundly affected the subsequent development of two communities.' দু'ভাগে ভাঙা এই সাংস্কৃতিক জাগরণ উভয় সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কে নিয়ে আসে নাটকীয় জটিলতা। উভয়ের মধ্যে শাসক হিসাবে ইংরাজদের নিয়তিসম্ভব উপস্থিতি ঘনিয়ে তোলে 'এগোলে সর্বনাশ, পেছোলে নির্বংশ'—ধরনের একটি দু'কাটের ফাঁদ। এই সংকটগুলি থেকে একটি জাতিকে মুক্ত করার সাংস্কৃতিক দায় পালন করতে এসেছিলেন যে কবি তাঁর নামই কাজী নজরুল ইসলাম।

এখন আমরা ধান ভানতে শিবের গীত গাইব। একটু খতিয়ে দেখব জাগরণের প্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে ঘনীভূত সংকটটির স্বরূপ। কেননা সংকটটিকে সমগ্রত না চিনলে জাগরণের কবি হিসাবে নজরুলের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি অনির্ণীত থেকে যাবে।

অসূয়ার অন্তরাল

এ সত্য সর্বজ্ঞাত যে হিন্দুসমাজে জাগরণ প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হবার ফলে শিক্ষাদীক্ষা, সমাজসংস্কার, ধর্মসংস্কার, সাহিত্যকর্ম, চাকরিবাকরি সমস্ত দিক থেকেই তারা অনেকখানি

এগিয়ে যায়। মুসলমানসমাজে জাগরণের প্রক্রিয়া শুরু হলে হিন্দুসমাজে স্বাভাবিকভাবেই একটা স্পর্শকাতরতা তৈরি হয়। প্রাপ্ত সুবিধা ও অধিকারের দিক থেকে এগিয়ে যাওয়া হিন্দুসমাজকে মুসলমানসমাজও সুনজরে দেখত না তা বলাই বাহুল্য। বিষয়টা রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১–১৯৪১) নজর এড়িয়ে যায়নি। লিখেছেন,—'আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের স্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনও মতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না। আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে।'

জাত্যভিমানের মোহশলাকা

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আগাম দীক্ষিত ও শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুরা স্বল্প সময়ের মধ্যে যে দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করেছিল তাতে মর্যাদা ও প্রাপ্তির দিক থেকে তাদের প্রত্যাশা তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল। ঘুড়ি ততটাই উঁচুতে উঠতে পারে লাটাই যতটা সুতো ছাড়ে। লাটাইটা ইংরেজদের হাতে। এর ফলে ইংরেজ শাসকদের সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—'অতি দুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের সেই সিমপ্যাথির আঙুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়া আসিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ ঊর্দ্ধে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি।' ('ইংরেজ ও ভারতবাসী')

এই পর্বে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকল্প হিসাবে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ আঁকড়ে ধরতে চাইল জাত্যভিমান ও জাতীয় ঐতিহ্যকে। এর ফলে নব্য-হিন্দুত্ববাদের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। স্বাধীন রাজনৈতিক ভবিষ্যতের স্বপ্নপূরণের জন্য তার যাত্রা শুরু হল আধ্যাত্মিক অতীতের দিকে। অনুকূল সময়ের দাবি মেটাতে রামকৃষ্ণদেব ডিঙি কলকাতায় এসে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এলে ইয়ং বেঙ্গল হওয়াই যাঁর ভবিতব্য ছিল সেই নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণদেবের (১৮৩৬–১৮৮৬) শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হয়ে গেলেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ (১৮৬২–১৯০২)। বঙ্কিমচন্দ্রে (১৮৩৮–১৮৯৪) স্ফীত হয়ে উঠল গৌরবদীপ্ত হিন্দুত্বচেতনা। তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাস থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই—

"পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু?

...এই সকল স্ত্রীমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ণ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক এ সকলই হিন্দুর কীর্তি। এ পুতুল কোন ছার! তখন মনে করিলাম হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসার্থক করিয়াছি।" ('সীতারাম': ব.র, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৮৯১) গৌরবদীপ্ত এই ঐতিহ্যচেতনার মোহ শলাকায় হিন্দুসমাজ ক্রমশ নিজেকে ঘিরে ফেলছিল। স্বভাবতই সেখান মুসলমানের কোনও প্রবেশাধিকার ছিল না।

ইংরেজের স্তনে পিত্ত সঞ্চার

ব্রিটিশ শাসকদের তালফেরতা অবস্থানও দুই সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পালন করেছিল প্রায় নিয়তির ভূমিকা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নবজাগ্রত হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের ছিল গলাগলি সম্পর্ক। ইংরেজদের গ্রহণ করা হয়েছিল হিন্দুসমাজের উপকারার্থে ঈশ্বর প্রেরিত মঙ্গলময় বন্ধু হিসাবে। হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্ক যতটা সন্নিকট ছিল ততটাই দূরত্বপূর্ণ ছিল মুসলমানসমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক। রাজার জাতির মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করার অভিমানে ও আরও অন্যান্য কারণে মুসলমানসমাজ ইংরেজদের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয় মনে করে। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ধীরে ধীরে অবস্থার বদল ঘটে। আবদুল লতিফের মতো ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় শুরু হয় পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি মুসলমান সমাজের বিরাগকে অনুরাগে রূপান্তরিত করার প্রয়াস। রীতিমতো সভা করে লিখিত বয়ান মারফৎ জিহাদ তত্ত্বের ব্যাখ্যা বদল করে দেন মুসলমান ধর্মনেতারা। মুসলমান সমাজের এই পরিবর্তিত মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসে ব্রিটিশ শাসকরা। হিন্দুরা যখন ইংরাজদের 'সিমপ্যাথির আঙুর'কে টক জ্ঞান করে স্বাজাত্যবোধের দীক্ষা গ্রহণে নিরত তখন মুসলমান সমাজের দিকে তারা পক্ষপাতপূর্ণ বন্ধুত্বে ঝুঁকে পড়াই শ্রেয় মনে করে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার বললেন, 'হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় তাঁর দুই স্ত্রীর মতো: এর মধ্যে মুসলমানই প্রিয়তর' ডাবলু, ডাবলু, হান্টারের 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' (১৮৭১) গ্রন্থটিতে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের এই পরিবর্তিত মনোভাবের একটি তাত্ত্বিক পূর্বরেখা পাওয়া যায়। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে দূরত্ব বাড়তে থাকে। জয়ন্তী মৈত্র তাঁর 'মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৮৫৫–১৯০৫' গ্রন্থে খুব সুন্দর বলেছেন, "As the Anglo-Muslim gulf was bridged, Hindu-Muslim gulf widened." (P.6) বিষয়টা রবীন্দ্রনাথের নজর এড়ায়নি। তিনি লিখেছেন, 'আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে একটা হিন্দুবিদ্বেষ ভাব ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমান জাতির প্রতিও একটি আকস্মিক

বাৎসল্যরসের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ইংরেজের স্তনে যদি ক্ষীর সঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয় কিন্তু আমাদের প্রতি কেবলই পিত্ত সঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপটভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।'

('সুবিচারের অধিকার', "রাজা প্রজা")

বাঙালির মুক্তি কবির হাতে

এই ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের শতাব্দীসঞ্চিত সংকটের স্বরূপ। বঙ্গ সংস্কৃতির আকাশে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন সূর্যের মতো বিরাজমান তখন একদিক থেকে সংকটমুক্তি নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। তাঁর 'শুচি' কবিতা ও 'গোরা' উপন্যাস একদিক থেকে সংকট মুক্তির দলিল। কিন্তু মুসলমান সমাজের দিক থেকে এই সংকটের জাল ছিঁড়ে বেরনোর প্রশ্ন থেকেই গিয়েছিল। সাংগঠনিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করার যে আয়োজন চলছিল নানা ভাবে তাতে প্রাণসঞ্চার করার জন্য দরকার ছিল বাধাবন্ধহীন এক কবির আবির্ভাব। বাঙালির মুক্তি সাধকের হাতে নয়, বিদ্বানের হাতেও নয়, বাঙালির মুক্তি কবির হাতে। হিন্দু সমাজে রেনেসাঁসের আলো পড়েছিল অনেকদিন ধরে তাই তার কবি আনন্দের কবি কিন্তু মুসলমান সমাজে মুক্তির পথ আগলে ছিল অনেকরকম বাধা, সেখানে জাগরণের চেয়ে পুনর্জাগরণবাদের শক্তি ছিল বেশি তাই তার কবিকে পেশীশক্তি সম্পন্ন না হলে চলত না। নজরুল ইসলাম হলেন সংকট মুক্তির সেই কবি যাঁর জন্য মুসলমান সমাজ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিল। কাজী নজরুল যে-কোনও কবি নন, তিনি পালন করতে এসেছিলেন সমস্যা বিজড়িত একটি সমাজের সংকট মুক্তির ঐতিহাসিক দায়। তাঁর কবিতায় যে পৌরুষপূর্ণ বিদ্রোহের কণ্ঠস্বর শুনি তাও কোনও আকস্মিক বা সঙ্গতিহীন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। যুগসঞ্চিত বিপত্তির নানা রকম চাপ ভেঙে যাঁকে মুক্তির গান গাইতে হবে তাঁকে তো বিদ্রোহী কবিই হতে হবে। কিন্তু বিদ্রোহী কবি তাঁর মূল পরিচয় নয় জাগরণ বা মুক্তির প্রয়োজনে তিনি বিদ্রোহী। আসলে তিনি জাগরণের কবি, রেনেসাঁসের কবি।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ঘনীভূত অগ্নি পরিধির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার এই আবেদন তাঁর পক্ষেই রাখা সম্ভব যাঁর হাতে আছে রেনেসাঁসোচিত বিশুদ্ধ মানবতাবাদের জয়পতাকা। অর্ধশত বৎসরের ব্যবধানে সূচিত হিন্দু-মুসলিম দুই সমাজের জাগরণের মধ্যে রেনেসাঁসের সমান্তরালে রিভাইভ্যালিজমের পরস্পর বিরুদ্ধ যে টান ছিল তা সর্বথা এড়াতে পারেননি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যসম্রাটও। 'আনন্দমঠ'-এর একটি চরিত্রের মুখে তিনি বসিয়ে দেন এমন সংলাপ, 'ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কূল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?'

রবীন্দ্রনাথের মতো মানবতাবাদী কবিও এড়াতে পারেন না 'শিবাজী উৎসব' রচনার সাময়িক স্খলন। বর্গীর হাঙ্গামাকে মোহগ্রস্ত ব্যাখ্যায় গরিমাময় করে চিত্রিত করে লেখেন,

'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষত ভারত
বেঁধে দিব আমি।'

কাজী নজরুল ইসলাম অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর একটি সমাজের জাগরণের কবি হয়েও এ ব্যাপারে কোথাও স্খলিত হননি। চাঁদে কলঙ্ক আছে, নজরুলে নেই। তাঁর চেতনার বৃন্তে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে স্বরূপটি পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল তার কোনও তুলনা নেই।

'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মোসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ
এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান।'

দু'টি সমাজের অন্তরে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে প্রবেশ

সম্প্রদায়চেতনা বিনির্মুক্ত রেনেসাঁসম্যানের অসদ্ভাব নেই হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই, কিন্তু একটি দিক থেকে তিনি একক, অনন্য। দুটি সমাজের অন্তরে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর মতো আর কেউ প্রবেশ করতে পারেননি। রামমোহন হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান—তিনটি ধর্মেরই মৌল সত্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর পথ ছিল জ্ঞানের পথ। অন্যেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতিক্রম করতে চাননি বা পারেননি আপন জাতিগত ঐতিহ্যের সীমা। হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের খতিয়ানও এ প্রসঙ্গে খুব আশাব্যঞ্জক নয়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' নামক গবেষণা গ্রন্থে খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরেছেন। যুদ্ধের কাহিনীগুলিতে আপন আপন সম্প্রদায়ের বিজয় ও বীরত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বিজাতীয় প্রেমের কাহিনীতেও মজার ব্যাপার লক্ষ করা যায়। হিন্দু লেখকরা এঁকেছেন হিন্দু নায়ক ও মুসলমান নায়িকার প্রণয় কাহিনী (ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', বঙ্কিমচন্দ্র রচিত দুর্গেশ নন্দিনী', 'রাজসিংহ') আর মুসলমান লেখকরা লিখেছেন মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকার প্রণয়ের গল্প (স্মরণীয় কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা', সিরাজীর 'রায়নন্দিনী')। চাপান-উতোর মূলক এই ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াজাত সাহিত্য নিদর্শনের স্থূল উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার প্রতিবাদে ইসমাইল হোসেন সিরাজী বা সৈয়দ আবুল

হোসেনের সাহিত্যকর্ম। আবুল হোসেনের গ্রন্থগুলির নাম এই রকম — 'দুর্গেশনন্দিনী বা ত্রিজরজা', 'কপালকুণ্ডলা বা সখের সতীন' 'ইক্ষুর নাম বিষবৃক্ষ', 'আনন্দমঠ বা নন্দের বন্দী', 'সীতারাম বা কাগজ রাজা'। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের এই ধরনের সাহিত্যিক পরিপ্রেক্ষিতের কথা মাথায় রাখলে নজরুলের কাব্যকীর্তি দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান নজরুলের কাব্যসাধনার এই বিশিষ্টতার কথা উল্লেখ করেছেন, 'মনে রাখা দরকার সমগ্র আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি যিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে হিন্দু মুসলমান উভয় ঐতিহ্যকে আপন কাব্যে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছেন।' রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজের প্রতি অপরিমিত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সত্ত্বেও মেনে চলেছেন আপন সীমা। নজরুল হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের পরস্পর বিরুদ্ধতা ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে শুধু মুসলিম সমাজের অন্দর মহলেই বিচরণ করেননি, হিন্দু-মুসলিম দুই ঐতিহ্যেই স্বাধীনভাবে বিচরণ করেছেন। সংস্কার ও সাধ্য কোনওটাই বাধা হয়নি। দুই সমাজের অন্তরে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে প্রবেশ করাকে একটি বিরল বৈশিষ্ট্য হিসাবেই ধরতে হবে। এই ক্ষমতা একমাত্র নজরুলেরই ছিল। 'কাব্য আমপারা'য় তিনি কোরাণের অনুবাদ করেছেন আবার রচনা করেছেন অসাধারণ 'কালীকীর্তন'। তাঁর একটি বিখ্যাত কালীকীর্তন —

'আমার কালো মেয়ের পায়ের নীচে
দেখে যা আলোর নাচন

(বনগীতি)

বাংলার মুসলমান সমাজের সামনে সবচেয়ে জটিল কঠিন ও ট্র্যাজিক সংকটটির শিরোনাম ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। সেক্ষেত্রে নজরুলের ইতিবাচক ভূমিকা বিশদভাবে আলোচনা করার পর মুসলমান সমাজের সামনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণসংকট কী ছিল এবং সেই সংকট মুক্তির ক্ষেত্রে নজরুল কোন ভূমিকা পালন করেছিলেন সেই আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে।

পরিচয়-সঙ্কটের ইতিহাস

বাঙালি মুসলমানের আনুপূর্বিক ইতিহাস তার পরিচয়-সঙ্কটের ইতিহাস। বহুকাল ধরে সে খুঁজছিল তার একটি নিজস্ব পরিচিতিপত্র। উনিশ শতকের বিলম্বিত জাগরণ তাকে আর কিছু না দিক আত্মপরিচয়ের সেই ঐতিহাসিক সংকট থেকে মুক্তির সুনির্দিষ্ট হদিশ দিয়েছে। প্রসঙ্গটিকে একটু বিশদ করা দরকার। বাঙালি মুসলমান আসলে সেই দুর্ভাগা মানবগোষ্ঠী সামাজিক সুবিচারের আশায় যে বারবার ঠিকানা বদল করেছে কিন্তু লাভের লাভ বিশেষ কিছু হয়নি। এ দেশেরই কৃষিভিত্তিক আদিম কৌম সমাজের মানুষ আর্যজাতির দ্বারা বিজিত হয়ে স্থান পেয়েছিল বর্ণাশ্রমভিত্তিক শূদ্র পর্যায়ে। সামাজিক সুবিচারের আশায় সে এক সময় বৌদ্ধ হয়। বৌদ্ধ ধর্মকে মুছে দেওয়া হলে সে আসে ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ে। কিন্তু মুসলমান পরিচয়ের মলাটও তার বিশেষ কাজে আসেনি। কেননা নিম্নবর্গের গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালি মুসলমান আসলে উত্তর-পশ্চিম উলেমা ও লঘিষ্ঠ সংখ্যক উর্দুভাষী আশরাফ শ্রেণীর অবাঙালি মুসলমানের ধর্মীয় উপনিবেশের অন্ধ প্রজা মাত্র ছিল।

সঙ্কটটা ঘনীভূত হয়েছিল ভাষাকে কেন্দ্র করে। বাঙালি মুসলমানের আশ্রয়-ভাষা কি? উর্দু না বাংলা? কোরানের ভাষা আরবি, রাজভাষা ফারসি এবং স্বাতন্ত্র্যগর্বী অভিজাতদের ভাষা উর্দু। বাঙালি মুসলমান এক সময় মনে করত এই তিনটি ভাষার মধ্যেই মুসলমানত্বের আসল রহস্য বিদ্যমান। কিন্তু মনে করলেই তো হবে না। সামাজিক ভাবে সেই ভাষা রপ্ত করার সাংস্কৃতিক বা ঐতিহ্যগত ভিত্তি বাংলার মুসলমান জনগণের ছিল না। এঁরা ছিলেন সেই জনগণ সংস্কৃত যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবি অজানা, ফারসির নাম শুনেছেন এবং উর্দু কানে শুনেছেন মাত্র। আহমদ ছফা বাঙালি মুসলমানের ভাষা সংকটের স্বরূপটি খুব সুন্দর বলেছেন — বাঙালি মুসলমানরা আরবি, ফারসি, উর্দু এই তিনটি ভাষায় তালিম গ্রহণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যখন দেখলেন কোনওটাই তাঁদের পক্ষে রপ্ত করা সম্ভব নয় তখন ওই বর্ণমালাতে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছেন। যখন দেখা গেল আরবি হরফে বাংলা লিখে চালানো যায় না তখন বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার আরবি ফারসি শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। আরবি ফারসি উর্দু হিন্দি মিশ্রিত একটি জগাখিচুড়ি ভাষাদর্শের মধ্যে তাঁরা থিতু হবার চেষ্টা করেছেন। নবাবি আমলের পতন ও কোম্পানি শাসনের অভ্যুদয়ের কাল হচ্ছে এই মিশ্র ভাষারীতির বিকাশ কাল। এই কাব্যাদর্শকে আনিসুজ্জামান ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি ধারার নিদর্শন হিসাবে ধরেছেন। এই সময়কার মিশ্র ভাষারীতির পুথিসাহিত্যের মূল কথা ছিল নিজধর্মের শক্তির কাছে বহিঃশক্তির তুচ্ছতা প্রদর্শন। কাল্পনিক গৌরববোধের আত্মকণ্ডুয়ণে পতিত এই কাব্যাদর্শ ছিল 'অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ'এর মতো প্রবাহহীন, মানসিক অবসাদগ্রস্ত মুসলমান জীবনের দর্পণস্বরূপ। মফিজউদ্দীন আহাম্মদ রচিত 'কেচ্ছা আলেফ লায়লা' থেকে দুটি ছত্র উদ্ধার করছি —

ভেজ আয় রব মেরে দরুদ ছালাম। •
আপনে পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম॥

এই ভাষাদর্শ বাঙালি মুসলমানদের নিজস্ব মুখের ভাষা থেকে সরিয়ে নেবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রগতিশীল জীবনাদর্শ থেকে তো বটেই। মিশ্র ভাষারীতির এই পুঁথিসাহিত্যে আছে অলৌকিকতার প্রতি সমর্পিতচিত্ততা, নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা,

আদর্শবোধের বৈকল্য, বিস্মৃত অতীতের কাল্পনিক পুনর্গঠন, সমকালীন জীবনের সঙ্গে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ এবং পরধর্ম বিদ্বেষ। এই ভাষাদর্শে রচিত সাহিত্য গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালি মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাৎপদ মানসিকতার শিকলে বেঁধে রাখার কাজটি নিপুণভাবে করেছিল।

বাংলা : মাতৃভাষা

আনিসুজ্জামান লিখেছেন, 'সব মিলিয়ে মনে হয় যে ইংরেজ শাসনের প্রথম একশ বছর বাঙালি মুসলমানের এক মানসিক অবসাদের যুগ।' এই ক্ষয়িষ্ণুতা ও মানসিক অবসাদ থেকে বাঙালি মুসলমানের মুক্তিযাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। অনেকদিন ধরে বাঙালি মুসলমান খুঁজে ফিরছিল তার সঠিক সাংস্কৃতিক ঠিকানা, তার নিজস্ব আশ্রয়ভূমি, আত্মপ্রকাশের স্বচ্ছন্দ পথ। উনিশ শতকের জাগরণ বাঙালি মুসলমানকে ভ্রান্ত পথ ও মিথ্যে পরিচয়ের আবরণ থেকে মুক্তি দিতে এসেছিল।

সকলেই জানেন বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসাবে বরণ করার সঙ্গে জড়িত ছিল বাঙালি মুসলমানের যুগার্জিত সংকট থেকে মুক্তির প্রশ্ন। উর্দু না বাংলা এই ভাষা বিতর্কের পথ দিয়েই বাঙালি মুসলমান পৌঁছুতে পেরেছিল তার ঈপ্সিত স্বদেশে স্বাধীন বাংলাদেশে। বাংলা যে শেষ পর্যন্ত মিশ্র ভাষারীতির জগাখিচুড়ি ও পশ্চাৎমুখী জীবনাদর্শে নিপতিত বাঙালি মুসলমানের জাগরণ ও অগ্রগামী জীবনাদর্শে পৌঁছনোর উপযুক্ত ভেলা হতে পেরেছিল তার মূলে যাঁদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি নজরুল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অগ্রগামী জীবনচেতনার নানা সঞ্জীবক উপাদান দিয়ে তিনি যেভাবে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। এখন আমরা আসব সেই প্রসঙ্গে। দেখব বাঙালি মুসলমানের প্রাণান্তকর চেষ্টায় চর্চিত মিশ্রভাষা রীতির বিকৃত বাংলা ও সেই বিকৃত ভাষার পাত্রে পরিবেশিত ক্ষয়িষ্ণু জীবনাদর্শের পরিবর্তে স্বাভাবিক প্রাণশক্তিতে পূর্ণ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক বাংলা ভাষা তিনি নির্মাণ করে গেলেন এবং সেই ভাষায় পরিবেশন করে গেলেন নবজীবনের জয়গান। বাঙালি মুসলমানের পক্ষে খুব জরুরি ছিল এই ভাষা ও সাহিত্যের নবায়ণের প্রশ্নটি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই নববস্ত্র নজরুল বয়ন করেছিলেন রেনেসাঁসের মূল সূত্রগুলি দিয়েই — এখন প্রবেশ করব সেই আলোচনার বিশদে।

উনিশ-বিশের সন্ধিপর্বে বাঙালি মুসলমানের সামনে এজেন্ডা ছিল একটাই অন্ত-মধ্যযুগীয় মানসিকতার জাড্য থেকে মুক্তি। একেই আমরা জাগরণ বা রেনেসাঁস নামে চিহ্নিত করছি। প্রগতিশীল মানবতাবাদী জীবনাদর্শের দিকে সেই যাত্রাপথে মাথা তুলেছিল দু'রকম অন্তরায়। মুসলমান সমাজের পূর্বাপর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি থেকে জাত কিছু জটিলতা। বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির এই দীর্ঘক্রিয়া সামাজিক প্রক্রিয়াটিকে আমরা এই ভাবে চিত্রিত করতে পারি। বাঙালি মুসলমান সমাজকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য দু'মুখে জোতা দুটি ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের সামনে। একটি গাড়ির নাম ঐস্লামিক ঐতিহ্যবাদ অন্যটির নাম আধুনিক মানবতাবাদ।

মুসলিম সমাজের প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে হলে ঐস্লামিক ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ অবগাহন করতে হবে, গায়ে জড়াতে হবে প্যান ইসলামের আন্তর্জাতিক জোব্বা — এই ছিল একদিকের শ্লোগান। অন্যদিকের বক্তব্য ছিল ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে হবে যুক্তি ও মানবতাবাদের কষ্টিপাথরে কষে, তার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাতে হবে আধুনিক যুগোপযোগী চিন্তা চেতনার। মুসলিম সমাজের অন্তর্কক্ষে এই দুয়ের টানাপোড়েন চলেছিল প্রথমাবধি। প্রত্যাবর্তনমুখী মুসলিম ঐতিহ্যবাদের এই ধারাটিকে বলা যায় রিভাইভ্যালিজমের ধারা আর আধুনিকতার পথে অগ্রগামী মানবতাবাদের অপর ধারাটিকে বলা যায় রেনেসাঁসের ধারা।

নজরুল রেনেসাঁসের কবি

ইতিহাস সাক্ষী, বাঙালি মুসলমানের পরবর্তী ইতিহাস এই দুই ধারার টানাপোড়েনেরই ইতিহাস। মুসলিম সমাজের অন্তর্কক্ষে রিভাইভ্যালিজমের যে ধারা ক্রিয়াশীল ছিল তা তাদের এক সময় পৌঁছে দেয় কৃত্রিম আরবে — পূর্ব পাকিস্তানে (১৯৪৭)। কিন্তু রেনেসাঁসের আত্মা মরেনি। সেই রেনেসাঁসের ধারাই ভাষা আন্দোলনের পথ দিয়ে বাঙালি মুসলমানকে পৌঁছে দিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে (১৯৭১)। বঙ্গভঙ্গে জয় হয়েছিল তার পুনর্জাগরণবাদী ধারার আর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মে জয়ী হয়েছে নবজাগরণের ধারা। নজরুল ছিলেন রেনেসাঁসের কবি।

বাঙালি মুসলমানের জাতীয় জীবনে নজরুল যেন 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ।' রবীন্দ্রনাথ নজরুলের এই তুমুল আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে —

'দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন....
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।"

['ধূমকেতু' পত্রিকার আশীর্বাণী, ১৯২২, ১২ আগস্ট]

"পোহায়নি রাত আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিম
মুসলমানের রাত্রি তখন আর সকলের দিন

অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ মুসলমান"
("বাংলার মাজিক', ১৩৩৫, "সন্ধ্যা")

তখন নজরুল এসেছিলেন জাগরণের গান গাইতে।

ইসলামি সংস্কৃতে অভ্যর্থনা

রেনেসাঁসে অন্যতর সংস্কৃতি পালন করে উজ্জীবনী উপাদানের ভূমিকা। ইতালীয় রেনেসাঁসে প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন সংস্কৃতিকে পাওয়া যায় সেই ভূমিকায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সূচিত কলকাতাকেন্দ্রিক রেনেসাঁসের প্রধান উদ্দীপক উপাদান ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি। দ্বিতীয়ার্ধের মুসলিম জাগরণের অন্যতম উদ্দীপনী উৎস ছিল ইসলামি সংস্কৃতি। কাজী নজরুলের কাব্য ও সংগীতের জগৎ পরিক্রমা করলে দেখা যাবে আরব্য ও পারস্য ভাষার মঞ্জুষায় যে সম্পদ রক্ষিত ছিল তা তিনি বাংলা ভাষায় এনে দিয়েছেন। 'অগ্রাণের সওগাত', 'ঈদ মোবারক', 'নওরোজ', 'অগ্রপথিক', 'সুবহ্ উম্মেদ', 'খালেদ', 'উমর ফারুক' প্রভৃতি বহু কবিতায় তিনি ইসলামি সংস্কৃতিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। 'কাব্য আমপারা'য় তিনি অনুবাদ করেছেন কোরানের। কাহিনী, চরিত্র, আদর্শ, সৌন্দর্যচেতনা, শব্দ, ছন্দ, সুর — অনেক দিক থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন মধ্যপ্রাচ্যের ঐশ্বর্য, প্রাচীন আরবের দুর্ধর্ষ জীবনছন্দ, পারস্যের ভোগবাদী সৌন্দর্যচেতনা এবং আধুনিক তুরস্কের যুক্তিবাদী মানবতাবাদ তাঁকে হাতছানি দিত। লিখেছেন,

'মলয় শীতলা সুজলা এদেশে আশিস করিও খালি —
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দু'মুঠো বালি
('উমর ফারুক', 'জঞ্জীর', ১৯২৮)

এর ফলে বঙ্গ সংস্কৃতির ভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে। বাঙালি মুসলমানও অনায়াসে নজরুলের কবিতাকে আপনজ্ঞানে গ্রহণ করতে পেরেছে

তাঁকে দেওয়া একটি সম্বর্ধনা পত্রে লেখা হয়েছিল — "তুমি বাঙলার মধুবনে শ্যাম কোয়েলার কণ্ঠে গুলবাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ, রসালের কণ্ঠে সহকার সাথে আঙুর লতিকার বাহুবন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যাম শান্ত কণ্ঠে ইরানী সাকীর লাল শিরাজীর আবেশ বিহ্বলতা দান করিয়াছ।'

পরিপূর্ণ জীবনবাদ

ইতালিতে রেনেসাঁস ছিল মধ্যযুগীয় চার্চতন্ত্রের বিশুষ্কতা থেকে জীবনের উদ্ধার প্রকল্প। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, জর্জিনো, (১৪৭৮–১৫১১), রাফায়েল (১৪৮৩–১৫২০), টিশিয়ান (১৪৭৭–১৫৭৬) প্রমুখ শিল্পীদের চিত্রকর্মের দিকে তাকালে বোঝা যায় পরিপূর্ণ জীবনবাদ ও সৌন্দর্যের চোখ নিয়ে তাঁরা জীবনকে দেখেছিলেন। মুসলমান সমাজের জাগরণের কবি হিসাবে নজরুল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে জীবনবাদের একটি বলিষ্ঠ ধারা সংযোজিত করেন। ইসলামি ঐতিহ্যে ছিল তিনটি ধারা। আরব্য মরুভূ-জাত বিশুদ্ধ শরিয়তি ধারা। পারস্যের রাজসিক সৌন্দর্য ও ভোগবাদের ধারা এবং হৃদয়নিষ্ঠ প্রেম ও সমন্বয়বাদী সুফিবাদের ধারা। ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বের ইতিহাসে এই তিনটি ধারা অন্তত একবারের জন্য খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। আওরঙ্গজেব ছিলেন শরিয়তি ধারার নীতিনিষ্ঠ মুসলমান, শাজাহান ছিলেন রাজসিক সৌন্দর্য ও সম্ভোগের প্রতিভূ আর দারার মধ্যে মূর্ত হয়েছিল প্রেম ও সমন্বয়বাদী সুফিবাদের ধারা। নজরুল পারস্য সূত্রে আগত ইসলামিক ঐতিহ্যের সৌন্দর্যঝঙ্কৃত ভোগবাদের রাগতপ্ত ধারাটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এর সঙ্গে সুফিবাদের উদার, উন্মুক্ত হৃদয়-ধর্মের দিকটিকেও তিনি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর গানে-কবিতায় প্রেম, প্রীতি ও সৌন্দর্য সম্ভোগের দিকটি ছাড়পত্র পেয়েছে বেশি। তিনি লিখেছেন,

'ফুটলো উষার মুখটি অরুণ ছাইলে বাদল তাম্বু ধরায়
জমলো আসর বর্ষা বাসর লাও সাকী লাও ভর-পিয়ালায়।
ভিজলো কুঁড়ির বক্ষপরাগ হিম শিশিরের আমেজ পেয়ে,
হরদম! হরদম দাও মদ্ মস্ত্ করো গজল গেয়ে।'
('বাদল প্রাতে শরাব' "পূর্বের হাওয়া," ১৩২৭)

ভেঙে ফেল কর রে লোপাট

মুসলিম জাগরণের একটি গুরুতর দুর্বলতার দিক হচ্ছে এটা ছিল 'pro-British'। আনিসুজ্জামানের ভাষায় —

"আধুনিক সমাজ আন্দোলনের আরেক দিকে ছিল ইংরেজ শাসনের সঙ্গে আপোষের এবং হিন্দু মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা।.... দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া সকল লেখকই ইংরেজ শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের পক্ষপুটে প্রসারিত অধিকার লাভ করার স্বপ্ন দেখেছেন। তবে বাস্তব জীবনের সংঘাতে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে সমালোচনার মনোভাব ধীরে ধীরে প্রবেশ করছিল। এর আকস্মিক বিস্ফোরণ দেখা যায় নজরুল ইসলামের রচনায়।"

নজরুলের কবিতায় গানে পাই পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সপক্ষে শৃঙ্খলমুক্তির পৌরুষপূর্ণ জেহাদ।

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট।'

ব্রিটিশ সরকার রাজদ্রোহী রচনার অপরাধে বাজেয়াপ্ত করেছিল তাঁর 'বিষের বাঁশি, 'ভাঙার গান', 'প্রলয় শিখা', 'চন্দ্রবিন্দু', 'যুগবাণী', সুতরাং বলা যেতে পারে মুসলিম জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা তিনি সবলে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট

রেনেসাঁস শুধু কাস্তিলিয়নের (১৪৭৮–১৫২৯) মতো 'জেন্টলম্যান'এর জন্ম দেয়নি, লরেঞ্জো ভাল্লার মতো ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট'এরও জন্ম দিয়েছিল। মধ্যযুগীয় জড়ত্ব ও মৃত ধর্মীয় অনুশাসনগুলির বিরুদ্ধে তখন শাণিত আক্রমণ চালানো হয়েছিল। বাংলার প্রথমার্ধের জাগরণে রামমোহন (১৭৭২–১৮৩৩), বিদ্যাসাগর (১৮২৩–১৮৯১) ইয়ং বেঙ্গলরা কায়েমী কানুন ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করতে পিছপা হননি। নজরুল হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের সম্প্রদায়বুদ্ধি চালিত রিভাইভ্যালিস্টদের বিরুদ্ধে ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্টের ভূমিকা পালন করেছেন। হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

'হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায় কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়তো পণ্ডিত্ব। তেমনি দাড়িত্ব ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দুই 'ত্ব'-মার্কা চুলের গোছা নিয়ে এত চুলোচুলি।'

('হিন্দু-মুসলমান', "রুদ্রমঙ্গল", ১৩৩৩)

নজরুল তাঁর কলমকে প্রায় অসিতে পরিণত করে ফেলেছিলেন। ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে-জ্বালাময়ী কবিতায় তিনি অনন্য। 'জাতির নামে বজ্জাতি' কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

নজরুল যেমন আক্রমণ করেছিলেন সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতাকে, সাম্প্রদায়িকতাকে; তেমনই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ও তাঁর আক্রমণ অব্যাহত ছিল। ফলে উভয়দিক থেকে তাঁর উপর আক্রমণ নেমে আসে। কাঠ মোল্লারা যেমন তাঁকে চিহ্নিত করে 'শয়তান' অভিধায় তেমনই রাজদ্রোহের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে তাঁর অনেকগুলি রচনা।

অর্ধেক তার নারী

ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বুর্খহাউট লিখেছেন, 'ইতালীয় রেনেসাঁসে নারী পেয়েছিল পুরুষের সমকক্ষ মর্যাদা'। রেনেসাঁস চিত্রকলার দিকে তাকালে দেখা যায় নারীকে তাঁরা এঁকেছেন সৌন্দর্যমিশ্রিত বিস্ময় ও ভালবাসার দৃষ্টিতে। ডিরোজিও (১৮০৯–১৮৩১) তাঁর 'দি ফকির অব জঙ্গীরা' কাব্যে লিখেছেন, 'নারী অপরের খেলনা মাত্র নয়।' রামমোহন বিদ্যাসাগর থেকে শরৎচন্দ্র (১৮৭৬–১৯৩৮) পর্যন্ত গোটা রেনেসাঁস জুড়ে চলেছিল সামাজিক শোষণ ও নিষ্পেষণের হাত থেকে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার ধারাবাহিক সংগ্রাম। মুসলিম সমাজে নারীকে কি চোখে দেখা হত তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে 'মিশ্র ভাষারীতি'র কাব্যের পাতায় পাতায়।

আওরত বদজাত কভু ভালো নাহি বোঝে।
নেকজাত এক কভু হাজারের মাঝে॥

নারীত্বের এই লাঞ্ছনা ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূতী বেগম রোকেয়া (১৮৮০–১৯৩২)। নজরুলের কাব্যে গানে নারীর পূর্ণ মর্যাদা স্বীকৃত।

আজও রবি শশী ওঠে ফুল ফোটে নারীদের কল্যাণে
নামে সখ্য ও সাম্য শান্তি নারীর প্রেমের টানে
নারীর পুণ্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ
আজও সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব॥
('নারী', "সাম্যবাদী", ১৯২৫)

বৈশ্বিক মানুষ

রেনেসাঁস মানুষকে নিখিল বিশ্বের অধিবাসী করে দিয়েছিল। জাতি, ধর্ম, স্বদেশ পরিচয়ের সমস্ত গণ্ডি ভেঙে রেনেসাঁসের মানুষ হতে চেয়েছিল 'ইউনিভার্সাল ম্যান'। 'প্রিন্স অব হিউ ম্যানিটিস' আখ্যাত এরাজমুজ (১৪৬৯–১৫৩৬) সম্পর্কে বলা হয় 'he belonged to no nation' রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকের মধ্যেই ছিল সেই 'বৈশ্বিক মানুষ' হবার আকুতি।

নজরুলেব মধ্যে ছিল সেই বৈশ্বিকতার আহ্বান। মানসিক ভাবে তিনি উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন এমন একটি স্তরে, উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন —

'যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশিছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম ক্রীশ্চান।'
— ('সাম্যবাদী', ১৯২৫)

প্রাক রেনেসাঁস যুগে ইউরোপে মানুষ বলতে বোঝাত একজন খ্রিস্টানকে। রেনেসাঁসের সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত হল 'হিউম্যানিজম' — মানবতাবাদ। বাংলায় রামমোহন ছিলেন এর উদ্গাতা। নজরুলকেও ধরা যেতে পারে 'সেকুলার হিউম্যানিজমে'র প্রবক্তা হিসাবে। তাঁর সাহিত্যসাধনায় ফুটে উঠেছে সমস্ত রকম ধর্ম-পরিচয় বিনির্মুক্ত মানবতাবাদী রূপটি। মধ্যযুগের 'মিশ্রভাষারীতি'র কাব্যে যেখানে লেখা হত —

'দেও পূজা ক্ষমা দেহ ঝুঁটি মালা ছাড়।
এক ভাবে নবীর কলেমা মুখে পড়॥
… … …
আমার নবীর দীনে কোন লেটা নাই।
সব ছাড়ি দাড়ি রাখ শুন মেরা ভাই॥'
(আমীর হামজা, "জৈগুণের পুঁথি")

ধর্মান্তরণের এই মৌলবাদী আগ্রহ থেকে নজরুল শত যোজন দূরে। তিনি লিখছেন —

'অবতার, পয়গম্বর কেউ বলেন নি আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি খ্রীস্টানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন আমি মানুষের জন্য এসেছি আলোর মত, সকলের জন্য।'

('হিন্দু-মুসলমান', "রুদ্রমঙ্গল")

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও ধর্মস্থানের চেয়ে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছেন মানুষের হৃদয়ধর্মকে। তাই লিখতে পেরেছেন।

'হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই।'

মানবতাবাদী কবির কাছে ঈশ্বর নয়, মানুষই তো শ্রেষ্ঠ।

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
('মানুষ', "সাম্যবাদী")

খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ

নজরুলের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল হঠাৎ জেগে ওঠা নির্ঝরের গান। তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে কাব্যে ও সঙ্গীতে আছে বেপরোয়া প্রাণশক্তির অমিত উচ্ছ্বাস।

কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিসলাম॥
হেসে গান গায় দিনরাত
ভায়া লাফ দেয় তিন হাত॥

বাঙালি মুসলমান হচ্ছে সেই দুর্ভাগা মানবগোষ্ঠী নানা ঐতিহাসিক বিড়ম্বনায় যে পীড়িত, প্রপীড়িত; নানা শৃঙ্খলে যার হাত পা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। উনিশ শতকের জাগরণ এসেছিল তাকে মুক্ত করতে। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে আছে বহুদিনের মানসিক দাসত্ব থেকে শৃঙ্খলমুক্ত একটি জাতির প্রতীকী আগ্নেয় বিস্ফোরণ। ডিরোজিওর কবিতায় শৃঙ্খলমুক্ত দাসের মতো —

'গোলামির পালা শেষ কী এক বিচিত্র অনুভূতি।'

স্পেনের কারাগার থেকে মুক্ত সম্রাটের মতো

'Now borken was his chain;
What were his feelings when he cried
"I am a king again"
আমি উন্মাদ আমি উন্মাদ
আমি চিনেছি আমারে আজিকে
আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ
'বল, মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া
খোদার আসন আরশ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাতৃর'
('বিদ্রোহী', "অগ্নিবীণা")

কোনও ধর্মগ্রন্থ মানুষকে এই সর্বজয়ী মহিমা দেয়নি, দিয়েছে রেনেসাঁস। রেনেসাঁস হচ্ছে 'discovery of man' ও 'discovery of the world', রেনেসাঁসের কবি ছাড়া কে বলবেন এ কথা —

'পাতাল ফেঁড়ে নামব নীচে, উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে
বিশ্ব জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।'
('সংকল্প')

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

একটি ভাষার বুকে যিনি এত বড় প্রত্যয় গেঁথে দিতে পারেন, একটি জাতিকে যিনি দেখাতে পারেন বিশ্বজয়ের স্বপ্ন তাঁর একটা স্বাধীন ভূখণ্ড থাকবে না বা নিজস্ব আইডেনটিটি থাকবে না, তা হতে পারে না। তাই রিভাইভ্যালিজমের অগ্রগতির ইতিহাসে নজরুল-পুষ্ট রেনেসাঁসের শক্তিও কম ছিল না তা প্রমাণিত হয় ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মে। ১৯৭১ সাল বাংলা ভাষা ও বাঙালি মুসলমানকে দিয়েছে একটি নিজস্ব আইডেনটিটি। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই বাঙালি মুসলমান উত্তীর্ণ হয়েছে তার প্রত্যাশিত স্বদেশে। মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষার এই তুফান জয়ী তরণীর প্রধান কাণ্ডারী ছিলেন নজরুল। কতরকম সঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছিল বাঙালি মুসলমানের যাত্রাপথে। পশ্চাৎপদ যাত্রীর মনে জেগেছিল কতরকম সন্দেহ।

'গিরি সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎপথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ?
করে হানহানি তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার!'

'দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥
—('কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', "সর্বহারা")

বঙ্কিমের বাংলা নয় নজরুলের বাংলা

নজরুল যদি বাংলা ভাষা ও মুসলিম জাগরণের হাল না ধরতেন তবে এ তরী তুফান অতিক্রম করত কিনা সন্দেহ। সংস্কৃত কণ্টকিত হিন্দুত্ববাদী, হীনমন্যতা সঞ্চারী বঙ্কিমের বাংলা নিয়ে তাঁরা কি একটি জাতিকে সমগ্রত সামিল করতে পারতেন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সত্যিকার যুদ্ধে? নজরুলের বাংলা বাঙালি মুসলমানকে দিয়েছিল নিশ্চিন্ত নির্ভরতা, অপরিসীম দুঃসাহস ও সর্ব সংকটমুক্ত অগ্রগামী চেতনা। বাংলা ভাষাকে তিনি ধার দিয়েছিলেন, ভার দিয়েছিলেন; বের করে এনেছিলেন মিশ্রভাষারীতির মরচে পড়া খাপ থেকে। বাঙালি মুসলমানের ধরবার মতো হাতলও দিয়েছিলেন। তার বুকে সাহস দিয়েছিলেন, পায়ে ছন্দ দিয়েছিলেন, চোখে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, প্রাণে গান দিয়েছিলেন আর নির্ভুল ভাবে চিনিয়ে দিয়েছিলেন শত্রু-মিত্র।

প্রতিভাবান বালকের মতো!

কে নজরুল? কেন নজরুল? —এ প্রশ্নের সাংস্কৃতিক সমাধান না হলে মনে হতেই পারে তাঁর কবিতা 'অসংযত অসংবৃত, প্রগলভ্, তাতে পরিণতির দিকে প্রবণতা নেই;

আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন।' মনে হতেই পারে তিনি যা করতে পেরেছিলেন তার পিছনে 'কোন ইতিহাস নেই, কতগুলো আকস্মিক কারণেই সম্ভব হয়েছিল এটা।' বাংলার জলজ্যান্ত ইতিহাস সামনে থাকতে শতবর্ষ পরেও যদি নজরুলবিচারে এই বালকসুলভ প্রগলভ্ মন্তব্যের মায়া কাটাতে না পারি, কাটিয়ে উঠতে না পারি নজরুলবিচারে অহেতুক বিচ্ছিন্নতা তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে!

সমকাল কিন্তু সঠিক ভাবেই চিনেছিল তাঁকে। বাংলার মুসলিম জাগরণের মধ্যে 'রিভাইভ্যালিজম' ও 'রেনেসাঁস'এর যে দুটি ধারা প্রথমাবধি ক্রিয়াশীল ছিল নজরুলের আগমন, উপস্থিতি ও ভূমিকা উভয়পক্ষের কারও নজর এড়িয়ে যায়নি। সমকালীন পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে উভয় পক্ষের নির্ভুল নজরুল-মূল্যায়নের দৃষ্টান্ত তুলে আনি।

'ইসলাম দর্শন' পত্রিকা নজরুল সম্পর্কে লিখেছিল —

"এই উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই, তাহা ইহার লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। হতভাগ্য যুবকটি ধর্মজ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানের সংসর্গ কখনও লাভ করে নাই, অন্ততঃ সেটুকু লাভ করিলেও পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে স্বীয় পৈশাচিক খড়্গ উত্তোলন করিত না। থাকুক তাহার লেখায় যথেষ্ট শক্তি, হউক সে বিখ্যাত কবি, তজ্জন্য মুসলমানের গৌরব করিবার কিছু নাই।'...

খাঁটি ইসলামী আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চয়।"

অপর পক্ষে নজরুল প্রতিভাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তরুণ মুসলমানসমাজ। 'মোয়াজ্জিন' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল —

"কবি নজরুলের পূর্ব্বে বঙ্গ-মোসলেম সমাজে কাব্য-সাহিত্যিকের অভাব অনুভব হইতেছিল; কিন্তু আজ এ সমাজ একজন মুসলমান কাব্য-সাহিত্যিকের অপূর্ব সৃষ্টি সম্পদের মহান দানে বঙ্গ সাহিত্যের আসর গৌরবান্বিত হইয়াছে দেখিয়া বুক ভরা তৃপ্তি অনুভব করত ক্রমশ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে। 'বিষের বাঁশী'র বাদক এই কবি মরেণোন্মুখ মোসলেমের — শুধু মোসলেমের নয় অমোসলেমেরও প্রাণে এক অভিনব স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য, ছন্দ নৈপুণ্য, শব্দায়ন চাতুর্য্য, উদ্দাম-উদ্দীপনাময় বিচ্ছুরিত বহ্নিশিখা বঙ্গ-সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। আর মুসলমান আজ তাহার একজন ভাইকে বঙ্গসাহিত্যের সুউচ্চ আসনে সমাসীন দেখিয়া জাতীয় অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে।"

বঙ্গ সাহিত্যে নজরুলের সুউচ্চ আসন দেখে যে তরুণ মুসলমান সমাজ সেদিন জাতীয় অস্তিত্ব উপলব্ধি করছিল তারাই একদিন সত্যকার যুদ্ধ পেরিয়ে পৌঁছেছিল 'স্বাধীন বাংলাদেশ' নামক একটি স্বদেশ ভূমিতে। নজরুলের কাব্যসাধনা তাই বৃথা যায়নি। তিনিও ডিরোজিওর মতো বলতে পারতেন।

'Ah, then I feel I have not lived in vain.'

শুধু মুসলমানের কবি নন

পরিশেষে বলে নেওয়া দরকার নজরুলকে শুধু মাত্র মুসলমানের কবি হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য এ নিবন্ধ লেখা হয়নি। এ নিবন্ধ লেখা হয়েছে তাঁকে বাঙালি মুসলমানের সংকটমুক্তির কবি হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য। নিদ্রামুক্তি বা জাগরণের কবি হিসাবে তাঁকে চিনে নিতে হলে বঙ্গীয় জাগরণের দ্বিভঙ্গ স্বরূপ ও তার পারস্পরিক টানাপোড়েনের জটিল প্রেক্ষিতটি জানা দরকার। জানা দরকার তাঁর প্রকৃত অবস্থানবিন্দু ও সঠিক ভূমিকাটি। বুঝে নেওয়া দরকার আসলে সংকটের ঠিক কোন অংশের দায় তাঁর উপর বর্তেছিল এবং কতটা সাফল্যের সঙ্গে কীভাবে তিনি তা থেকে নিজে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন একটি জাতির?

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।"
('কাণ্ডারী হুঁশিয়ার')

রিভাইভ্যালিজমের কবি হলে তিনি মোসলেম কবি হয়েই থেকে যেতেন, নজরুল ছিলেন রেনেসাঁসের কবি। তাই তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অবিভক্ত বাঙালির কবি। রেনেসাঁস ও রিভাইভ্যালিজমের মৌলিক পার্থক্য এইখানে। রিভাইভ্যালিজম হিন্দু-মুসলিম উভয়কেই টান দিয়েছিল পরস্পরের বিপরীত দিকে, রেনেসাঁসের প্রগতিশীল মানবতাবাদী ধারা দুই সম্প্রদায়কে একই মানবিক চেতনার বলয়ে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছে। বাঙালির দুর্ভাগ্য রেনেসাঁস ও রিভাইভ্যালিজমের তীব্র টানাপোড়েনে ঠেকানো যায়নি বঙ্গভঙ্গের ঘটনা। কিন্তু রেনেসাঁসের মৃত্যু নেই। তাই ভস্মের ভিতর থেকে ফিনিক্স পাখির মতো সে আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। কাঁটাতার বসেছে ভূগোলে কিন্তু রেনেসাঁসের সদর্থক আলো দুটি সমাজের মানসিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে যে জায়গায় উত্তীর্ণ করেছে সেখানে কোনও কাঁটাতার বসেনি। নজরুল রেনেসাঁসের কবি তাই মৌলিক রাশির মতোই তিনি অবিভাজ্য। □

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ

গোপালচন্দ্র রায়

কলকাতায় আকাশবাণীতে সকালের দিকে 'প্রাত্যহিকী' নামে একটা অনুষ্ঠান হয়। ওই বিভাগের কর্তৃপক্ষ বিষয় নির্বাচন করে দিলে এক পক্ষ ধরে (আগে ছিল এক মাস) সেই বিষয়ের উপর বিভিন্ন জনের লেখা পড়া হয়। গত মে মাসের (১৯৯৮) শেষ পক্ষে অর্থাৎ ১৬ই মে থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত প্রাত্যহিকীর বিষয় ছিল — কবি নজরুল ইসলামের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে — জ্যৈষ্ঠের ঝড় বা কাজী নজরুল।

ওই সময় আকাশবাণীর ওই প্রাত্যহিকীতে প্রতিদিনই নজরুলের উপর লেখা নানা জনের নানা রচনা বা চিঠি পড়া হয়েছে। একাধিক দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাতের একটা কাহিনী একাধিক লোকের লেখায় পড়া হয়েছে শুনেছি। এই কাহিনীটির উৎস কোথায় ওই পত্র প্রেরকদের কেউই অবশ্য তার উল্লেখ করেননি। এ সম্পর্কে আমি যতটা অনুমান করতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই —

কলকাতার 'সাহিত্যম্' থেকে প্রকাশিত 'নজরুল-স্মৃতি' নামে একটা বই আছে। বিভিন্ন জনের নজরুল সংক্রান্ত রচনা নিয়ে এই বইটি সম্পাদনা করেছেন বিশ্বনাথ দে। এই বইয়ে তখনকার 'বিজলী' পত্রিকাগোষ্ঠীর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'পুরোনো কথা' নামে একটা লেখা আছে। আমার দৃঢ় ধারণা প্রাত্যহিকীর আলোচ্য লেখকরা অবিনাশবাবুর এই লেখা পড়েই ওই কথা লিখেছেন। না হলে বলতে হবে, এঁরা অন্যত্র অবিনাশবাবুর মূল লেখা, ১৩৬২ সালের কার্তিক সংখ্যা মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত 'পুরোনো কথা' পড়েই এ কথা লিখেছেন। কেননা, অবিনাশবাবুই এই কাহিনীটি কেবল লিখেছেন।

অবিনাশবাবু লিখেছেন — 'বিজলী' পত্রিকায় নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হলে, 'পরের দিন সকালে এসে কবি চারখানা 'বিজলী' নিয়ে গেলো, বললে 'গুরুজীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'বেশ ফিরে এসে বোলো, তিনি দেখে কি বললেন।'

বিকেলে এসে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে যাওয়ার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করলে নজরুল।

তাঁর বাড়িতে গিয়ে 'গুরুজী' 'গুরুজী' ব'লে চেঁচাতে থাকে। উপর থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, কী কাজী, অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছো কেন, কী হয়েছে?

'আপনাকে হত্যা করবো, গুরুজী, আপনাকে হত্যা করবো।'

'হত্যা করবো, হত্যা করবো কি? এসো, ওপরে এসো বসো'।

'হ্যাঁ, সত্যিই বলছি, আপনাকে হত্যা করবো, বসুন, শুনুন।'

কাজী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে 'বিজলী' হাতে নিয়ে উচ্চস্বরে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তাঁকে শুনিয়ে দিলো!

তিনি স্তব্ধ-বিস্ময়ে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন, হ্যাঁ কাজী, তুমি আমায় সত্যই হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্वবিখ্যাত কবি হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার কবিতায় জগৎ আলোকিত হোক্, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।'

এখন এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য —

নজরুল তো তখনকার অনেক কবি সাহিত্যিকের ন্যায় রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলেই সম্বোধন করতেন। তাই প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব না বলে, নজরুল হঠাৎই রবীন্দ্রনাথদের বাড়িতে ঢুকে 'গুরুজী' 'গুরুজী' বলে চিৎকার করেছিলেন? এ বিশ্বাস হয় না।

নজরুল বন্ধু মহলে বা অন্যত্র যতই উদ্দাম ও উচ্ছল প্রকৃতির হোন না কেন, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, তিনি যদি সেদিন সত্যই রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন, তাহলে তিনি বাড়িতে ঢুকে আগে কারও কাছে খোঁজ নিতেন, রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে আছেন কি না? বাড়িতে ঢুকেই ওইভাবে 'গুরুজী' 'গুরুজী' ব'লে চীৎকার করতেন না।

নজরুল তাঁর 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' রচনায় লিখেছেন — 'বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা নয়, পূজা করে এসেছি সকল হৃদয় মন দিয়ে। যেমন করে ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে পূজা করে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর ছবি সামনে রেখে গন্ধ-ধূপ-ফুল চন্দন দিয়ে সকাল সন্ধ্যা বন্দনা করেছি।'

যে নজরুল ছেলেবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথকে এত শ্রদ্ধাভক্তি করেছেন, সেই নজরুলই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে হঠাৎই 'আপনাকে হত্যা করবো, হত্যা করবো' বলতে পারেন? এও বিশ্বাস হয় না।

নজরুল সত্যই যদি সেদিন তাঁর বিদ্রোহী কবিতা পড়ে শোনাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন, তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বলতেন — গুরুদেব, শুনুন, আমি একটা কি রকম দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেছি। বা এই ধরণেরই কোনও কথা।

আর 'হত্যা করবো' 'হত্যা করবো' এটাই বা কি কথা! নজরুলের মুখে এতই কি ভাষার অভাব হয়েছিল, যে, (ঘটনাটাকে সত্য বলে মানলেও) 'হত্যা করবো' 'হত্যা করবো' ছাড়া অন্য কথা বলতে পারলেন না!

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঢুকে নজরুলের গুরুজী গুরুজী চিৎকার এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে 'আপনাকে হত্যা করবো, হত্যা করবো' — এ কথা যেমন বিশ্বাস করা যায় না, তেমনই রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বলেছিলেন — কী কাজী, অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন, — এ কথাও আদৌ বিশ্বাস্য নয়। রবীন্দ্রনাথ ও-ভাষা বলতেই পারেন না।

যাই হোক, এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা হল — অবিনাশবাবু যে বলেছেন, 'বিজলী'তে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পরদিন নজরুল ওই সংখ্যা 'বিজলী' পত্রিকা হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন, এবং গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিদ্রোহী কবিতা পড়ে শুনিয়ে ছিলেন। এ কথা ঠিক নয়। কারণ —

১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারির সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। অবিনাশবাবুর কথা অনুযায়ী নজরুল ৭ই জানুয়ারি সকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ ৭ই তারিখে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ত ছিলেনই না, এমন কি ওই তারিখের আগে পরেও কয়েকদিন করে কলকাতায় ছিলেন না।

ওই সময়কার কথা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী–৩য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন —

'প্রায় আড়াই মাস (৮ সেপ্টেম্বর হইতে ২৮ ডিসেম্বর) একাদিক্রমে শান্তিনিকেতনে কবি বাস করিতেছেন — শরীর মন ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই কয়েকদিন বিশ্রামের জন্য গেলেন শিলাইদহ। সাত দিন পরে শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিনিকেতন হইতে বালিকা রাণুকে এই পত্রখানি লেখেন — (২২ পৌষ ১৩২৯)।

'আমি নদী ভালোবাসি। ... তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত-চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে-চিন্তাস্রোত বয়ে যাচ্ছে, সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে — এইজন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব।'

বালিকা রাণুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার আর একটি চিঠির উল্লেখ করেও প্রভাতবাবু লিখেছেন — 'পৌষ সংক্রান্তির (১৪ জানুয়ারি ১৯২২) দিন নাটকটি শেষ করিয়া একপত্রে লিখিতেছেন, 'আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম — শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ আমার ছুটি।... এর নাম 'পথ'। পরে পথের নাম দেন 'মুক্তধারা'।

পরদিন আশ্রমবাসীদের নিকট নাটকটি পড়িয়া শোনান। তৎপর দিবস কলিকাতায় গেলেন সেখানে বন্ধুমহলেও শোনানো চাই।... দুই দিন পরেই আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।' (পৃঃ ১১৫)

এখানে প্রভাতবাবুর লেখায় তারপর দিবস কলিকাতায় গেলেন, হল — কবি ১৬ই জানুয়ারি কলকাতায় যান।

আমাদের মনে হয়, নজরুল হয়ত জোড়াসাঁকোয় গিয়ে একদিন তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা পড়ে বা আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েও থাকতে পারেন। তবে সে ওই ১৯২২-এর ১৫ই জানুয়ারির পরে। আর ওই গুরুজী গুরুজী বলে চিৎকার করে বা হত্যা করবো, হত্যা করবো বলেও নয়।

অবিনাশবাবুর বর্ণিত, তাঁর কাছে নজরুলের বলা ওই গুরুজী ইত্যাদির কাহিনী যদি সত্য বলেই মানতে হয়, তাহলে বলব — নজরুল হয়ত যা নয়, তাই-ই বানিয়ে পরিহাস করে বা মজা করবার জন্য বন্ধুস্থানীয় অবিনাশবাবুর কাছে ওই কথা বলেছিলেন। কারণ, নজরুল পরিহাসপ্রিয় ও অত্যন্ত রঙ্গপ্রিয় মানুষ ছিলেন। আর বন্ধুমহলে তো খুবই মজা করতেন।

নজরুল ব্যঙ্গ ও শ্লেষ-সহ যেমন প্রচুর হাসির গান লিখেছেন, তেমনই বন্ধুমহলে এবং অন্যত্রও হাসি, ঠাট্টা, ইয়ার্কি ও মজা করা নিয়ে মশগুল থাকতেন। দু' একটা উদাহরণ দিচ্ছি —

১. এস. এম. এহিয়া তাঁর 'হাসির রাজা নজরুল' প্রবন্ধে লিখেছেন — 'ছেলেবেলা থেকেই তিনি (নজরুল) রঙ্গপ্রিয়, নির্দোষ হাস্য-কৌতুকে তখনকার দিনে তাঁর জুড়ি ছিল না।... উপভোগ্য কৌতুকরস সৃষ্টিতে নজরুল ছিলেন দক্ষ কারিগর।'

২. একবার এক হিন্দু ভদ্রমহিলা নজরুলের কাছে গান শিখতে যান। ভদ্রমহিলা গেলে, নজরুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — এতদিন কার কাছে গান শিখতেন?

উত্তরে মহিলা বললেন — গিরিজাবাবুর কাছে।

তখনকার দিনে গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। মহিলাটি ওই গিরিজাবাবুর কাছেই গান শিখতেন।

নজরুল ভদ্রমহিলার মুখে গিরিজা শুনেই হেসে বললেন — তা গীর্জা থেকে একেবারে মসজিদে চলে এলেন?

মহিলা নজরুলের পরিহাস শুনে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

৩. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'ধূমকেতুর কবি নজরুল' প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন — ধূমকেতুর আড্ডায় সারাদিন লোকের পর লোক আসে, কেউ পরিচিত হতে, কেউ লেখা দিতে, কেউ আদর্শের ঐক্য জ্ঞাপন করতে, কেউ-বা প্রেরণা লাভ করতে। মাটির ভাঁড়ে করে চা সবার জন্য তৈরি। একদিন এল সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি কিশোর। ফরিদপুর থেকে এসেছে, নাম হুমায়ুন কবীর।

অনেক প্রশ্নের মধ্যে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল — আচ্ছা, আপনারা মাটির ভাঁড়ে করে চা খান কেন?

জবাবে বললাম — একটু বসে থাকলে নিজেই এর জবাব পেয়ে যাবে। একটু পরেই নলিনীদা (নলিনীকান্ত সরকার) এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল আধ-ভর্তি চায়ের ভাঁড় শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল — দে গরুর গা ধুইয়ে! চা ছিটকে পড়ল মেঝেতে মাদুরে বইয়ে-কাগজে — সবার গায়ে। ভাঁড়টা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কবীরের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন বুঝতে পারছ এখানে ভাঁড়ে চা খাওয়ার রেওয়াজ কেন? গরুর গা ধুইয়ে দিতে প্রথম তিন দিনেই দু ডজন কাপের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। কাপ ভাঙা মিঠে আওয়াজ শোনবার জন্য নিত্যি কাপ কেনা হবে, এমন কাপ্তেন আমাদের মধ্যে কেউ নেই।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, বিজলী-সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার 'ধূমকেতু'র আড্ডায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল এইরূপ মজা করেছিলেন। তাই যে-নজরুল নলিনীবাবুকে নিয়ে এরূপ মজা করতেন, সেই নজরুল বিজলীর অন্যতম কর্ণধার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, যাকে নজরুল অবিদা, অবিদা বলতেন — তাঁর কাছেও তো মজা করে — জোড়াসাঁকোয় গিয়ে ওই গুরুজী, গুরুজী ইত্যাদি বলার কাহিনীটি বানিয়ে বলতে পারেন!

নলিনীকান্ত সরকারও তাঁর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' বইয়ে লিখেছেন — 'সাহিত্যে নজরুল, সঙ্গীতে নজরুল, সভাসমিতিতে নজরুল, আড্ডা মজলিসে নজরুল... রঙ্গরসে নজরুল... কোথায় কিসে নাই নজরুল।'

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরোনো কথা' প্রবন্ধে নজরুলের জোড়াসাঁকোয় গিয়ে গুরুজী গুরুজী ইত্যাদি বলার যে কাহিনী লিখেছেন, তাতে তিনি পরিষ্কার বলেননি যে, এইটাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ। অবিনাশবাবু না বললেও, অনেকেই কিন্তু অবিনাশবাবুর লেখা পড়ে এইটাকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ বলেছেন।

১৩৯৪ সালের শারদীয় সংখ্যা 'অনুবাদ' পত্রিকায় তিতাশ চৌধুরী, তাঁর 'নজরুল-রবীন্দ্র সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখেছেন —

'নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহম্মদ বলেছেন,... রবীন্দ্র-ভক্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর। রফিকুল ইসলামের 'নজরুল-জীবনী' পড়ে জানা যায় যে, অবিনাশ ভট্টাচার্য কথিত 'রবীন্দ্র-নজরুল' সাক্ষাৎকারের সন-তারিখ মিলিয়ে দেখলে বিশ্বাস্য নয়। এ নিয়ে শাহাবুদ্দীন আহম্মদ প্রশ্ন তুলেছেন,... তাহলে অবিনাশ ভট্টাচার্যের কথা কি মিথ্যা? অবিনাশ ভট্টাচার্যের কথায় আছে যে, নজরুলের মুখে বিদ্রোহী শোনার পর রবীন্দ্রনাথ স্তব্ধ বিস্ময়ে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন... ইত্যাদি ইত্যাদি। শাহাবুদ্দিন আহম্মদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎকারের আরও আলামত হিসেবে নজরুলের অগ্রুপুষ্পাঞ্জলি কবিতাটির কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করেন এইভাবে : ধ্যান শান্ত মৌন তব কাব্যরবিলোকে / সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম/রুদ্রের দুরন্ত দূত, ছিন্ন হর-জটা কক্ষচ্যুত উপগ্রহ। বক্ষধরি তুমি/ ললাটে চুমিয়া মোর দানিলে আশিস। এবং তারপর বলেন, বুকে জড়িয়ে ললাট চুম্বন করে আশীর্বাদ দানের ঘটনা ঠিক, মিথ্যা ছিল না। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, অবিনাশ ভট্টাচার্যের কথা মিথ্যা বা ঘটনাটি মিথ্যা ছিল একথা কে বললেন শাহাবুদ্দীন আহম্মদকে? ডঃ রফিকুল ইসলাম? তিনি তো সন-তারিখের কথা বলেছেন মাত্র। আসলে সন-তারিখ মিলিয়ে দেখলে অর্থাৎ একটু সত্যসন্ধ ও সময় ও কাল সচেতন হলে ডঃ রফিকুল ইসলামের যুক্তি ও তর্ক নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহম্মদের মেধা ও মননকে এমনভাবে উস্কে দিত না। কেননা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯২২ সালের[১] অক্টোবরে, শাহাবুদ্দীন আহম্মদের মতে বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশের পর নয়।... নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম প্রকাশের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎকারের কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ নিয়ে এই তো গেল, 'বিজলী' গোষ্ঠীর নজরুলের পরিচিত বা তাঁর 'অবিদা' অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা। এ প্রসঙ্গে নজরুলের আর এক পরিচিত কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

'জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

১. তিতাশ চৌধুরীর লেখায় এখানে তারিখটা ছাপার ভুলে ১৯২২ হয়েছে, হবে ১৯২১।

যাবার সময় তেমন তেমন বড় লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি — অতি বাক্‌পটুকেও ঢোঁক গিলে কথা বলতে শুনেছি — কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়িতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বলতো, তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সাহসই হবে না তোর এমন ভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি তা পারেন। তাই একদিন সকাল বেলা 'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে তিনি কবির ঘরে গিয়ে উঠলেন — কিন্তু তাঁকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলেন না। শুনেছি, অনেক কথাবার্তার পর কবি নাকি বলেছিলেন — নজরুল তুমি নাকি তরোয়াল দিয়ে আজকাল দাড়ি কামাচ্ছ — ক্ষুরই ও কার্যের জন্যে প্রশস্ত — একথা পূর্বাচার্যগণ বলে গেছেন।

সাবিত্রীপ্রসন্নবাবুর এই লেখা প্রকাশিত হয়, বুদ্ধদেব বসুর ১৩৫১ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকায়। পূর্বোক্ত বিশ্বনাথ দে তাঁর 'নজরুল স্মৃতি' গ্রন্থে এই লেখার দাড়ি কামানোর কথাটা বাদ দিয়ে বাকিটা উদ্ধৃত করেছেন। তবে কোথা থেকে নিয়েছেন, তা তিনি তাঁর অন্যান্য সংকলিত লেখাগুলির মত এটার ক্ষেত্রেও তা বলেন নি।

তরোয়াল দিয়ে দাড়ি কামানোর যে কাহিনী আমরা পড়ি সে তো অনেক পরের ঘটনা। নজরুল একদিন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে, তখন রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে একথা বলেছিলেন। তাও সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু যা লিখেছেন, তা নয়। একটু অন্য এবং সঙ্গত কথাই। এ নিয়ে সৌমেন্দ্রনাথ তাঁর 'যাত্রী' গ্রন্থে লিখেছেন —

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বলেছিলেন — শুনছি, তুমি নাকি মন জোগানো লেখা লিখতে শুরু করেছ। বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তরোয়াল হাতে, সে তরোয়াল কি তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন দাড়ি চাঁচবার জন্য।

নজরুল রবীন্দ্রনাথের কথার অর্থ ঠিক ধরতে না পেরে, এ নিয়ে পরে এক কবিতায় লিখেছিলেন। সেই কবিতা হল —

মনে পড়ে? বলেছিলে হেসে একদিন
তরবারি দিয়ে তুমি চাঁচিতেছো দাড়ি
আমার হাতের সেই খর তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি।
দ্রষ্টা তুমি দেখেছিলে আমাতে যে জ্যোতি
সে জ্যোতি হয়েছে লীন কৃষ্ণ ঘন রূপে।
অভিনন্দনের মদ্ ছন্দিত মধু
হইয়াছে হে সুন্দর তব আশীর্বাদে।

সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু লিখেছেন — 'দে গরুর গা ধুইয়ে' রব তুলতে তুলতে নজরুল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

এখানেও প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে আছেন কি না, কাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করেই নজরুল সিধা দুতলায় ওই রব করতে করতে চলে গেলেন?

আর একটা কথা — সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে চিনতেন বলেই তিনি এতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলেন না। এই 'চিনতেন' কি রকম? আগে কি নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল? না নজরুল সম্বন্ধে ওইরূপ কোনও কথা কারও কাছে শুনেছিলেন?

অনেক লোকের যেমন — হলনা কেন, মনে কর, তোমার দিয়ে প্রভৃতি মুদ্রাদোষ আছে, এবং কথায় কথায় এরূপ কথা বলে থাকে, নজরুলও তেমনি মুদ্রাদোষই হোক বা মুদ্রাগুণই হোক বা কথার মাত্রাই হোক মাঝে মাঝে কথার মধ্যে বা অমনিই আবেগ বশে কখনও কখনও 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে উঠতেন। তাঁর 'দে গরুর গা ধুইয়ে' নামে একটা কবিতাও আছে।

পশ্চিমবঙ্গের এবং বাংলাদেশের বহু লেখক নজরুলের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁদের অনেকে কেউ অবিনাশবাবুর লেখা এই 'গুরুজী' 'গুরুজী' কাহিনী, কেউ সাবিত্রীপ্রসন্নবাবুর লেখা 'দে গরুর গা ধুইয়ে' কাহিনী, আবার কেউ বা ওই দুটো কাহিনীই তাঁদের বইয়ে দিয়েছেন। যেমন, এই পশ্চিমবঙ্গের একজন নজরুল গবেষক সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর বইয়ে সাবিত্রীপ্রসন্নবাবুর কাহিনীটি দিয়েছেন, অপরজন বাঁধন সেনগুপ্ত তাঁর বইয়ে ওই দুটো কাহিনীই দিয়েছেন।

অথচ এঁরা কেউই 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে রবীন্দ্রনাথের কাছে নজরুলের ওইভাবে যাওয়া সত্য কি না এ নিয়ে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। ফলে ওই কাহিনীকে এঁরা একরূপ সত্য বলেই মেনে নিয়েছেন।

'গুরুজী' 'গুরুজী' কাহিনীর উচ্চারিত বাক্যগুলি, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কথাও বাঁধনবাবু সত্য কি না প্রশ্ন না তোলায় সত্য বলেই মেনে নিয়েছেন।

যাই হোক, তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তার যতগুলো পরিচয় পাওয়া গেছে, সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে, নজরুল বিনীত এবং ভদ্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথও সস্নেহে তাঁকে গ্রহণ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামনে খ্যাতনামা ব্যক্তিদেরও উপস্থিতি সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর একটা লেখা মনে পড়ছে। সেই কাহিনীটা এখানে বলছি —

নাট্য মন্দিরে শিশিরকুমার ভাদুড়ী রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। শিশিরবাবু ওই অভিনয় দেখবার জন্য একদিন রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। শিশিরবাবু সেদিন 'কল্লোল' গোষ্ঠীর কয়েকজন সাহিত্যিককেও আমন্ত্রণ জানান।

নাটক দেখে চলে যাবার সময় রবীন্দ্রনাথ শিশিরবাবুকে বলেছিলেন — কাল সকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এস, নাটক নিয়ে কথা হবে। ওই সঙ্গে সেখানে উপস্থিত কল্লোলের কয়েকজনকেও তিনি ওই কথা বলেছিলেন।

পরের দিন সকালে কল্লোলের লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন। সেদিনের কথা প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন —

'শিশিরকুমার আমাদের কাছে বিরাট বনস্পতি — অনেক উচ্চস্থ। কিন্তু সেদিন রবীন্দ্রনাথের সামনে ক্ষণকালের জন্য হলেও শিশিরকুমার ও আমাদের মধ্যে যেন কোনই প্রভেদ ছিল না। দেবতাত্মা নাগাধিরাজের কাছে বৃক্ষ তৃণ সবই সমান।'

প্রায় এই রকমেরই একটা কথা পাই আর একজনের একটা লেখায়। তিনি দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় তাঁর এক প্রবন্ধে লেখেন — একজন প্রেস ফটোগ্রাফারের বড় সাধ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের একসঙ্গে একটা ফটো তোলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় আছেন জেনে ওই ফটোগ্রাফার তাঁর মনের কথা নজরুলকে জানান। নজরুল তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেন — যাও, কোথায় হিমালয় আর কোথায় বল্মীকস্তূপ!

দেখা যাচ্ছে, ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের উপর নজরুলের কী শ্রদ্ধা! এ হেন নজরুল জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে — আপনাকে হত্যা করবো, হত্যা করবো বলে তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন, এ কি বিশ্বাস্য?

নজরুল কীভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রথম গিয়েছিলেন, এ নিয়ে সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু এবং 'বিজলী' গোষ্ঠীর অবিনাশবাবুর বক্তব্যের মধ্যে যেমন মিল বা ঐক্য নেই, ঠিক এমনই শরৎচন্দ্রের একবার বহরমপুর যাওয়া নিয়ে এই সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু এবং বিজলী সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকারের বর্ণনার মধ্যেও অমিল দেখি। এ সম্পর্কে এখানে একটু বিস্তৃতই আলোচনা করছি —

নলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' বইয়ে লিখেছেন — শরৎচন্দ্র একবার তাঁর কি একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বহরমপুরে গেলে, তাঁর অনুমতি নিয়েই স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ তাঁকে এক সভায় সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেন। সভার সময় স্থির হয় বিকাল ৫টায়। শরৎচন্দ্র আহারের পর মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর এস্টেটের ইঞ্জিনীয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখতে যান। দেখা হলে গঙ্গার ধারে বসে যতীনবাবুর সঙ্গে গল্প করেন। সভার সময় চলে যাচ্ছে — যতীনবাবু বার বার একথা বলা সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্র নানা অছিলায় আরও অনেক দেরি করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সম্বর্ধনা সভায় আর এলেনই না।' — নলিনীবাবু লিখেছেন, এ কথা তিনি যতীন সেনগুপ্তর মুখে শুনেছেন।

শরৎচন্দ্র বহরমপুরে গিয়ে কবি যতীন সেনগুপ্তকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের আবার একটা লেখা (শরৎ-স্মরণিকায়) চোখে পড়ায় দেখছি, তাতে তিনি লিখেছেন — শরৎচন্দ্র এবং যতীনবাবুর সঙ্গে সেদিন সাবিত্রীপ্রসন্নবাবুও গিয়েছিলেন। সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু লিখেছেন — শরৎচন্দ্র সেবার বহরমপুর গিয়েছিলেন, সেখানকার কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবে প্রধান অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণ নিয়ে। আর সেই সভাতেই শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাবারও ব্যবস্থা হয়েছিল। চারটে নাগাদ তো তোমাদের সভা, বলে শরৎচন্দ্র দুপুরের পর মুর্শিদাবাদে সিরাজের কবর দেখতে গিয়েছিলেন। কবর দেখে গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ বসে সৈদাবাদ রাজবাড়ির ফটকে যখন ফেরেন, তখন সাড়ে ছটা বেজেছে। — না, খুব অন্যায় হয়ে গেল, বলে শরৎচন্দ্র সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন, কারও দিকে ফিরেও তাকালেন না।

এতে সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু ও যতীনবাবু বিষণ্ণ মনে সভায় খবরটা দেবার জন্য যখন আসছেন, এমন সময় পথে শুনলেন, সভায় হাজার খানেক লোক হয়েছিল, মহিলারাও এসেছিলেন। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী জোড় হাত করে সভাস্থ সকলকে বলেন, বুঝতে পারছি না, শরৎবাবু কি অসুস্থ হয়ে পড়লেন? লোক পাঠিয়েছি, সে এখনো ফিরে আসেনি। আপনারা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা করবেন। — এরপর নমঃ নমঃ করে সভা শেষ হয়েছে।

সাবিত্রীপ্রসন্নবাবু লিখেছেন — পরের দিন 'সকালে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম, তিনি রাত্রির গাড়ীতে কলকাতা ফিরে গেছেন।'

মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে ১৯৭৬ সালের ১৩ই আগস্ট থেকে ১৯শে আগস্ট পর্যন্ত এক সপ্তাহ ধরে মহাআড়ম্বরে শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। ওই উৎসবে ১৫ই তারিখের বিকালের সভায় বর্তমান লেখক অর্থাৎ আমি ছিলাম সভাপতি, আর বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ত্রিদিব চৌধুরী এম. পি. ছিলেন প্রধান অতিথি।

সেখানে ১৪ই তারিখে বিকালে হিন্দি সভায়ও ত্রিদিববাবু এবং আমি উভয়েই বক্তা ছিলাম। সেদিন ত্রিদিববাবু তাঁর বক্তৃতায় এক জায়গায় বলেছিলেন — শরৎচন্দ্রকে আমি কাছে থেকে দেখেছি। তিনি একবার আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে একটি সভায় গিয়েছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার দু'একটা কথাও হয়েছিল।

সভার পরে ত্রিদিববাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শরৎচন্দ্র কবে, কিসের সভায় বহরমপুরে গিয়েছিলেন? আমার কথার উত্তরে তখন তিনি বলেছিলেন —

আমি তখন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়ি। সেটা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের কথা। খুব সম্ভব তখন আগস্ট মাস। সেই সময় শরৎচন্দ্র একবার বহরমপুরে যান। তখনকার দিনে কলকাতা থেকে রাত্রি ১০টা-১১টা নাগাদ একটা 'লালগোলা প্যাসেঞ্জার' ছাড়ত। ওই ট্রেনটা পরের দিন ঠিক সকালেই বহরমপুরে গিয়ে পৌঁছত।

শরৎচন্দ্র ওই রাত্রের ট্রেনে চেপে সকালেই বহরমপুরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। তিনি বহরমপুর শহরে গিয়ে উত্তর প্রান্তে সৈদাবাদে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'সৈদাবাদ হাউসে' উঠেছিলেন। ওই বাড়িতে এখন মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি হয়েছে।

এই সৈদাবাদেই মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর মামিমা মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবীর নামে তখন ছিল 'স্বর্ণময়ী ক্লাব'। শরৎচন্দ্র গিয়েছিলেন, ওই স্বর্ণময়ী ক্লাবের এক বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করতে।

শরৎচন্দ্র বহরমপুরে 'স্বর্ণময়ী ক্লাবে' আসবেন শুনে আমরাও আমাদের 'যুব সমিতি'র এক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। সকালে ছিল স্বর্ণময়ী ক্লাবের বার্ষিক উৎসব, ওই সভার পর বিকালে অথবা সন্ধ্যায় তিনি আমাদের যুব সমিতির সভায় আসবেন বলে কথা দেন।

আমাদের যুব সমিতি ছিল বহরমপুরের গ্রান্ট হলে। গ্রান্ট হল শহরের মাঝখানে। এর নিকটেই ছেলেদের ও মেয়েদের কলেজ এবং ছাত্রাবাস ইত্যাদি।

সকালে স্বর্ণময়ী ক্লাবের সভার পর স্নানাহার সেরে শরৎচন্দ্র নৌকায় করে সৈদাবাদ থেকে মাইল চার দূরে মুর্শিদাবাদ শহরে গঙ্গার পশ্চিম পারে এলাহিগঞ্জে সিরাজদ্দৌলার সমাধি দেখতে যান। তারপর সেখান থেকে নৌকায় বহরমপুর ঘাটে আসেন। যুব সমিতির সভারা ঘাট থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে গ্রান্ট হলে তাঁকে নিয়ে আসেন।

পরে এ সম্পর্কে বহরমপুরের বিখ্যাত বৈকুণ্ঠ সেনের পৌত্র শোভেন্দ্রমোহন সেনকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। শোভেন্দ্রবাবু তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি বললেন — শরৎচন্দ্র সেবার সৈদাবাদ রাজবাড়ির নিকটেই এক পৃথক বাড়িতে অবস্থিত মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। এই সমিতির প্রধান কাজ ছিল, নিঃস্ব ও দুঃস্থদের সাহায্য করা এবং আর্ত ও রোগীর সেবা করা।

শোভেন্দ্রবাবুর কথা ছাড়াও শরৎচন্দ্র স্বর্ণময়ী সমিতির বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করতে গেলে, তখন সমিতির সভাবৃন্দ তাঁকে যে মানপত্র দিয়েছিলেন, সেটিও অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। এই মানপত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে — শরৎচন্দ্র বহরমপুরে ব্যক্তিগত কাজে বা কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবে যাননি, গিয়েছিলেন মহারাণী স্বর্ণময়ী সমিতির বার্ষিক উৎসবেই।

ত্রিদিববাবুর কথা থেকে জানা যাচ্ছে, কলেজে বা যেখানেই শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়ে থাক, তিনি সিরাজদ্দৌলার কবর দেখে দেরি করে শেষ পর্যন্ত সম্বর্ধনা সভায় যাননি। তবে রাত্রে ত্রিদিববাবুদের যুব সংঘের সভায় গিয়েছিলেন।

ত্রিদিববাবু অনেকদিন পরে স্মৃতি থেকে বলতে গিয়ে বলেছিলেন — ১৯২৯ সালের সম্ভবত আগস্ট মাসের ঘটনা। স্বর্ণময়ী সমিতির প্রদত্ত মানপত্রে তারিখ আছে — ১০ই ভাদ্র ১৩৩৫। অর্থাৎ ত্রিদিববাবুর বলা ১৯২৯ সালের আগস্ট নয়, ১৯২৮ সালের আগস্ট।

সৈদাবাদের স্বর্ণময়ী সমিতির প্রদত্ত এই মানপত্রের মতো কোনও সঠিক প্রমাণ বা কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হাতে থাকলে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ কবে কোথায় কিভাবে হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যেত। তবে এবার যে ঘটনাটা বলছি, এটা সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য বলেই মনে করছি —

১৩৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কথা সাহিত্য' পত্রিকা নজরুল সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এক সময়কার একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর ছোটভাই, পরে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরি আশ্রমের অধিবাসী নিশিকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর 'আমার কৈশোর স্মৃতিতে নজরুল' প্রবন্ধে লিখেছেন — 'সবে শিশু বিভাগ থেকে নতুন গুরুপল্লীতে দাদা সুধাকান্তর বাড়িতে এসেছি। বৌদি তাঁর শিশুপুত্র সৌম্যকান্তকে নিয়ে পিত্রালয় শিবহাটি গ্রাম থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন। এই সময় একদিন আমাদের বাড়িতে দাদা তাঁর বন্ধুবান্ধবদের বলছেন শুনলাম — হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ সন্ধ্যায় গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। সুধাকান্তের ওপরই ভার পড়ল তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার, অতিথি ভবনে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার ও কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার। গুরুপল্লীর এই বাড়িটিতেই সুধাকান্তের বন্ধুরা আসতেন এবং তাঁদের আড্ডাটি বেশ জমে উঠত। সুধাকান্ত ছিলেন মজলিসী মানুষ। নানা কথাবার্তার মধ্যে নজরুলের কবিতা নিয়েও আলোচনা হত। দাদার সঙ্গে নজরুলের সবিশেষ পরিচয় আছে — এ খবরটিও আমার কাছে বিশেষ আনন্দের হয়ে উঠল।

'মোসলেম ভারত' পত্রিকা দাদার কাছে আসতে লাগল, তখন নজরুলের কবিতা নিয়মিতভাবে ওই পত্রিকার প্রথম দিকেই দেখতে পেতাম ও সাগ্রহে পাঠ করতাম। শুনলাম পূর্বোল্লিখিত কলাভবনের দোতালায় সান্ধ্য-আসর বসবে, সচকিত মন নিয়ে দাদার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলাম, দেখলাম, কবিগুরু বসে

আছেন মাঝখানে। ...সকলেই সমবেত হয়েছেন। কবিগুরুর পাশে দু'জন আগন্তুক সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাঁদের একজনকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দাদা সুধাকান্ত আমাকে বললেন, ওই দেখ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এই কথা বলে দাদা নজরুলের সান্নিধ্যেই বসলেন। নজরুলের পাশেই ফেজ পরা কাঁচাপাকা দাড়ি নিয়ে একজন বসে আছেন।

তিনি কবিগুরুকে বলছিলেন — ট্রেনে আসতে আসতে কাজী সাহেব আপনার গীতাঞ্জলির সব ক'টা গান আমাকে গেয়ে গেয়ে শুনিয়েছেন। কবিগুরু বললেন,— তাই নাকি? অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তো! আমার গীতাঞ্জলির গান সবতো আমারই মনে থাকে না।

কাজী সাহেব বললেন, গুরুদেব আমি আপনার কণ্ঠে একটি গান আর একটি কবিতার আবৃত্তি শুনতে চাই। গুরুদেব বললেন, সে কি? আমি যে তোমার গান আবৃত্তি শোনার জন্য প্রতীক্ষা করে আছি, তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও। আমাকে আবার রাত্রিবেলা লেখায় ব্যাপৃত থাকতে হবে। নজরুল দ্বিরুক্তি না করে আবৃত্তি করলেন —'আগমনী' কবিতাটি।'

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমের অধিবাসী নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর বর্ণিত এই কাহিনীটিকে সত্য বলে মনে করি। নিশিকান্তবাবু তাঁর এই লেখায় বলেছেন — কাঁচাপাকা দাড়ি নিয়ে একজন বসে আছেন — তিনি ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক (পরে ডক্টর) মহম্মদ শহীদুল্লা। তিনি প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

নিশিকান্তবাবু লিখেছেন, তাঁর দাদা সুধাকান্তর বাড়িতে বন্ধুদের আড্ডায় নজরুলের কবিতা নিয়েও আলোচনা হত। সুধাকান্তবাবু নিজে কবিতা লিখতেন বলে, 'মোসলেম ভারত' মাসিক পত্রিকায় নজরুলের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হতেন। তিনি 'সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের প্রতি' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর ওই কবিতাটি ১৩২৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সুধাকান্তবাবুর সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি —

সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের প্রতি

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

ছন্দে গানে বাজাও কবি বাজাও প্রাণের গান,
মুগ্ধ কর বিশ্বজনে দাও গো নূতন প্রাণ।
দমকে চলা হাওয়ার মত ছন্দ তোমার চলে
মাড়িয়ে দিয়ে সকল বাধা ক্ষিপ্র চরণ তলে।
যৌবনেরি জীবন দিয়ে বৃদ্ধে তরুণ কর,
রাগ-রসেরি পরশ দিয়ে চিত্ত অরুণ কর।
'সে-কাল' বুড়োর অধর সীমায় মদের পাত্র ধরি
তোমরা তারে 'একাল' কর, মাতাও নতুন করি।
সমাজ বিশ্বে নয় তোমাদের জীবন নদীর বাধা,
তোমার বীণায় বিশ্ব গানের সকল সুরই সাধা।
তোমার গানের সুরের তাতে অসাড় মারণ জাগে,
যে রসিকের হৃদয় ভরে প্রণয় অনুরাগে।
বন্ধুজনের প্রীতির মালা তোমায় দিলাম আজ,
পরবে কি গো এ? নাই যে এতে পান্না চুনীর কাজ।
মহব্বতের ফুলের শ্বাস এই মালাতে আছে,
খোস্-বু তাহার পৌঁছে দিনু ছন্দে তোমার কাছে।

'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হত। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথও 'মোসলেম ভারত' নজরুলের কবিতা পড়ে, তাঁর প্রতি গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন।

নজরুলের এই প্রথম শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়ার একটা কারণও ঘটেছিল।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'চলমান জীবন' ২য় খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন, তাঁর উপস্থিতিতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নজরুলের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হয়েছিল — সত্যেন্দ্রনাথ নজরুলকে বললেন — তুমি ভাই নতুন ঢেউ এনেছ। আমরা ত নগণ্য গুরুদেবকে পর্যন্ত বিস্মিত করেছ তুমি।

নজরুল বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করলেন — গুরুদেব আমার কোন লেখা পড়েছিল নাকি?

সত্যেন্দ্রনাথ বললেন — সত্য বলতে কি, গুরুদেবই আমাকে একদিন নিজে থেকে প্রশ্ন করলেন — কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আমি পড়েছি কি না? তাঁর মতে ভাবের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধনায় এই এক নতুন অবদান এনেছ তুমি।

পবিত্রবাবুর এই লেখা থেকে মনে হয়, সত্যেন দত্তর মুখে ওই কথা শুনেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবেন স্থির করেন। এই সময় তাঁর একটা সুযোগও ঘটে গেল। তাঁর পরিচিত ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক মহম্মদ শহীদুল্লা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে যাচ্ছেন জানতে পেরে নজরুল তাঁর সঙ্গী হন।

নজরুল যে তখন অধ্যাপক শহীদুল্লার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাই রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকেও। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে পূজার ছুটির সময়কার কথায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী — ৩য় খণ্ড গ্রন্থে (২য় সংস্করণ, পৃঃ ১১০) লিখেছেন —

'পূজাবকাশের পূর্বদিন (১৩২৮ আশ্বিন) সন্ধ্যায় নাটঘরে অভিনয় [ঋণশোধ নাটকের] হইয়াছিল। সে ঘর এখন নাই।...

পূজার ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ কোথাও গেলেন না; তিনি আছেন উত্তরায়ণের প্রান্তর মধ্যস্থিত পর্ণকুটীরে। পূজাবকাশ বলিয়া অতিথি

সমাগম কিছু কম নয়। বাঁকুড়া হইতে আসেন অধ্যাপক এডোয়ার্ড টমসন, ...মাদ্রাজ হইতে আসিয়াছেন কাজিন্‌স দম্পতি...। এছাড়া আসেন অধ্যাপক শহীদুল্লা ও তরুণ কবি নজরুল ইসলাম।'

এ বছর দুর্গাপূজার সপ্তমী পূজার দিন ছিল ২২শে কার্তিক বা ৮ই অক্টোবর। অতএব নজরুল ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলেন।

১৩৯৪ সালের শারদীয় 'অনুবাদ' পত্রিকায় তিতাশ চৌধুরী 'নজরুল-রবীন্দ্র সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশিকান্তবাবুর কথাকেই সমর্থন করেছেন। তবে তিনি তাঁর প্রবন্ধে যে লিখেছেন — 'রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের একখানি খড়ের ঘরে — যার আধুনিক রূপ কোনার্ক — অবস্থান করছিলেন।... রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল শান্তিনিকেতনের কোনার্কে।'

এটা ঠিক নয়; কারণ আমরা সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর লেখায় পাচ্ছি — রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে কলাভবনের দ্'তলায়।

এবার আর একটা কথা। নিশিকান্তবাবু তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন — রবীন্দ্রনাথ বলায় 'নজরুল দ্বিরুক্তি না করে আবৃত্তি করলেন — 'আগমনী' কবিতাটি। 'আগমনী' নামে রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা আছে। মনে হয়, নজরুল তাঁর নিজের তখনকার লেখা 'আগমনী' কবিতাটিই আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন।

কবিতাটি প্রসঙ্গে সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন — হিন্দু দেবদেবী লইয়া লিখিত কবিতা 'এ কি রণবাজা বাজে ঝন ঝন' সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা' (আষাঢ় ১৩২৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল।' (পৃ:৫৬)

সুশীলবাবুর লেখায় 'একি রণবাজা বাজে ঝন ঝন' হল 'আগমনী' কবিতার প্রথম পংক্তি। তাও এখানে সুশীলবাবুর লেখায় ভুলে 'বাজে ঝন ঝন' হয়েছে। হবে 'বাজে ঘন ঘন'।

সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিত মানস' এবং 'নজরুল ইসলাম' দুটা বইয়েই লিখেছেন — ১৩২৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকায় নজরুলের 'আগমনী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এটাও ভুল, 'আগমনী' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা বা পূজো সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকায়।

এখন একটা কথা মনে হচ্ছে — নজরুল আশ্বিন মাসে শান্তিনিকেতনে যাবার সময় সম্ভবত সদ্য প্রকাশিত এক খণ্ড আশ্বিন সংখ্যা বা পূজো সংখ্যা 'উপাসনা' পত্রিকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ওই পত্রিকা দেখেই 'আগমনী' কবিতাটি আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন।

আর একটা কথা — রবীন্দ্রনাথ নজরুলের আবৃত্তি শুনে কি বলেছিলেন, সে কথা কেউ লিখে না যাওয়ায় আজ আর তা জানা গেল না। নিশ্চয় প্রশংসাই করেছিলেন।

নজরুল তাঁর এই 'আগমনী' কবিতাটি পরে তাঁর 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ১ম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় অর্থাৎ পূজা সংখ্যায় (১৩২৯ সালে) তাঁর 'আনন্দময়ীর আগমন' কবিতার (যে কবিতার জন্য তাঁর জেল হয়েছিল) সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন, আরও পরে তাঁর 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাটিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। □

'কবিতার নবজন্ম' : — বিষয়ে

পত্রিকায় বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৫ সংখ্যায় ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "কবিতার নবজন্ম" প্রবন্ধে লেখার এবং জানার কয়েকটি ভুল ঘটে গেছে:

(১) প্রবন্ধের ৬৯ লাইনে 'পদ' কথাটির জায়গায় 'কবিতা' হবে। (২) ২৯ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের ২য় অনুচ্ছেদে 'কর্তৃপক্ষের' কথাটি 'কর্তৃপদের' হবে। (৩) ২৯ পৃষ্ঠায় প্রথম কলামের শেষ লাইনে 'নিবারণ' কথাটি 'নিবেদন' হবে। (৪) ৩০ পৃষ্ঠায় প্রথম কলমের ১৪ লাইনে Iambic শব্দটির I ছোট হাতের হবে। (৫) ৩৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমে ৩য় অনুচ্ছেদের প্রথমে এই ক'টি লাইন বসবে:

ডঃ জনসন তাঁর বন্ধু এবং সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে একবার যখন কথা বলছিলেন তখন তাঁদের একজনের একটা মন্তব্য বজওয়েল তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন:

Dr. Johnson and Mr. Wilkes talked of the contested passage in Horace's "Art of Poetry". "Difficilest proprie communia dicere". Mr. Wilkes according to my note, gave the interpretation thus: It is difficult to speak with propriety of common things: as, if a poet had to speak of queen Caroline drinking tea, he must endeavour to avoid the vulgarity of cups and saucers.

শান্তিনিকেতনের দিনগুলি

গৌরী আইয়ুব

১৯৫০-এর জুন মাসে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হওয়ার পর যথারীতি ক্লাস চলতে থাকল। অনেকগুলি ক্লাসই খুব ভাল লাগত। ইংরাজির দু'জন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সুনীলচন্দ্র সরকার খুব ভিন্ন ধরনের মানুষ ছিলেন, তাঁদের বাচনভঙ্গি এবং ভাবনাচিন্তার জগৎ ছিল অত্যন্ত স্বতন্ত্র রকমের। কিন্তু দু'জনের পাঠনই আমি খুব উপভোগ করতাম। বাংলা পড়তাম ছান্দসিক অধ্যাপকের কাছে। সংস্কৃত পড়বার জন্য যেতাম নগেনদা ও সুখময় পণ্ডিত মশায়ের কাছে। 'শকুন্তলা' নাটক পড়াতেন অধ্যাপক কুঞ্জবিহারী দাস। বিশালকায় কুঞ্জদার অঙ্গভঙ্গিতে ওই নাটকের ব্যাখ্যায় এক বিচিত্র হাস্যরসের সৃষ্টি হত।

এমন করেই চলছিল। এথিকসের অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুব মশাইকে সপ্তাহে বার দুয়েক পাওয়া যেত। এবং তিনি অবশ্যই শ্রীনিকেতনের তাঁতে বোনা একটি নতুন আসন হাতে নিয়ে আসতেন। কিন্তু ঘণ্টা পড়লে আসনটি কোনও রকমে তুলে ভাঁজ না করেই ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে (তখন অস্থায়ীভাবে টাটা ভবনের দিকে) লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতেন। ভদ্রলোকের এই আচরণের ব্যাখ্যা কিছুকাল পরে জানা গেল। তিনি ক্লাসে আসার আগে কিছু খেয়ে আসার সময় পেতেন না। ক্লাস করতে করতে এত খিদে পেত যে তখন আর সৌজন্য প্রকাশের ধৈর্য থাকত না।

এর অল্পদিন পরেই এল ২২ শ্রাবণ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ উৎসব এবং সপ্তাহব্যাপী সান্ধ্য সভা। বৃক্ষরোপণের মূল উৎসবটা হয়েছিল মেলার মাঠে। তখনকার মেলার মাঠ ছিল উত্তরায়ণের সামনের একফালি জমি যার পুব দিকটা গোয়ালপাড়ার পথ দিয়ে ঘেরা। সেদিন আমরা শ্রীভবনে হলুদ রঙে ছুপিয়ে দেওয়া সবুজ পাড় শাড়ি পরে দলে দলে মেলার মাঠে অপরাহ্নে পৌঁছে গিয়েছিলাম। একটা উঁচু মঞ্চের উপরে পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম যথাযোগ্য সাজসজ্জা করে তাদের আশীর্বাদ বর্ষণ করতে শুরু করে ছিল একটি বৃক্ষশিশুকে। সেটিকে মহাসমারোহে রোপণ করা হচ্ছিল। আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেলার মাঠের মধ্যে বসে সেসব দেখছিলাম।

হঠাৎ ডানদিকে ছ'সাতজন ব্যক্তিকে অতিক্রম করে দুটি পা দেখতে পেলাম। নতুন ধরনের বক্‌লস আঁটা কাবলি জুতো পরা। সামনের দিকটা পাটির মতো করে বোনা ছিল। জুতো পরা পায়ের উপরে ধুতির কোঁচা এসে পড়েছিল। পরমুহূর্তেই লক্ষ করেছিলাম আমাদের দর্শনের অধ্যাপকই পাশে ছাতা রেখে বসে বসে দেখছেন। দৃষ্টি বিনিময় হতেই মৃদু হেসেছিলেন।

এরপর সপ্তাহব্যাপী সান্ধ্য অনুষ্ঠান ছিল সিংহসদনে। সিংহসদনের মেঝের উপরই সতরঞ্চি বিছিয়ে সামনে নিচু ডেস্ক নিয়ে সভাপতি বসতেন। তাঁর আশেপাশে অনুষ্ঠানে গান বা পাঠে যোগ দেবার জন্য ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকরা বসতেন। এবং তাঁদের ঘিরে মুখোমুখি বসতেন শ্রোতারা। আর সিংহসদনের মঞ্চের উপরেও সতরঞ্চির উপর বহু বিশিষ্ট অতিথি বসতেন। একদিন আমাকে হিন্দি ভবনের অধ্যক্ষ বাজপেয়ীজি রবীন্দ্রনাথের একটি লেখার হিন্দি অনুবাদের কিছু অংশ পাঠ করতে দিয়েছিলেন। ওই পাঠ্য অংশটুকু বাজপেয়ীজির বই থেকে লিখে নেওয়ার পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'তুমহারে অক্ষর তো বড়ে সুন্দর হ্যায়।' শুনে আমি গর্বে বেশ স্ফীত হয়েছিলাম।

সেদিন আমাদের পূরবী আর বাদলদা যে গানটি গেয়েছিল তা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে—

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সমবৃত অম্বর হে গম্ভীর, হে গম্ভীর

. . . . . .

দহন শয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।

. . . . . .

গান, পাঠ, বক্তৃতা ইত্যাদি যথারীতি চলছিল। হঠাৎ যেন চুম্বকের

আকর্ষণে সিংহসদনের মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখি একজন মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ওই দিনেই বোধহয় বিচিত্র একটা অনুভূতি মনে শিহরণ জাগিয়েছিল। সেইদিনের অনুষ্ঠানের পরে আমার এক বান্ধবী এসে জানিয়েছিল যে, আমাদের বিবিদি (ইন্দিরা দেবী) নাকি ওদের বলেছেন, 'ওই যে হিন্দি পড়ছিল, ওই সাদা থান পরা নতুন মেয়েটা কে? এ কী পোশাক? কেউ তো তাকে সভায় বেনারসী পরে আসতে বলেনি তাই বলে একেবারে থান পরে আসবে!' ওই সময় মাঝে মাঝে পাড়হীন মলমলের থান পরে মাথায় সাদা মালতী ফুল গুঁজে আমার মনে হত যেন বিশেষ রকমের সাজসজ্জা করা হল।

এরপর প্রায়ই আমি আর মাধবী গোয়ালপাড়ার পথ ধরে বিকালে বেড়াতে যাবার সময় টাটা ভবনের সামনে আমাদের অধ্যাপককে একাকী বসে থাকতে দেখতাম। তখনও টাটা ভবনের সামনে বিশেষ কিছু গাছপালা ছিল না। ভবনের প্রবেশপথে দু'পাশে কিছু আমলকী, বকুল, কদম জাতীয় গাছ লাগানো হয়েছিল। চারদিকটা সিমেন্টের বেদী দিয়ে ঘিরে। তারই একটি বেদীর উপর তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন। অন্ধকার নেমে এলে যখন ফিরে আসতাম, তখন আর তাঁকে দেখতে পেতাম না। কিছুদিন পরে উনি বলেছিলেন, যে আমাদের ফেরাটা উনি টের পেতেন একজন বান্ধবীর উচ্চ কলহাস্যে। অন্যজনের মুখের স্মিত হাসিটি কিন্তু দেখতে পাওয়া যেত না। বলেছিলেন, তোমাদের একজনের হাসি শুনবার মতো, আর একজনেরটা দেখবার মতো।

সন্ধ্যায় ওই উপবিষ্ট অধ্যাপককে দেখে কখনও বা একটু হাস্যবিনিময় করে ওই পথে সান্ধ্য ভ্রমণে যাওয়ার উৎসাহ আমাদের খুব বেড়ে গিয়েছিল। তারপর সাহস এতটা বেড়ে গেল যে আমরা ভকত ভাইয়ের দোকান থেকে কয়েকটা ললিপপ এবং টফি কিনে ব্রাউন পেপারের মোড়কটি দ্রুত পায়ে এসে অধ্যাপকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গোয়ালপাড়ার পথে তেমনই দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়েছিলাম। মাধবী শুধু বলে গিয়েছিল 'একা একা বসে থাকেন, তাই সময় কাটানোর জন্য।'

পরে আইয়ুব মন্তব্য করেছিলেন, 'তখনও বুঝতে পারছিলাম না আসলে কার আগ্রহ বেশি এবং কে কাকে সাহস যোগাচ্ছে?'

যে প্রাচীন তপোবনের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছিলেন, তাতে বর্ষাকালটা ছিল অনধ্যায়। কিন্তু আমাদের শিক্ষাভবন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রুটিন মাফিক চলত। সব বিভাগেই গরমের ছুটির পর জুলাই মাসে অর্থাৎ আষাঢ়ের মাঝামাঝি পুরোদমে ক্লাস শুরু হয়ে যেত। কিন্তু বর্ষা তো তাই বলে রেহাই দেবে না। একদিন বৈতালিকের সময় থেকেই বেশ রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন অধ্যাপক ও শিক্ষকরা ছাতা মাথায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ছুটি দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিংহসদনের ঘণ্টা সেটি ঘোষণা করে দিতেই ছেলেমেয়েরাই ধুয়ো তুলল যে আজকে বেড়াতে যেতেই হবে। শিক্ষাভবনেরও অনেকেই তাতে সোৎসাহে যোগ দিল। কিন্তু কোনও একজন মাস্টারমশাইকে সঙ্গী হতে রাজি করাতে না পারলে যাবার অনুমতি পাওয়া যাবে না। তখন পাঠভবনের নবাগত একজন মাস্টারমশাইকে ছেলেমেয়েরা ধরে পড়ল। লাজুক বিব্রত হাসি হেসে উনি তাঁর ধুতির কোঁচাটি সামলাতে সামলাতে বললেন, 'ওরে বাবা, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না।'

কিন্তু পারব না বললে কী আর ওই দামাল ছেলেমেয়েরা শোনে? বেচারিকে যেতেই হল।

তারপর আমাদের মাতন দেখে কে! যে কটি মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভয় পাচ্ছিল তাদের হাতে আমাদের বই আসন সব গছিয়ে দিয়ে আমরা শালবীথি ধরে পূর্বপল্লীর দিকে দৌড় লাগালাম। পূর্বপল্লী তখন চোরকাঁটায় ছাওয়া রুক্ষ মাঠ। এখানে সেখানে বুনো কুলের ঝোপ। আর বেঁটেখাটো বাচ্চা খেজুর গাছ যাতে সোনালি ফুলের গুচ্ছ ঝলমল করত। ওই রকম একটা গাছকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমাদের দামোদর রেড্ডি ভাঙাচোরা ভাষায় বলল, 'Look, look at the পাকামি of the tree.' ও যে ততদিনে 'পাকামি' শব্দটা শিখেছে, তাতেই তো আমরা অবাক।

পূর্বপল্লীতে তখন দূরে দূরে চার পাঁচটি মাত্র বাড়ি ছিল। আমরা পায়ে চলা পথকেও অগ্রাহ্য করে চোরকাঁটার উপর দিয়ে পুব মুখে ছুটতে শুরু করেছিলাম। রেল-লাইনের ধারে পৌঁছে একটুখানি ইতস্তত করেছিলাম। কারণ ওইখানটা ঢালু জমি বেয়ে নেমে অনেকটা নীচে রেললাইন পার হয়ে আবার অমনি করে ঢাল বেয়ে উঠতে হত পারুলডাঙার মাঠে পৌঁছবার জন্য। ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে সাধারণত কিছু কঠিন ছিল না। কিন্তু সেদিন বৃষ্টিতে মাটি পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। তাও ধরাধরি ঠেলাঠেলি করতে করতে আমরা পারুলডাঙায় গিয়ে পৌঁছে গেলাম। কি ভাগ্য, তখন বোলপুর কি আমেদপুরের দিক থেকে কোনও ট্রেন এসে পড়েনি। অবশ্য ট্রেন এলে ওই খাদের মধ্যে অনেক দূর থেকে থেকে একটা বুম্ বুম্ শব্দ শোনা যেত। আমাদের পায়েরতলায় পারুলডাঙা, তালতোড় সব দ্রুত সরে যাচ্ছিল। আমার তো সেদিনই সেগুলি প্রথম দেখা। মাঠ, ঘাট, খেত, খেতের আল ধরে শুধু পায়ে ছুটতে ছুটতে এক সময় আমরা কোপাই নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম। সেদিন শীর্ণ কোপাইয়ে ঢল নেমেছিল। গেরুয়া জল কলকল করতে করতে ছুটে যাচ্ছিল। ছাত্রছাত্রীদের কাছে উৎসাহ পেয়ে নবাগত মাস্টারমশাইও কোঁচাটোচা সুদ্ধ জলে নেমে পড়েছিলেন।

আমরাও সেই ঘোলা জল হাসতে হাসতে পার হয়ে এলাম। জল আমাদের কোমর পর্যন্ত ছিল বটে, কিন্তু কী তার ধার! ভয়ে ভয়ে আমরা একে অপরের হাত জড়িয়ে ধরছিলাম। ওপারে পৌঁছে সবাই খোলা মাঠের উপর ক্লান্ত হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। আরও অনেক আগেই বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। আমাদের সবারই বসন তখন অর্ধেকটা গেরুয়া রঙে ছোপানো। বীরভূমের বৈরাগ্যের ছোঁয়া কখনও অবশ্য আমাদের মনে লাগেনি। হই হই করে গান গেয়ে নানারকম খেলা খেলে আর বুনো ফুল খেয়ে কারওরই আর সময়ের জ্ঞান ছিল না।

হঠাৎ একজন তার ঘড়ি দেখে বলল, 'এখন যদি না ফেরো, তাহলে কিচেনে লাস্ট ব্যাচেও খাওয়া জুটবে না।'

তখন সবাই আবার হুড়মুড় করে ফিরতি পথে ছুট লাগালাম। 'আমাদের শান্তিনিকেতন সব হতে আপন' গাইতে গাইতে কিচেনে পৌঁছে দেখি, এতগুলো ছেলেমেয়ে বিনা নোটিশে অনুপস্থিত দেখে কিচেন ম্যানেজার রবিদা খুব চিন্তায় পড়েছিলেন। কোনও খবর না দিয়ে কোথায় এরা উধাও হল?

কর্দমাক্ত ঘর্মাক্ত মূর্তিগুলিকে ফিরে আসতে দেখে তিনি সস্নেহে তাড়া দিয়ে বললেন, 'যাও যাও, সব বসে পড় গে। আমি তো এখনই রান্নাঘর বন্ধ করে দিতে বলছিলাম।'

সেই দিনে শান্তিনিকেতনের যে আনন্দময় অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, তাতে বুঝতে পেরেছিলাম পৃথিবীর আর কোথাও এই রকম স্কুল কলেজ বোধহয় পাওয়া যাবে না।

শান্তিনিকেতনের জীবনে যে আমাকে প্রায় হাত ধরে প্রবেশ করিয়েছিল সে ওই মাধবী। এক বুধবারে সে বলল, 'চলো, আমার কাকার বাড়িতে নিয়ে যাই।'

মন্দিরের উপাসনা শেষ হলে আমরা সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতি নিয়ে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে শ্রীনিকেতন গিয়েছিলাম। সেখানে লোকশিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মাধবীর বড় প্রিয় 'কাকাবাবু'। তিনি কলাভবনের প্রাক্তনী ছিলেন, কবি এবং শিশুসাহিত্যিক হিসাবে কিছু খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন কাকাবাবু ও কাকিমা এমন করে অভ্যর্থনা জানালেন, যেন তাঁরা সকাল থেকেই জানতেন যে আমরা যাব। অবশ্য তখনও কাকিমার রান্না চড়ানো হয়নি। আমরা হাত-পা ধুয়ে কাকাবাবুর 'মিউজিয়ামে' ঢুকলাম। শ্রীনিকেতনের দুই কক্ষের অপরিসর কোয়ার্টারে একটি কক্ষ জুড়ে ছিল কাকাবাবুর শিল্পসংগ্রহ। সগর্বে তিনি দেখিয়েছিলেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (সম্ভবত তাঁর দাদামশাই) কাশ্মীরি কাজ করা ভারি সুন্দর একটা জোব্বা। হ্যাঙ্গারটি আবার দেওয়ালে সযত্নে রেখে দিয়েই তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন উল্টোদিকের দেওয়ালের মাঝখানে একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছোট ছবির দিকে। পুরীর সমুদ্রতট, তটের প্রান্তে ফেনা জমে আছে। একটু লক্ষ করে দেখলেই বোঝা যায় যে ওই ফেনার বিন্যাস লুকিয়ে রেখেছে একটি নাম, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যত দূর মনে পড়ছে তাঁরই হাতের লেখায় আরও বড় করে বাঁধানো ছিল উমর খৈয়ামের একটি রুবাই। ফারসির ধাঁচে বাংলা অক্ষরে লেখা। ওই ঘরে সবকটি দেওয়াল জুড়ে কত যে ছোট বড় শিল্পকর্ম সাজিয়ে রাখা হয়েছিল তার আর তালিকা দিতে পারছি না। তবে মনে পড়ছে ঘরের মাঝখানে যে মাদুরটি পাতা ছিল তাতেও এমন নকশা করা ছিল, যে প্রাণে ধরে তার উপরে উঠে বসা সহজ ছিল না। ঘরের দ্বারপ্রান্তে ছিল মস্ত বড় ভারি একটা ঝরুকে পিতলের কলসি, তাতে একগুচ্ছ কাশফুল।

পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং সেটাই ছিল বর্তমান কালের প্রয়োজনে নিযুক্ত। মস্ত বড় তক্তপোষের উপরে কাকাবাবু, কাকিমা ও তাঁদের শিশুকন্যা রুচিরার সঙ্গে শুয়ে শুয়ে অনেক গল্প শুনেছিলাম কাকাবাবুর মুখে। স্বল্পভাষিণী, সুন্দরী ও বিদুষী কাকিমা মাঝে মধ্যে দুয়েকটি বাক্য সংযোজন করছিলেন। তিনি ছিলেন দর্শনের এম.এ.। তাই মুহূর্তে আমাকে আপন করে নিলেন যেহেতু আমার পিতার বই তাঁর পড়া ছিল। ওঁদের রান্নাঘরের কুঁড়েটি ছিল উঠোনের আর এক প্রান্তে। আমরা সেদিন রান্নাঘরে বসেও অনেক গল্প করেছিলাম।

খোড়ো ঘরের মাটির মেঝেতে কাঠের উনুন পাতা ছিল, তাতে কাকিমা ডাল ভাত এবং আলু-ভাতে রেঁধেছিলেন। তা ছাড়া একটা তরকারিও ছিল। উনুনের পাশে একটু কাৎ করে রাখা ছিল একটি ছোট্ট ঘিয়ের শিশি। আলু-ভাতের উপর কয়েক ফোঁটা ঘি-ও দিয়েছিলেন কাকিমা। তাঁর সেই প্রসন্ন মুখে পরিবেশিত অন্নব্যঞ্জনের স্বাদ আমি আজও ভুলিনি।

এই কাকাবাবু কাকিমার সংসার তখন চলছিল কাকাবাবুর দেড়শো কি দুশো টাকা মাইনায়। তিনি তখন লোকশিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। এবং অবসর সময়ে শিল্প ও সাহিত্যচর্চা করতেন। কাকাবাবু পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু সে সম্পত্তি মামলা-মোকদ্দমায় অপাত্তি পার হয়ে তাঁর হাতে এসে পৌঁছেছিল বোধহয় আরও পঁচিশ বছর পর। এই সময়টা কী নিদারুণ অর্থকষ্ট এবং রোগভোগ করে কাটিয়েছিলেন এই দম্পতি! কাকাবাবু তাও সুখের মুখ কিছুটা দেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাকিমা কতটুকু দেখেছিলেন আমি জানি না। আজ তাঁর পুত্র-পৌত্র সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে দেখে ভাল লাগে। আর ওই ছোট্ট মিষ্টি রুচিরাকে শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর আর দেখিনি।

সেদিন মাধবী যেই আমার নাম বলে পরিচয় করিয়ে দিল, অমনি কাকাবাবু বলে উঠেছিলেন, 'তাই নাকি, তোমার নাম বুঝি গৌরী?' মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'গৌরী

লো ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী?'

অনেকদিন পর সেকথা মনে করে নিজেই হেসেছি।

আরও বার কয়েক তাঁদের বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। তখন শ্রীনিকেতনটা ঘুরে ঘুরে সবগাঁনি দেখিয়েছিলেন। অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিল শ্রীনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থা। তখন শান্তিনিকেতনের যেমন আর্থিক অনটন ছিল, শ্রীনিকেতনের অনটন তার চেয়েও অনেক বেশি ছিল। অথচ সেদিন শ্রীনিকেতনে কত কিছু উৎপাদন হত। শ্রীনিকেতন ডেয়ারি তখন শান্তিনিকেতনের রান্নাঘরের শুধু নয়, শান্তিনিকেতনের বহু ঘরে ঘরেও খাঁটি দুধের যোগান দিত। এখন যা স্বপ্নের মতো মনে হয়। আর শ্রীনিকেতনের হাতের কাজের খ্যাতি তো তখন ভারতজোড়া। তাঁতে, বাটিকে, সূচিশিল্পে, চর্মশিল্পে আর মৃৎশিল্পের যা উৎপাদন হত তা ঠাসা থাকত শিল্পসদনের দোকানে। শান্তিনিকেতনে যাঁরা বেড়াতে যেতেন, তাঁরা দু'হাত ভরে চারুশিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করে ফিরতেন।

তখন গুরুপল্লীতেও যেমন দেখেছি, শ্রীনিকেতনেও তেমনই বড় সাদাসিধে সরল জীবনযাত্রা দেখেছি।

বিশ্বভারতী মাঝে মাঝে অনুদান পেলে কিছু কিছু কোয়ার্টার তৈরি হচ্ছিল অধ্যাপক ও কর্মীদের জন্য। তবে সেই সব কোয়ার্টারেও বিলাসিতা দেখিনি, দেখেছিলাম শিল্পরুচি।

একদিন সকালে অধ্যাপক আইয়ুবের জন্য আমরা একটি নির্দিষ্ট গাছতলায় অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ দেখি তিনি আসছেন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসছেন একজন পাজামা পাঞ্জাবি পরা অপরিচিত ভদ্রলোক। তিনিও সেদিন আমাদের ক্লাসের একপাশে বসলেন। তবে তাঁকে ছাত্রজাতীয় মনে হল না। পরে শুনলাম, তিনি আমাদের অধ্যাপকের বন্ধু অম্লান দত্ত। তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল অধ্যাপক আইয়ুবের পাঠনভঙ্গি উপভোগ করার।

মাঝেমাঝে অন্য ভবনের ছেলেমেয়েরাও তাঁর ক্লাসে এসে বসত। কখনও কলাভবন থেকে শুভচারী দাশগুপ্ত ক্লাস করতে আসত — দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর পুত্র। একদিন এল অনীশ। অনীশ ঘটক আমাদের চেয়ে এক বছরের সিনিয়ার ছিল। নানারকম দুষ্টুমি করতে ওস্তাদ। সেদিনকার পাঠ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তখন একটু সময় বাকি ছিল। তখন অনীশ ভালমানুষের মতো মুখ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আইয়ুবদা, আপনাকে আমরা 'ভাইজান' বললে কি আপনি বেশি খুশি হবেন? গৌরী বলছিল...'

তিনি অপাঙ্গে একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় খুশি হব। শুধু 'আইয়ুব সাহেব' না বললেই হল।'

এর কয়েকদিন আগেই ওই অনীশের পরামর্শেই শিক্ষাভবনের ছাত্র ইউনিয়নের এক ভালমানুষ সেক্রেটারি টাটাভবনে তাঁর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কি ওস্তাদ আবু সয়ীদ আইয়ুব? কাল সন্ধ্যায় আমাদের একটি অনুষ্ঠান আছে, যদি আপনাকে আমরা সেখানে পাই, আপনার কণ্ঠে কিছু সঙ্গীত শুনতে পাই, তাহলে সবাই খুব খুশি হব।'

অনীশ দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল কী হয়। যখন মিনিট খানিকের মধ্যে দেখতে পেল এক লাফে ওই সেক্রেটারি টাটা বিল্ডিং-এর বারান্দা থেকে নেমে তার দিকে ঘুষি পাকিয়ে ছুটে আসছে, তখন অনীশ মুহূর্তে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল।

অধ্যাপক আইয়ুব প্রথম দিনের আলোচনাটি বাংলা ভাষায় করলেও, তারপর থেকে ক্লাস নিতেন ইংরাজিতে। মাঝে মাঝে বেশ চমক দিতেন। যেদিন Appearance and Reality পড়াতে শুরু করলেন, হঠাৎ মাজিসিয়ানের ভঙ্গিতে একটা ফল বার করে দেখালেন। বেশ সরস উজ্জ্বল রঙের কমলালেবু। এবং সেটা সবার সামনে তুলে ধরে ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কী?'

সবাই হেসে ফেলে বলল, 'An orange.'

তাহলে এই orange-এর গন্ধ কীরকম হবে, স্পর্শ করলে কেমন লাগবে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব শুনে নিয়ে একজনের হাতে সেটি দিয়ে বললেন, 'দেখ দিকিনি তোমাদের অনুমান ঠিক কি না?'

সে হাতে নিয়ে দেখল ওটা কৃষ্ণনগরের মাটির খেলনা। এইবার বেশ ফলাও করে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল Appearance and Reality-র মধ্যে তফাৎ কোথায়? এবং তা থেকে অনিবার্যত শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম এই বিশ্বকে যেমনটা দেখায় বিশ্ব কি ঠিক তাই না অন্য কোনও কিছু?

সাধারণত পাশ কোর্সে বড় ক্লাসগুলি হত সকালের দিকে। আর অনার্সের ক্লাস মধ্যাহ্নবিরতির পরে। বৃষ্টি হোক কিংবা ঝাঁ ঝাঁ রোদ হোক, এই শেষ বেলার ক্লাসে আসতে তাঁর খুব কষ্ট হত। তখন শুনেছিলাম, ভদ্রলোক যথেষ্ট সুস্থ নন।

ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় খানিকটা ঘনিষ্ঠ হল। একদিন বললেন যে তাঁকে একটা কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে। এবার টাটা বিল্ডিং ছেড়ে সেখানে গিয়ে গুছিয়ে বসতে হবে। কলকাতা থেকে তাঁর বৌদিকে আসতে বলেছিলেন গুছিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তিনি আসতে পারছেন না। তাই আমরা কয়েকজন গিয়ে কি তাঁকে সাহায্য করব? আগামী বুধবার যদি মন্দিরের পরে তাঁর কাছে গিয়ে জেনে নিই সেদিন বাড়ি বদল করা হবে কি না, তাহলে তিনি নিশ্চিত জানাতে পারবেন। এবং দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে বাড়ি বদল করা যাবে।

তিনি কথাটা বলে চলে যাবার পরে সপ্রতিভ শিবানী মন্তব্য করল, 'বৌদি কেন বাড়ি গোছাতে আসবেন? বাড়ির গৃহিণীরই তো আসার কথা।'

পরবর্তী বুধবারে মন্দিরের উপাসনার পরে আমাদের ক্লাসের কয়েকটি ছেলেমেয়ে বলল, 'আজকে তো একবার খবর নিতে হয় আইযুবদা বাড়ি পাল্টাবেন কিনা।'

ওরা আমাকেই ঠেলে দিল, 'যাও না, গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে এসো।'

আমি তো মনে মনে পা বাড়িয়েই ছিলাম। টাটা বিল্ডিং-এ গিয়ে দেখি, সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে একটু বিপর্যস্তভাবে উনি এটা সেটা নিয়ে টানাটানি করছেন। ঘর্মাক্ত কপালের উপরে দীর্ঘ কেশ কিছুটা এলোমেলো হয়ে নেমে এসেছে। তাঁকে সেদিনই বাসা বদল করতে হবে। উনি বললেন, 'ছেলেরা কেউ কি আসতে পারবে না?'

আমি জানালাম যে অবশ্যই পারবে। আমরা চার-পাঁচজন শেষ বেলায় আসব।

সেদিন আমার হাতে কয়েকটি মালতী ফুল ছিল। শান্তিনিকেতনে আসার আগে এই ফুল আমি কোনওদিন দেখিনি। এই সাদা সুগন্ধি ফুলটিকেই যে মালতী বলে তা জানতাম না। মাধবী-মালতী নিয়ে এখনও অনেকের মনে ভ্রান্তি রয়েছে। এবং সেই সঙ্গে মধুমালতীও।

অধ্যাপক ফুলগুলি হাতে নিয়ে জানতে চাইলেন, 'কি, এর নাম কি?'

আমি নাম বলে এবং ফুলগুলি দিয়ে চলে এলাম।

সেদিন বেলা তিনটে নাগাদ মাধবী শিবানী পুণ্যশ্লোক আর অনীশ ঘটকের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম তাঁকে নিজামের আনুকূল্যে সদ্যনির্মিত বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত করে আসার জন্য। কী সুন্দর ঝকঝকে একটি কোয়ার্টার, তার তিন দিকে খোয়াই থেকে সদ্য তুলে আনা মোরাম বেছানো। আর সামনে বারান্দার ধার ঘেঁষে একটি তরুণ শিরীষ গাছ।

বিশ্বভারতী কিছু নতুন আসবাবপত্র দিয়ে রেখেছিল, কয়েকটি খাট এবং চেয়ার টেবিল। কিনি পরেই দেখা গেল শ্রীনিকেতন থেকে কেনা নীল আর হলুদ পর্দা, টেবিল ক্লথ, বেড কভার আর খান কয়েক মোড়ায় বাড়িখানি একেবারে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠল।

চতুর্দিকে খোলামেলা সেই বাড়িখানিকে পঁয়ত্রিশ বছর পরে আর চিনতে পারছিলাম না। এমন থিঞ্জি বাজার গড়ে উঠেছে চারদিকে। কোথায় সেদিনকার সেই নিজামের অর্থানুকূল্যে প্রস্তুত সুন্দর গৃহখানি?

বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে অপরাহ্নের ক্লাসগুলো নিজের বাড়িতেই নিতেন। দুর্বল স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে তাঁর বিনয়ভবনের অধ্যক্ষ ড. প্রবোধ বাগচী সহজেই এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। আরও অনেকেই অবশ্য কখনও কখনও বাড়িতে ক্লাস নিতেন।

তবে ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে তিনি কিন্তু বেশ কড়া ছিলেন। আড়াইটায় ক্লাস শুরু হলে আড়াইটার দু'মিনিট আগে পৌঁছে গেলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু দু'মিনিট পরে পৌঁছলে অধ্যাপকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠত। প্রথমটায় এই ব্যাপারটা তেমন গা করিনি। একদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে একটা ঘুম দিয়ে উঠে স্নান সেরে চুল এলিয়ে মাধবী আর আমি পৌঁছতে পাঁচ-ছ'মিনিট দেরি করেছিলাম। অধ্যাপক চেয়ারে, সংপত্নীরা মোড়ায় বসে দরজার দিকে তাকিয়েছিল। আমরা একটু অপ্রস্তুতভাবে ঘরে ঢুকতেই অধ্যাপক গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই সময়টায় তোমরা ক্লাস করতে আস, আমার সঙ্গে গল্প করতে আস না। এবার থেকে সেটা ভুলে যেও না।'

আমরা তখন চোখে এমনই অন্ধকার দেখতে লাগলাম যে দুটি মোড়া খুঁজে নিয়ে বসতেও একটু সময় নিলাম। তারপর পড়ানো শুরু হল। আমরা মাথা নিচু করে নোট লিখছিলাম। মাধবীর চোখ থেকে নীরবে জলের ফোঁটা পড়ছিল, সে সাবধানে চোখ মুছছিল। অধ্যাপকের তা চোখ এড়ায়নি। আমি বাঁ হাতে একটা রুমাল দুই ঠোঁটের ফাঁকে চেপে রেখেছিলাম। একবারও কোনও প্রশ্ন করিনি বা প্রশ্নের উত্তর দিইনি।

এক ঘণ্টার ক্লাস চল্লিশ মিনিটেই করে দিয়ে তিনি হাল ছেড়ে সবাইকেই সাধারণভাবে বলেছিলেন, 'আজ তো আমার পড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল। অথচ খুব যত্ন করে এই লেকচারটা তৈরি করেছিলাম।'

সবাই খাতাপত্র গুটিয়ে নিয়ে আমাদের দিকে তাকাল, কারুর চোখে কৌতুক, কারুর বা সামান্য একটু অভিযোগের ভাব। আমরা কতক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকব? তাই উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আজ তাহলে যাই?'

অধ্যাপক বললেন, 'না—আর একটু বসো।'

তারপর সবাইকেই বললেন, 'তোমরা যদি ক্লাসের নিয়মকানুন না মানো, তাহলে বাড়িতে ডেকে এনে ক্লাস করা খুব অশোভন দেখায়। এ ব্যাপারে তোমাদের সহযোগিতা না পেলে আমি কী করে বিকালের ক্লাসগুলি বাড়িতে করি?'

পুণ্যশ্লোকের স্মিতহাস্য এবার সশব্দ হল। সে বলল, 'এর পর থেকে আর এমনটা হবে বলে মনে হয় না।'

আমরা সবাই দল বেঁধে চলে এলাম। শুধু আমাদের দু' জনের নয়, অধ্যাপকের মনের ভার কাটতেও আরও কয়েকদিন লেগেছিল বলে মনে পড়ছে।

অধ্যাপক আইযুবের বাড়িতে আমরা মাঝেমাঝেই বিকালের দিকে বেড়াতে যেতাম। ততদিনে গোয়ালপাড়ার পথ ধরে বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহ কমে গিয়েছে, কারণ টাটা বিল্ডিং-এ তখন তো আর কেউ থাকেন না। আমরা মোরামের উপরে কয়েকটা

মোড়া নিয়ে বসতাম। আর উনি বসতেন একটা বেতের চেয়ারে। একদিন বললেন, 'ওই শিরীষ গাছটা আমারই মতো, ওটাতে ঘুণ ধরেছে।' পরে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে তাঁকে আসল বয়সের তুলনায় দশ বছর কম দেখালেও নানা রোগে জীর্ণ হয়ে ভিতরে ভিতরে আরও দশ বছরের বেশি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।

ছোট ছোট কত অজস্র স্মৃতি সেই বাড়িটিকে ঘিরে আজও বারবার ফিরেফিরে আসে। ওই বাড়িটা ছিল একটি চৌকো প্রাঙ্গনের দক্ষিণ দিক। আর ওই দিকেই তার পাশে থাকতেন কুঞ্জবিহারী দাস। প্রাঙ্গনটির আর তিন দিক ঘিরে আরও দুটি দুটি করে বাড়ি ছিল অধ্যাপকদের। উত্তরদিকে তাঁর মুখোমুখি থাকতেন হীরেনদা। রাতের খাওয়া শেষ করে হীরেনদা নাকি তাঁর বারান্দায় এসে মৃদু স্বরে ডাক দিতেন, 'আইযুব সাহেব, জেগে আছেন?'

আইযুব সানন্দে বেরিয়ে এসে ওই বারান্দায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করার কথা আমাকে বারবার বলেছেন। শান্তিনিকেতনে এই একটি বন্ধুলাভ করেছিলেন, যাঁর সঙ্গে অনেকখানি মনের মিল হয়েছিল।

অন্য একটি করুণ স্মৃতি মনে পড়ছে। পুজোর ছুটির আগেই একদিন Hedonism সম্বন্ধে লিখতে দেবেন বললেন। আমরা প্রস্তুত হয়ে দুরুদুরু বক্ষে একটি করে খাতা নিয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাসে উপস্থিত হয়েছিলাম, কী লিখেছিলাম আজ মনে পড়ছে না, তবে খাতা থেকে ছিঁড়ে রাখা সেই প্রবন্ধের পৃষ্ঠাকটি খুঁজে পেলে আর একবার পড়ে দেখতাম। যা মনে আছে তা হল এই যে মাধবী আর আমি একজন দলে আড়াই আর একজন তিন পেয়েছিলাম। সেদিন বিকালটায় শ্রীভবনের বারান্দায় বসে মাধবী তো চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। আমারও প্রায় সেই অবস্থা, কিন্তু চোখের জল তখন অত সহজে আসত না।

এর পর তো পুজোর ছুটি আসন্ন হল। বাড়ি ফিরে যাবার সম্ভাবনাটা ভালই লাগছিল। কিন্তু একটা বিচ্ছেদবেদনা মনকে ব্যাকুল করে রেখেছিল। তাঁর ঠিকানাটা নিয়ে এসেছিলাম। পাটনার দল রওনা হওয়ার আগেই জামসেদপুরের বিরাট দলের সঙ্গে মাধবী নাচতে নাচতে চলে গেল। ওর বাড়ির জন্য টান আরও অনেক বেশি ছিল। অধ্যাপকও কলকাতা থেকে আনা তাঁর ভৃত্যটিকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

পাটনায় ফিরে গিয়ে এবার বাড়িটাকে আর আমার আগের মতো অসহনীয় লাগল না, অন্যেরাও নিশ্চয়ই আমার পরিবর্তন লক্ষ করেছিল। তবে শান্তিনিকেতনের দিনগুলিতে ফিরে যাবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠত। কদিনের মধ্যেই পাঁচ নম্বর পার্ল রোডের ঠিকানায় প্রথম চিঠিখানা সাহস করে লিখে ফেলেছিলাম। কিন্তু কী লিখেছিলাম, কী ছিল তার সম্ভাষণ, কিছুই আজ আর মনে নেই।

কদিন পরে উত্তর এল। খামের উপর স্বল্পপরিচিত হাতের লেখাটি দেখে মন নেচে উঠেছিল। কিন্তু খাম খুলে প্রথমটায় একটু যেন হতাশ হয়েছিলাম সেই চিঠিখানা পড়ে। কিন্তু দিনে দিনে মৌচাকের মতো সেই চিঠিখানা আমার মনের মধ্যে যেন মধু সঞ্চয় করে চলেছিল।

নীল লাইন টানা কাগজের উপরে অধ্যাপকের হাতে লেখা একটি কেবল গান ছিল সেই চিঠিতে—

"বাণী মোর নাহি,
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি॥
আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি॥
তুমি যবে বাজাও বাঁশি সুর আসে ভাসি
নীরবতার গভীরে বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে,
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি।"

এই চিঠির আমি আর কোনও জবাব দিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। তিনিও যে আর কিছু লেখেননি, সেকথা স্পষ্টই মনে আছে।

শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর, যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'নিজের কথা কিছুই কেন লেখেননি?' উনি বলেছিলেন, 'ওটাই তো সবচেয়ে বেশি করে আমার নিজের কথা। তা ছাড়া অন্য কিছু লেখার ঝুঁকি নিতে সাহস পাইনি। তোমার অভিজ্ঞতার চিঠিপত্র সেনসর করেন কি না তা তো জানতাম না। নিজের ভাষায় নিরুত্তাপ কিছু লিখলে তুমি ক্ষুণ্ণ হতে, অথচ আমার স্বাক্ষরিত চিঠিতে সহৃদয় উক্তি থাকলে অভিযোগকদের সেটা কেমন লাগবে বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু যে চিঠি লিখেছিলাম, এর চেয়ে ভাল চিঠি লেখার সাধ্য আমার নেই।'

ছুটির কটাদিন দেখতে দেখতেই কেটে গিয়েছিল। নানা জায়গা থেকে বন্ধুদেরও অনেক চিঠি পেয়েছিলাম। বিশেষ করে ঝাড়গ্রামে একটা ক্যাম্প করতে গিয়ে লেখা পুণ্যশ্লোকের চিঠিখানি এখনও মনে পড়লে ভাল লাগে। সেই সব উজ্জ্বল দিন, সেই পুণ্য, সেই গীতু আজ কত দূরের মানুষ।

শান্তিনিকেতন যে কত রকম করে আমাকে দু'-হাত ভরে দিয়েছিল, সেকথা নিয়ে নাড়াচাড়া করার অখণ্ড অবসর পেয়েছিলাম পাটনায় বসে।

মনে পড়ছিল দিদিভাই বেথা বসুকে। আমাদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়, কিন্তু মনে হত যেন কত বেশি প্রবীণা। কলাভবনের এই ছাত্রীটির সঙ্গে পরিচয় মাধবীর দিদিভাই বলে। মাধবী অকাতরে তার বন্ধুত্বের অংশ দিয়েছিল। আমাদের যত কথা যত অকপট স্বীকারোক্তি সব ছিল দিদিভাইয়ের কাছে। ও বিজ্ঞর মতো পরামর্শ দিত। সাবধান করত। একদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, 'দ্যাখ্, সোনালির মতো যেন করিসনে। মাসোজীর, জীবনটা ছারখার করে দিয়ে গেছে ওই মেয়ে।'

শ্রীভবনে আমাদের ছ'জনের ঘরের এক প্রান্তে ছিল দিদিভাইয়ের ঘরটি, অন্য প্রান্তে ওই রকম আর একটি ছোট ঘরে থাকত মিলাডা-কলাবোভা, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে 'স্বেচ্ছা-নির্বাসিত'। একই সঙ্গে পড়ত বটে, কিন্তু বয়সে ও অভিজ্ঞতায় খানিকটা প্রবীণা ছিল বইকি। সে কিন্তু ইংরাজিটা খুব ভাল রপ্ত করেছিল। মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে যা সব সরস মন্তব্য করত তাতে মাঝে মাঝে ঘাবড়ে যেতাম। মানুষটা সিনিক্যাল হলেও তার রসবোধের অভাব ছিল না। এবং কোনও কারণে সে আমাকে পছন্দ করেছিল। ওর ঘরে সহজে সে কাউকে প্রবেশ করতে দিত না। পাঁচ মিনিটের জন্যও কোথাও যেতে হলে দোরে ক্লুলুপ আঁটত। একদিন তার সেই রহস্যের খনি আমার চোখের সামনে খানিকক্ষণের জন্য মেলে ধরেছিল। আমাকে ভেতরে নিয়ে সাবধানে দরজা বন্ধ করে পর্দা সরিয়ে দেখিয়েছিল তার চার দেওয়ালে কত কী ফ্রেসকো এঁকেছে। ব্যাপারটা এমনিতে কর্তৃপক্ষের ক্রোধের কারণ হত। তার উপরে ফ্রেসকোর বিষয় দেখলে তাদের যা ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হত, সে বিষয়ে মিলাডা যথেষ্ট অবহিত ছিল। শুধু আদিরসাত্মক বর্ণনা নয়, কর্তৃপক্ষের মেজাজ বিগড়ে দেওয়ার মতো কিছু সমসাময়িক ঘটনাও রেখেছিল সে।

এই ডেল্গারাস মেয়েটিও খুব বন্ধু হয়ে উঠেছিল। আমাদের পারস্পরিক সম্ভাষণ ছিল 'ছাগলের ডাক'। কেন তা আর মনে করতে পারছি না। ওর ছিল ইকনমিক্স্ অনার্স। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে অধ্যাপকটি ওর এবং নারায়ণের ক্লাস নিতে যেতেন তিনি কোনওদিন গিয়ে পৌঁছতে না পারলে সে মহাফুর্তিতে আমাদের দর্শন ক্লাসের পাশ দিয়ে শালবীথির পথে খানিকক্ষণ পায়চারি করত। এবং মিহিসুরে ম্যা-ম্যা ডেকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

শান্তিনিকেতনে অনেকগুলি সন্ধ্যা প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়িতে কাটত। তিনি ছিলেন গাছ-পাগল। শান্তিনিকেতনের সেই ঊষর ভূমিকে কত না কষ্টে বাগান করবার চেষ্টা করতেন। কুয়ো থেকে জল তুলে কত কষ্টে যে তাঁর বৃক্ষশিশুগুলিকে বড় করতেন তা নিজের চোখে দেখেছি বলেই জানি। তাঁর বাগানের একপাশে ছিল একটি কাঁটাঝোপ, তাতে ছোট ছোট নীল ফুল ফুটেছিল। তাঁর কাছ থেকেই জেনেছিলাম ওই কাঁটা গাছের নাম ডুরানটা। ক্রমে তাঁর বাগানটাকে ডুরানটা দিয়ে ঘিরে দেবার বাসনা ছিল তাঁর। কিন্তু তা বোধহয় আর সম্ভব হয়নি। ওই গাছ পাটনায় কত দেখেছি, কিন্তু নাম জানতাম না। বহু গাছের নাম-ধাম স্বভাব-চরিত্র ফুল-ফল সম্বন্ধে বলবার সময় তিনি রীতিমতো বইটই এনে আমাকে জ্ঞান দিতেন। তাঁর একটা বড়সড় প্রিয় বই ছিল 'Trees of Calcutta' এখনও যখন কলকাতার পথ চলতে সেই সব গাছ দেখি, তখন তাঁকে মনে পড়ে। তাঁকে স্মরণ করবার জন্য আমার অন্য কোনও বনের সন্ধানে যেতে হয় না। □

অনুলিখন : কামাল হোসেন।

[এই লেখাটি গৌরী আইয়ুবের জীবনের অন্তিম পর্বে অসুস্থ অবস্থায় লেখা অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা 'আমাদের দুজনের কথা'-র অংশ। 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি' — পর্যায়ের বাকি অংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে — সম্পাদক]

গল্প

ওই দেখা যায় ভুবনডাঙা

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

রঙ্গন তার হাত দুটো তুলে মাথার উপর কনুইয়ের ভাঁজ ফেলে জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটোয় মাথার ভর রাখার ফলে মাথাটা বেশ খানিকটা পেছনের দিকে হেলানো। তাই, স্বাভাবিক নিয়মেই বুকটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। তার দু-চোখে চৈত্রের বাতাস লেগে আছে। অনেকক্ষণ একই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে রঙ্গন। তাঁর এই দাঁড়ানোর প্রণালী দেখে মনে হতে পারে জীবনের কাছ থেকে সুখ-দুঃখ-হতাশা-ব্যর্থতা যা কিছু পাওয়ার তা যেন সে অগ্রিম পেয়ে গেছে। তাই সম্পূর্ণ সারেন্ডারের ভঙ্গিতে সে মাথার উপর হাত তুলে দিয়ে বুকটা বাড়িয়ে ধরেছে। যা কিছু আসবার তা সরাসরি তার হৃদয়ে এসে লাগুক। হৃদয় দিয়েই সে এসবের মোকাবিলা করবে।

কখন যেন পা টিপে টিপে সন্ধে এসেছে। আর এই মলিন অন্ধকার আলোর অবশেষটুকু তার সন্ত্রস্ত ভীরু পায়ের স্পর্শে একেবারে মুছে দিয়েছে। এখন আকাশ-গাছপালা-মাঠঘাট, রঙ্গনের বাড়ির সামনের বাগান সবটুকু একরকম ঘোলাটে তরল আঁধারে ঢেকে যাওয়ায় অস্বচ্ছ হয়ে রয়েছে। রঙ্গনদের শিশু গাছের মাথায় কয়েকটি পাখি কলরব করে উঠল। এই সময় একরকম শুকনো অথচ শিরশিরে হাওয়া বয়ে গেল। আকাশে খুব অনুজ্জ্বল দু' একটি তারা। ক্রমশ রঙ্গনের বাগানের কাঠ-গোলাপ, চাঁপা, শিরীষ গাছগুলো ঘন আঁধারে একে অপরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

রঙ্গনের দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে তার মনোভাব সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেলেও আসলে সে যে ঠিকঠাক কী ভাবছিল অথবা আদৌ কিছু ভাবছিল কি না তা সে নিজেও বলতে পারবে না। তবে মাঝে মাঝে সে বুক ফাঁকা করে বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়ছে।

আজ দুপুরের গাড়িতে রঙ্গনের বউ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে দিন সাতেকের জন্য বাপের বাড়ি গেছে। রঙ্গনও যেতে পারত। তবে সকলে মিলে বাড়ি ফাঁকা করে গেলে চুরিডাকাতি হতে পারে। তাই, পাহারাদারের কর্তব্যে রঙ্গন। কণার অতি আদরের একটি স্প্যানিয়েল আছে। বছর দুয়েক আগে ভুটান বেড়িয়ে ফেরার পথে একটি দরিদ্র পাহাড়ি ছেলের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য সস্তায় কিনে এনেছে। প্রথমে কথা হয়েছিল কুকুর আর রঙ্গন বাড়িতে থাকবে। কিন্তু কণার ধারণা সাংসারিক কর্তব্য যেমন নিজের শরীরের যত্ন নেওয়া, ঠিক মতো খাওয়াদাওয়া করা ইত্যাদি বিষয়ে রঙ্গন এমনই আনাড়ি যে রঙ্গনকেই ভরসা করে রঙ্গনের কাছে রাখতে কণার বিশ্বাস হয় না। তাই, অনেকবার রঙ্গনের তরফ থেকে দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কণা কুকুরকে ভরসা করে বাড়িতে রাখেনি। সে এখন কয়েকটা গলি পেরিয়ে কণার এক বান্ধবীর বাড়িতে। ফলে রঙ্গন এখন একেবারে একা। কণা যাওয়ার সময় পই পই করে বলে দিয়েছে কখন কী খাবে কী পরবে। এমনকী সকালবেলা কাজের মেয়েটি এলে যে তাকে দরজা খুলে দিয়ে আবার নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়ে পড়তে পারবে না, কারণ তার হাত-টান আছে, তা-ও বলতে ভোলেনি। অফিস যাওয়ার সময় কোন চাবি কোথায় লাগবে, গ্যাসের সুইচ ঠিকমতো বন্ধ আছে কিনা ইত্যাদি যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজের ভার রঙ্গনের হাতে দিয়ে খুবই আশঙ্কায় তার দুটো হাত ধরে বলে গেছে — 'তোমাকে একা রেখে যাওয়াও যা রাজাইকে একা রেখে যাওয়াও তা। সাবধানে থেকো। এসে যেন দেখি যেমন রেখে গেছি, ঠিক তেমনি আছ। অসুখ-বিসুখ বাধিয়ো না।' রাজাই রঙ্গনের চার বছরের ছেলে। রঙ্গন কণার কথা শুনে সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে সেই অপ্রস্তুত ভাব ঢাকতে টুপুরের মাথার চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে

বলেছে—তোমরা সাবধানে যেও। টুপুর, ভাইকে দেখিস। টুপুরের বয়স দশ। মায়ের চালচলন, কথাবার্তা অনুকরণ করার স্বভাবজ নিয়মে টুপুরও একটু ভারিক্কি গলায় বলেছে—দেখো, দরজা খোলা রেখো না। হটহাট কেউ না ঢুকে পড়ে। এবার প্রাণ খুলে হেসে ফেলেছে রঙ্গন টুপুরের নরম হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে গেছে।

আস্তে আস্তে রাত হল। উল্টোদিকে গির্জার ঘড়িতে সাতটার ঘণ্টা বাজল। হাওয়া এখন আরও একটু ঘন। আরও একটু শীতল। রঙ্গনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। পাড়ার কোনও বাড়ি থেকে মেয়ে গলার গানের আওয়াজ আসছে। এলোমেলো হাওয়ায় শব্দগুলো কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। একটি রিক্সা টুং টাং ঘন্টি বাজিয়ে বাজিয়ে দূর থেকে দূরে চলে গেল।

হঠাৎ যেন এ-ঘরের ভেতর অস্বস্তিকর বাতাস লেগে গেল। আচমকা কেউ নিঃশব্দে চলে গেলে যেমন হয়। রঙ্গন মুখ ফেরাল এবং ভীষণভাবে চমকে উঠল। একজন দীর্ঘদেহী মানুষ, যেন মেঘ আর কুয়াশায় মেশানো রং, খানিকটা রোগাটে গড়ন, গালের হনু দুটো ঠেলে বেরনো, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুই চোখ—চোখ থেকে একরকম আলো বেরচ্ছে যা ঘরের কম পাওয়ারের নীল আলোকেও ম্লান করে দিচ্ছে। রঙ্গন অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। তার দাঁড়ানোর সেই আগের ভঙ্গি আপাতত তছনছ হয়ে গেল। তার চোখে এখন একরকমের সতর্ক দৃষ্টি। ভেতরে ভেতরে সে লোকটাকে চিনবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ওই চোখ, চোখ থেকে বিচ্ছুরিত নীল আলো, তীক্ষ্ণ রোগাটে মুখ, ধারালো চিবুক, বুকখোলা পাঞ্জাবি, সবটা দিয়ে বহু দিন আগে দেখা এক অস্পষ্ট অবয়ব আস্তে আস্তে আকার নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে অথচ সবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার গর্বে তা আবার ভেঙে-গুঁড়িয়ে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। একই প্রক্রিয়ার পুনরাবর্তনে রঙ্গন ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত হয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু এ থেকে সে বলে ফেলতেও পারছে না—চিনতে পেরেছি। এতদিন পরে এলে? চেনা-অচেনার মাঝখানের এই জমিটুকুতে দাঁড়িয়ে সে যতই টালমাটাল হচ্ছে ততই অসম্ভব হয়ে উঠছে তার পক্ষে ওই লোকটাকে অস্বীকার করা। আর এই সুযোগে লোকটা প্রায় রঙ্গনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুখ হেসে ফিসফিস করে বলল—চিনতে পারলে না? রঙ্গন তার শরীরের ঘ্রাণে আরও খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়ল। এই গন্ধ, এই ঘ্রাণ তার চেনা। অনেক দিনের চেনা। সে নিজের মনের ভেতর প্রবলভাবে হাতড়াচ্ছে। উথাল-পাথাল খুঁজে মরছে। খুঁজতে খুঁজতে কি সে জন্মের ওপারে চলে যাবে? কিন্তু সে খুব পরিষ্কার ভাবে জানে, জন্মের ওপার বলে কিছু নেই। জন্ম একটা এবং একটাই। কিন্তু আপাতত তার মাথার ভেতর কার্যকারণের সূত্রগুলো ঠিক মতো কাজ করছে না ফলে রঙ্গন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। সে এই বাড়িঘর, বাগান, রাস্তাঘাট, মাঠঘাট, আকাশ বাতাস পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে....ছুটছে.... অন্য কোনও প্রান্তরে, অন্য কোনও পথে, অন্য কোনও আকাশে।

এখন মানুষটা রঙ্গনের বলার অপেক্ষা না করে নিজেই রঙ্গনের দামি সোফা সেটের ওপর বসে পড়ল। রঙ্গনকেও ডাকল—'এসো। বসো।' যেন সে-ই এ বাড়ির মালিক। রঙ্গন নীরবে সেই নির্দেশ পালন করল। তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এ ছাড়া তার যেন আর অন্য কোনও উপায় নেই। জানলার পর্দা গুটনো। তাই উল্টোদিকের দোতলা বাড়ির ফাঁক দিয়ে খানিকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে। মেঘলা আকাশে পাণ্ডুর এক ফালি চাঁদ। তাই আকাশটা আজ ভারি নিরিবিলি আর একলা দেখাচ্ছে। সোফার গায়ে রাজাইয়ের একটা জামা ঝুলছে। হাওয়ায় মাঝে মাঝে তার ঝাপটা এসে লাগছে রঙ্গনের গায়ে। সে একসময় জামাটা মুঠোয় ধরে গভীরভাবে তার আঘ্রাণ নিল। তারপর বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরল। লোকটা নীরবে রঙ্গনকে দেখছে। চোখ দুটো সরু করে বলল—'তুমি ভাল আছ রঙ্গন'? রঙ্গন বুঝতে পারছিল না কি বলবে। কারণ এ তে পথ চলতি লোকের সাধারণ কুশল প্রশ্ন নয় যে প্রথাগত ভাবে মাথাটা নাড়িয়ে বলবে—হ্যাঁ চলে যাচ্ছে। আপনি?

আসলে লোকটার প্রশ্ন রঙ্গন এখন নিজেই নিজেকে করছে। আমি কি ভাল আছি? আমি কেমন আছি? কাকে বলে ভাল থাকা? ভাল না-থাকার লক্ষণই বা কি! অথচ লোকটা উত্তর চাইছে। বোঝাই যাচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তর না পেলে সে রঙ্গনের ওপর থেকে তার ওই উজ্জ্বল চোখ সরাবে না। রঙ্গন এবার লোকটিকে একটু অন্যভাবে ট্যাকল করতে চাইল। তার প্রশ্নের বিপরীতে প্রশ্ন ফিরিয়ে দিল—তুমি কে?

—আমাকে তাহলে চিনতেই পারলে না রঙ্গন?

—কোথায় যেন দেখেছি.....কবে..... রঙ্গনের বিপর্যস্ত গলা।

—সেই শৈশব থেকে কতগুলো বছর একসঙ্গে কাটালাম। একসঙ্গে পথ হাঁটলাম.... স্বপ্ন দেখতে শিখলাম। তারপর একদিন খুব দুর্যোগের রাত। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল.... তোমার কিছুই মনে পড়ছে না?

—মনে পড়ছে। খুব অস্পষ্ট। এ কি আমার কথা না অন্য কারও? রঙ্গন দু-হাতে মাথার চুল টেনে ধরছে।

লোকটা রঙ্গনের পিঠে হাত রাখল—'জোর করে মনে করার চেষ্টা করো না রঙ্গন'। রঙ্গনের মনে হচ্ছে লোকটার গলা থেকে বেরনো শব্দগুলো যেন ওর মুখ থেকে গড়িয়ে শরীরে নামছে আর তারপর শরীর চুইয়ে সারা ঘরে চলেফিরে বেড়াচ্ছে। রঙ্গন উঠে দাঁড়াল। ওই শব্দগুলো অনেক দিনের

হারিয়ে যাওয়া গানের সুরের মতো, প্রিয় মুখের মতো, পাহাড়তলির নীল ইশকুলের ফেলে আসা সহপাঠীদের মতো তাকে হাতছানি দিচ্ছে। সে ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে আঁজলা ভরে ঘরের মধ্যে চলে ফিরে বেড়ানো শব্দগুলো তুলে নেবে বলে। কিন্তু শব্দগুলোর একেবারে কাছে চলে গিয়েও সে তাদের ধরতে পারছে না।

লোকটা নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে ঘরময় ছুটে বেড়ানো রঙ্গনের হাত ধরে বসিয়ে দিল। নিজে এবার আরও ঘন হয়ে বসল রঙ্গনের পাশে। তার নিঃশ্বাস রঙ্গনের গায়ে এসে পড়ছে। এই নিঃশ্বাসের স্পর্শে, শব্দে রঙ্গনের হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে। সে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব পরিষ্কার অথচ নিচু গলায়—প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে বলল—'তুমি ভালবাসতে ভুলে গেছ রঙ্গন'? রঙ্গনের এখন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তার মুখটা হাঁ হয়ে ঝুলে আছে। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে। যেন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়ার উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। হঠাৎ দুর্লভ জিনিস হাতে পেয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে রঙ্গন নড়েচড়ে উঠল। লোকটার হাঁটু দুটো খামচে ধরল—'আমি ভালবাসতে ভুলে যাইনি। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি। আত্মীয়স্বজনকে ভালবাসি। পাড়া প্রতিবেশীদেরও.....।' লোকটির চাপা অথচ তীব্র হাসি রঙ্গনকে থামিয়ে দিল—'এইরকম কথাই কি শুরু থেকে ছিল রঙ্গন'? লোকটা তার গালে হাত বুলায়—'মনে পড়ে একদিন তুমি তরুণ উদ্দালকের মতো হাতে মশাল নিয়ে ভালবাসার সড়ক খুঁজতে বেরিয়েছিলে? শেষ পর্যন্ত তা এই কানাগলিতে এসে শেষ হল? তোমার না ভুবনডাঙার মাঠে যাওয়ার কথা ছিল? রঙ্গনের মনা মাছের মতো ফ্যাকাশে চোখে এবার স্ফুলিঙ্গ খেলে গেল—হ্যাঁ, আমি একদিন ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলাম। হাতে মশাল ছিল। কত মানুষের মধ্য দিয়ে হেঁটেছি। পথও ছিল সুখী আর দুঃখী মানুষদের মধ্যে একটা নীল সেতু গড়ে দেব।

—তুমি আজকাল মানুষের কান্না শুনতে পাও না? রঙ্গন দু'হাতে তার কান চেপে ধরল। লোকটার মুখ থেকে 'কান্না' শব্দটা বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে এতদিন, এতবছর পর দেওয়াল ভেদ করে হাজার হাজার মানুষের হাহাকার আর কান্নার শব্দ যেন তার দিকে ধেয়ে আসতে লাগল। রঙ্গনের কান দুটোয় নির্ঘাত তালা লেগে যাবে এইবার। লোকটা রঙ্গনের কাছে ঝুঁকে এল—'শুনতে পাও রঙ্গন'?

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। ওদের থামতে বল। আমার কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে।' ওই কান্নার শব্দ না শোনবার আপ্রাণ চেষ্টায় রঙ্গনের সমগ্র শরীর দলা পাকানো একটি মাংসপিণ্ডের মতো অচল হয়ে রইল।

মানুষটা এখন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। রঙ্গন এখন ঘরের যেদিকে বসে আছে একেবারে তার উল্টোদিকে গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে গমগমে গলায় লোকটা বলছে—'রঙ্গন, তোমার অহনাকে মনে পড়ে?

রঙ্গনের দু-চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। হাজারদুয়ারির সবকটা বন্ধ দরজা যেন এই একটা নামে হাট হাট খুলে গেল।

—মনে পড়ে। অহনাকে মনে পড়ে। সে আমায় ভালবাসত।

—তুমি?

—আমিও তাকে পাগলের মতো ভালবাসতাম। আকাশ থেকে আগুন চুরি করে আমরা নিজেদের পৈতৃক ঘর-বাড়ি পোড়ার ভেবেছিলাম।

—তারপর?

—তারপর অহনা একদিন আত্মহত্যা করল।

—কেন রঙ্গন?

—জানি না। আমি জানতে চাই না।

লোকটা এখন রঙ্গনের মুখের একেবারে কাছে মুখ নিয়ে এসেছে। —তুমি জানো। তুমি-ই জানো।

—না, না আমি জানি না। চিৎকার করে ওঠে রঙ্গন। কিন্তু একি! তার দু-চোখ দিয়ে বৃষ্টির ধারাপাতের মতো অশ্রু ঝরে পড়ছে অবিরত, গলা দিয়ে বিকৃত আওয়াজ বের হচ্ছে। সে দু-হাত দিয়ে তার মাথা ঢেকে ফেলেছে।

—যে শপথ নিয়ে একদিন তুমি হাঁটা শুরু করেছিলে, অহনাকে একটু একটু করে যে স্বপ্ন তুমি নিজেই দেখতে শিখিয়েছিলে, তা তুমি একদিন নিজের হাতে মুছে দিয়েছ। সেই শোকের আগুন অহনা সহ্য করতে পারেনি। সে দাউদাউ জ্বলে গেছে।

—আমি তাকে নিয়ে সংসার করতে চেয়েছিলাম।

—কোন সংসার রঙ্গন? যাকে নিয়ে তোমার আকাশে-বাতাসে-অরণ্যে-মানুষের মিছিলে সংসার করার কথা ছিল, তাকে তুমি কোন সংসার দিতে চেয়েছিলে রঙ্গন? কোন খাঁচায় ঢোকাতে চেয়েছিলেন অহনাকে? যে খাঁচায় এখন তুমি আছ?

হঠাৎ রঙ্গনের মনে হতে লাগল লোকটার গলার জমাট কুয়াশা কেটে যেন ক্রমশ সূর্যের মতো ঝকঝকে ধারালো উজ্জ্বল স্বর বেরিয়ে আসছে। এই স্বরই রঙ্গন অনেকদিন আগে কথা বলত না? এই স্বরই তো সে চিরদিনের মতো ফেলে এসেছে পাহাড়ের শানুদেশে, নদীর গভীরে, আকাশের নীল মেঘের ভাঁজে ভাঁজে। এই স্বরই তো সে দিয়ে এসেছে মাঠেঘাটে

উর্বর প্রান্তরে বাঁশি বাজিয়ে ফেরা কিশোর ছেলেটাকে। বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে যে গেরস্তি মানুষকে পথে বের করে। ঘর ছাড়া করে, ছন্নছাড়া করে। রঙ্গনের দৃষ্টি এখন ক্রমশ বদলাচ্ছে। লোকটি রঙ্গনের এই দৃষ্টিবদলের পর্বে বলে উঠল — 'তোমার গলায় ও কিসের দাগ রঙ্গন? রঙ্গন গলায় হাত বোলাল — 'কই, কিছু না তো।'

— 'ভাল করে আয়নায় দেখ তো'। আশ্চর্য! এতক্ষণ কোনও অনুভূতি ছিল না। লোকটা বলার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গনের গলার কাছটা চিনচিন করতে লাগল। একটা শেকল যেন এত বছর তার গলায় পরানো ছিল। সে প্রাণপণে সেই শেকল খুলে ফেলতে চাইছে। লোকটা হাসি হাসি মুখে তার কাণ্ড দেখছে। বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর বলল — ওভাবে নয় রঙ্গন। ও তোমার পোষমানা নিরাপত্তার শেকল। এই ঘরে দাঁড়িয়ে কি তা খোলা যায়?

— তবে? রঙ্গনের গলায় কি বাতাস কমে গেল। তাই অমন ফ্যাসফেসে শোনাচ্ছে গলার স্বর?

— এখান থেকে বের হও রঙ্গন। বেরিয়ে পড়ো। তোমার তো দুটো ডানা ছিল। বহুদিন উড়তে না উড়তে ডানা দুটো আর তার কাজ করতে চাইছে না, তাই না রঙ্গন?

রঙ্গনের সমস্ত শরীরে এখন মৃদু আলোড়ন। এই আলোড়ন বা আন্দোলন খুব ধীরে ধীরে বাড়ছে....বাড়ছে.....বাড়ছে। তার ভেতর থেকে একটা ইচ্ছে এই আলোড়নের ফলে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ডানা মেলে আকাশে ওড়ার ইচ্ছে। এক্ষুনি তা পারবে না বলেই সে যেন এই ঘরের মধ্যেই তার ডানা দুটো মেলে একটু একটু পাক খেতে লাগল। আর আশ্চর্য, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রঙ্গন একেবারে মুখ থুবড়ে লাট খেয়ে পড়ল লোকটার পায়ের কাছে। সে রঙ্গনের মাথায় হাত রাখল — এতদিন দাঁড়ে বসে ছোলা আর জল খেয়ে খেয়ে অভ্যেসটা হারিয়ে ফেলেছ। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

রঙ্গন আকুল হয়ে কাঁদছে। কত বছর সে এমন করে কাঁদতে পারেনি। তার বুকের ভেতরের জমাট শিলা এই গরম অশ্রুতে আস্তে আস্তে গলে যাচ্ছে। সে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল আর অশ্রুমাখা চোখ তুলে লোকটির দিকে তাকাল — 'আমি পারব না'।

— পারবে রঙ্গন। পারবে। একটা জীবন। একটাই। বেরিয়ে এসো। পারতেই হবে তোমাকে।

লোকটি আস্তে আস্তে দরজার দিকে যাচ্ছে। রঙ্গন শিশুর মতো দু-হাত মেলে তাকে আটকাতে চাইল — তুমি চলে যাচ্ছ?

— হ্যাঁ, রঙ্গন। এবার আমি যাই।

— তুমি আর একটু থাকতে পার না?

— আমার এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে রঙ্গন।

— আমার যে একা থাকতে ভয় করছে।

— কিসের ভয়? এখন তোমাকে একাই থাকতে হবে। নিজের মুখোমুখি হও। চারপাশের অর্গল ভেঙে ফেলে বেরিয়ে এসো রঙ্গন। বাঁশির সুর শুনতে পাচ্ছ না তুমি?

— পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি। ওই সুর ডাকছে আমাকে। আমি যাব। যাবই।

লোকটি যেভাবে এসেছিল সেভাবেই চলে গেল। রঙ্গনকে একা রেখে মেঘ আর কুয়াশার জালের মধ্যে যেন একটু একটু করে হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল।

• • • • •

দিন সাতেক পর বাড়ি ফিরে সদর থেকেই আঁতকে উঠল কণা। সব ঘরের দরজা জানলা হাট হাট খোলা। এমনকী সদরও হাঁ হয়ে রয়েছে। দরজা জানলার পর্দা কোথায় গেল? ঘরে ঢুকে দেখল মেঝেতে বসে আছে রঙ্গন। তার পরিষ্কার নিখুঁত কামানো গালে এখন খোঁচাখোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। পরনের সাদা পায়জামার রঙ এখন আর চেনা যাচ্ছে না। এ কদিন একবারও বোধ হয় জলে পড়েনি। বাচ্চা দুটো এগিয়ে এল কাছে। কণা বিরাট সুটকেশটা টানতে টানতে রঙ্গনের পাশে এসে বসে পড়ল — 'যা ভেবেছি তাই। এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? অসুখ বিসুখ বাঁধিয়েছ? রঙ্গন ঠা ঠা হেসে উঠল — আমার সব অসুখ সেরে গেছে। শুধু গলার কাছে একটু ব্যাথা এখনও।

— কিসের ব্যথা?

— অনেকদিন বৃষ্টি না-ভেজার ব্যথা। অনেকদিন আগুন নিবে যাওয়ার ব্যথা। অনেকদিন এক আকাশ রোদ্দুর গায়ে না মাখার ব্যথা।

কণা তাকিয়ে আছে রঙ্গনের দিকে। নির্বাক। ছেলেমেয়ে দুটোর চোখে মুখেও এই নতুন রঙ্গনকে দেখে বিমলের বিস্ময়। কণা তার ট্রেন জার্নির ধকল ভুলে অনেকক্ষণ পর চিৎকার করে উঠল — 'কি আবোল-তাবোল বকছ পাগলের মতো?' আবার ঠা ঠা হাসি!

— পাগল? আমি? আমি? এতদিন তোমরা আবোল-তাবোল বলেছ। আমি চুপ করে শুনেছি। এবার উল্টোটা হোক।

• • • • •

মাঝরাত্তিরে ছেলেমেয়ে দুটোর ঘুম বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কণা রঙ্গনের খাটে চলে এল। একেবারে তার বুকের কাছে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। রঙ্গন দু-হাতে কণাকে ঠেলে সরাল — আঃ, ছাড়ো, গলায় লাগছে।

— আমাকে নাও রঙ্গন। কণার গলায় আদিম নারীর মোহময়ী ডাক। এ নিশির ডাক তাকে এতদিন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল।

রঙ্গন ছিটকে সরে গেল খাটের অন্যদিকে। হিসহিস গলায় বলল — সরে যাও। সরে যাও তুমি। তোমার লালসা, তোমার লোভে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

• • • • •

অফিস থেকে ফিরে রঙ্গন খুব নির্লিপ্ত ভাবে কণাকে খবরটা জানাল — 'চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।' এ-কদিন উপর্যুপরি বিস্ময়ের ধাক্কায় কণার বোধশক্তি খানিকটা ক্ষয়ে এসেছিল। কিন্তু রঙ্গনের এই খবরে তা এই মুহূর্তে একশোগুণ বেড়ে গেল — কি বললে?

— চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।

— কি বলছ? মাথাটা একেবারে গেছে?

— ওরা আমাকে ঠাণ্ডা ঘর, ইনকাম ট্যাক্স, পি-এফ, গ্র্যাচুইটি, গাড়ি-বাড়ি এই সব দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। আমার গলার ব্যথাটা কিছুতেই সারতে দিচ্ছিল না। এখন আমার ভীষণ আরাম লাগছে।

বড় করে শ্বাস টানল রঙ্গন। মুক্তির এই শ্বাসটুকু সে যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে চাইছে। চার বছরের রাজাই বাবার কাছে এল, — বাবা, আমার বল?

— তোমায় বল এনে দেব বাবা। একটা ইয়া বড় আগুনরঙা বল। ওই পাহাড়ের মাথা থেকে টুপ করে নিয়ে আসব শিগগিরই। ওই বল নিয়ে তুমি ছুটে ছুটে লাফিয়ে লাফিয়ে অনন্তের মাঠে খেলা করবে।

মেয়ে টুপুর ম্লান মুখে কাছে এল — বাবা, আমার ফিতে?

— ফিতে চাই? আনব। নদীর বুক কেটে ফিতে আনব তোমার জন্য। নীল রঙের ফিতে। এই নীল ফিতের সেতুর উপর দিয়ে হেঁটে যাবে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখী মানুষ।

টুপুর রঙ্গনের এই অসংলগ্ন কথায় ভয় পাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে মায়ের আঁচল ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে। কণা ছেলেকেও টেনে নিল। রঙ্গনের কাছ থেকে সরিয়ে নিল ওদের। বলল — বাবার কাছে এসো না। বাবার অসুখ করেছে। □

ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গের প্রতিটি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশ করার আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও কোনও কোনও বর্ষের শেষ সংখ্যাটির প্রকাশ অতিরিক্ত বিলম্বের কারণে বাতিল করার ছাড়া উপায় থাকছে না। এই কারণে চতুরঙ্গের পাঠক-গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমরা মার্জনাপ্রার্থী। এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশ বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কতখানি কষ্টসাধ্য আশা করি সেকথা তাঁরা বুঝবেন। চতুরঙ্গের প্রতিসংখ্যার বর্তমান মূল্য মাত্র পনেরো টাকা। পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং কলেবরের অনুপাতে এই মূল্য যে খুবই কম, অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই তা জানেন। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়েছে এবং যাঁরা নতুন গ্রাহক হতে চান তাঁদের এখন থেকে মাস কিংবা বৎসরের হিসাবে নয়, সংখ্যা হিসাব করে গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা ৪টি, ৮টি কিংবা ১২টি সংখ্যার গ্রাহক হতে পারেন। যে কটি সংখ্যার গ্রাহক হবেন সেগুলির মূল্য একত্রে যত দাঁড়ায় ততই গ্রাহকচাঁদা পাঠাবেন। আমরা কেবল ডাকখরচ বহন করব। গ্রাহকচাঁদা মনিঅর্ডার কিংবা ড্রাফটে পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরের চেক ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ সহ পাঠাতে হবে। চেকে কিংবা ড্রাফটে 'চতুরঙ্গ' কথাটি লিখতে হবে। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়নি তাঁদের যতগুলি সংখ্যা এখনও প্রাপ্য, যেমন যেমন পত্রিকা প্রকাশিত হবে তাঁরা পেতে থাকবেন। যোগাযোগের ঠিকানা :

চতুরঙ্গ, ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা–৭০০ ০১৩। ফোন : ২৭-৩৭৭০

নিউইয়র্ক (দফতর আর ধিক্কার)
ফের্নান্দো বেলা-কে

ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা

অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক ফোঁটা হাঁসের রক্তের
অপারগুণিত সংখ্যা, তার নীচটাতে;
এক ফোঁটা মাস্লার রক্তের
বহুবিভাজিত সংখ্যা, তার নীচটাতে;
যোগ-অঙ্কের নীচটাতে, কোমল রক্তের এক নদী।
গান গেয়ে বয়ে চলে নদী
নিরবধি বয়ে চলে শয্যোঘরের
মহল্লা মহল্লা পিছে ফেলে—
আর পিছে ফেলে নিউ ইয়র্কের নকল ভোরের মধ্যেকার
যত টাকা, সিমেন্ট, বাতাস।
জানি, আছে পর্বতের শ্রেণী।
জানি আছে জ্ঞানের পরকলা, তাও। তবু
আকাশ দেখব বলে আসিনি এখানে।
এসেছি মেঘ হয়ে ওঠা রক্তপুঞ্জ
চাক্ষুষ করব—রক্ত ঝৌটিয়ে স্তূপিত করে মেশিনের চাপ
ঝর্নার ওপরে, আর আস্বাকে ঠেলে দেয় কালনাগিনীর মুখে।
রোজ নিউ ইয়র্কে ওরা কাটে
চার কোটি মাসালো হাঁস,
পাঁচ কোটি শুয়োর,
দু' হাজার পায়রা— শুধু মৃত্যুযাত্রীদের
আস্বাদ বিধান করতে, কাটে
এক কোটি গোপশু
এক কোটি শিশুমেষ
দু' কোটি মোরগ—শুধু আকাশখানাকে
ভেঙে গুঁড়ো করে দেবে ব'লে।

ছুরি শান দিতে দিতে, প্রলাপ শিকারে
কুকুর মারতে মারতে চোখের জল ফেলা, সেও ভাল,
অবরোধ করে আটকে দেয়ার চাইতে ভোরবেলা
অফুরো দুধের মালগাড়ি,
অফুরো রক্তের মালগাড়ি,
গন্ধের দোকানির হাতে হাতকড়া পরা
গোলাপ বোঝাই যত গাড়ি।
মাসালো হাঁস আর পায়রা আর
শুয়োর আর আরও মেষশিশু ঝাড়েবংশে
রক্ত ঢালছে ফোঁটা ফোঁটা করে
অপারগুণিত সংখ্যা, তার নীচটাতে।
নিংড়ে শুকোনো তীব্র আর্ত হাম্বা ডাক গোরুদের
বেদনা বিশ্ময়ে ভরে ভরে দেয় গোটা দেশটাকে, আর ওদিকে
তেল পিয়ে পিয়ে মত্ত হয়ে উঠছে হাডসন নদী।

সবাইকে ধিক্কার দেব, দুষব, যারা বাকি আধাটাকে
অস্বীকার করছ পুরোপুরি,

অনুদ্ধার বাকি আধখানা
বয়ে তুলছে সিমেন্টের পাহাড়,
বিস্মৃত ছোট ছোট জীবপ্রাণীর
অন্তরে যেখানে বাজছে হৃৎপিণ্ড ওদের,
আত্মপাত করতে হবে যেখানে সবার আমাদেরও
বাতাসচালিত তুরপুনের শেষ ভোজে।
তোমাদের সবার মুখ ভরে থুতু দিতে হয়। এভাবেই বলি।
বাকি আধখানা ওই শুনছে আমাকে,
খেতে খেতে, পেচ্ছাপ করতে করতে, আপন শুদ্ধির
ভেতরে উড়তে উড়তে—লবিতে জমত
ওপরালাদের ছেলেমেয়েদের মতো, যারা পলকা ডালের
ফেঁকড়ি হাতে হাতে চলে ফাঁকা করে দেয়া জায়গাটাতে,
যেখানে পড়ে পড়ে মাটি হয়ে যায় পতঙ্গের অ্যান্টেনা।
নরক তো নয়, এ যে পথ।
মৃত্যু নয়, ফলের বেসাত পথে পাতা।
এ এক দুনিয়া—পোষা নদী আর স্পর্শের ঈষৎ বাইরেকার
বেড়ালথাবায় ধরা এতটুকু দূর
চূর্ণ হয়ে যায় গাড়ির চাকায় পেষা হয়ে,

আর আমি শুনতে থাকি কেঁচো গাইছে
শতেক মেয়ের মনে মনে।
মরচে, গেঁজে ওঠা ভূকম্পন।
তুমি তো নিজেই ওই দুনিয়া নিশ্চয়
যে তুমি ভেসে বেড়াও অফিসের অঙ্ক ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
তা হলে কী করা? বসে সাজাব প্রকৃতি ঠিকমতো?
প্রেমের বরাত দেব? ফোটো হয়ে যায় পরক্ষণে
যে প্রেম—টুকরো কাঠ হয়ে যায়, মুখভরা রক্ত হয়ে যায়?
না। আমার ধিক্কার এই সবার ওপরে।
আমার ধিক্কার এই ত্যক্ত দফতরের
যত ষড়যন্ত্র, যার কোনও
দুঃখের বিকিরণ নেই, যে কেবলই
মুছে দেয় বনের প্রকল্প সব একে একে, আর
নিজেকে আহার বলে তুলে দেব এখন আমি ওই
নিংড়ে শুকোনো গোরুদের মুখে মুখে
যখন তাদের হাম্বা ডাক ভরে দেয় গোটা দেশ, আর ওদিকে
তেল পিয়ে পিয়ে মত্ত হয়ে ওঠে হাডসন নদী।

১৯৩৬-এর জুলাইয়ে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের পূর্বাহ্নে ফালাঙ্গা জাতীয়তাবাদীদের হাতে নিহত হন ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা (১৮৯৮-১৯৩৬), সর্বজাতীয় ধিক্কার ও শোকের মধ্যে বাঙালি কবিরও স্বাক্ষর ছিল সে সময়ে। তাঁর জন্মশতবর্ষ চলেছে এ বছরে। লোরকার সবচেয়ে বিতর্কিত কাব্য 'নিউ ইয়র্কে কবি' মৃত্যুর পরে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯২৯-৩০-এ কবির আমেরিকা প্রবাস-পর্বের তিক্ত ফসল এই কাব্য। ধনতন্ত্র, মেশিন-সংস্কৃতি ও নির্যাতিত মানুষের সমবায়ে তৈরি হয়েছে এখানে অন্তর্বিষয়, উগ্র সুর্‌রিয়ালিস্‌ট্ যার রচনাপন্থা—যে পরাবাস্তবের আন্দোলন শিল্পী সালভাদর দালির সহযোগে এর আগেই তিনি পত্তন করেছিলেন স্পেনে। তাঁর জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে এই কবিতাটি প্রকাশ করা হল।

বাসমতীর উপাখ্যানের বৃত্তগুলি

আনন্দ ঘোষ হাজরা

কবি জীবনানন্দ ও ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের মধ্যে বাবধান আযোজন। দুটি সত্তার অবস্থান দুই মেরুতে। অবশ্য কখনও যে মেরুমৈত্রী ঘটে না তা নয়। যখন ঘটে তখন তার আকর্ষণ প্রবলতম হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। সে এক মহাবিস্ময়ের সময়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে সেই বিস্ময়ের মুহূর্তগুলি ধরার চেষ্টা করা হয়নি। বরং বাসমতীর উপাখ্যান পড়তে পড়তে আমার অনুভবগুলি কখনও মিতভাষণে কখনও অতিভাষণে পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

জীবনানন্দের উপন্যাসগুলিতে কতকগুলি সাধারণ গুণ দেখা যায়। বাসমতীর উপাখ্যানে সেগুলি তো অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সাধারণ গুণগুলি ছাড়াও আরও দু-একটা বিষয় বাসমতীর উপাখ্যানকে একটু আলাদা মর্যাদা দিয়েছে; যেমন—দেশ বিভাগের ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পটভূমিকা। দেশ স্বাধীন হচ্ছে এবং ভাগ হচ্ছে সে সময়। উপন্যাসটির প্রকাশক সম্পাদকীয়তে যথার্থই বলেছেন যে ওই পটভূমিকায় সমাজের সঙ্গে সমাজের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের অবস্থানবিন্দুগুলি পরিবর্তিত হচ্ছিল। জীবনানন্দের কলমে ওই অস্থির পরিবর্তনবিন্দুগুলি কী সুন্দরভাবে রেখায়িত হয়ে উঠছে তা লক্ষ করার মতো। বরিশালের ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মসমাজের একটা বিষাদমধুর ছবিও এঁকেছেন জীবনানন্দ, ১৯৪৭–৪৮ সালে লিখিত এই উপন্যাসটিতে। বাসমতীর উপাখ্যান জীবনানন্দের শেষ পর্যায়ে রচিত চারটি উপন্যাসের অন্যতম। এই চারটি উপন্যাস হল, সুতীর্থ, মালাবান, জলপাইহাটি ও বাসমতীর উপাখ্যান। তার মধ্যে জলপাইহাটি ও বাসমতীর উপাখ্যানের প্রোটাগনিস্ট কলেজের অধ্যাপক—একজন কলকাতায় যায় জলপাইহাটি থেকে, চাকরির সন্ধানে; আর অন্যজন অর্থাৎ বাসমতীর উপাখ্যানের নায়ক সিদ্ধার্থ সেন জানে যে তাকে বাসমতীতেই থাকতে হবে, এমনকী বাসমতী ছাড়া কলকাতায় গিয়ে সে বাঁচতেই পারবে না। যে কথা বলতে শুরু করেছিলাম, সাধারণ গুণগুলির মধ্যে রয়েছে অতিমাত্রায় বাস্তববোধ ও সূক্ষ্মদৃষ্টি। অতিমাত্রায় বাস্তববোধ বলতে আমি অতিবাস্তবতা বা সুররিয়ালিজমের কথা বলছি না। বরং উল্টোটা। তীব্র বাস্তবানুভূতির কথাই বলতে চাইছি যা তাঁর কবিতায় তখন সমালোচকেরা পাননি। এমনকী তাঁর মৃত্যুর পর পরই বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা-ক্ষেত্রে জীবনানন্দের কবিতা বাস্তবঘেঁষা এমন কথা কখনওই বলেনি। বরং সমাজ সংসার বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্করহিত বলেই ভাবা হয়েছিল তাঁকে। বনলতা সেন প্রকাশিত হলে, ১৩৪৯ সনের কবিতা পত্রিকায়, বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব নিজেই লেখেন, 'বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন।' তাঁর মৃত্যুর পরও অম্লানশঙ্কর তাঁকে 'শুদ্ধতম কবি' বলে সম্বোধন করেন। অমিয় চক্রবর্তী তাঁর মৃত্যুর পর বুদ্ধদেবকে লেখেন, 'প্রসন্ন বেদনায় কোমল উজ্জ্বল বড়োই নতুন ও নিজস্ব তাঁর লেখা।' বুদ্ধদেব তো আরও বলতেন 'প্রকৃতির এবং প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ'। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো বলে ওঠেন, 'সময়ের কণ্ঠরোধ করে তিনি কথা বলেন, শব্দ তাঁর কাছে বস্তু-বিরহিত সংকেত মাত্র।' নীরেন্দ্রনাথের বিখ্যাত উক্তি তো রয়েছেই—'আত্মঘাতী ক্লান্তি'র কবিতা জীবনানন্দের। এর প্রতিবাদ কবি নিজেই করেছিলেন। বস্তুত সুরজিৎ দাশগুপ্তের কাছে তিনি আক্ষেপও করেছিলেন বাংলায় ভাল সমালোচক নেই বলে। এই সেদিনও দেবীপ্রসাদ বলেছেন, 'এমনকী চল্লিশের যুগে, অবশেষে 'সচেতন' হয়ে যখন আত্মকেন্দ্রিক কবিতার দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে এসে আত্মনিয়োগ করেছেন উজ্জ্বল বক্তব্যের রচনায় তারও কোনও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা দার্শনিক ভিত্তি নেই।' সব উক্তিগুলিই যদিও একপেশে এবং অনেকাংশে সত্যরহিত, তবু উক্তিগুলির মধ্যে কিছু সত্য আছে ধরে নিলে কবিতার জগতে তাঁকে যে-মেরুর সাংসদা বলে মনে হয়, উপন্যাসের ক্ষেত্রে তার বিপরীত।

এখানে তিনি বাস্তবের কঠিনভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। কলেজ শিক্ষকদের, মাস্টারমশাইদের, কেরানির সংসারের তীব্র দারিদ্র্য তাঁর লেখার অন্যতম মূল উপাদান। তাঁদের ঘরে কেরোসিন থাকে না, কেরোসিনের কুপি পর্যন্ত অনেক সময় থাকে না। যতক্ষণ পারা যায় আলো না জ্বেলে তাঁরা অন্ধকারে কথা বলেন। জ্ঞানতত্ত্বও আলোচিত হয় তাঁদের মধ্যে জ্যোৎস্নায়, অন্ধকারে। তার মধ্যে সরোজিনীর আদর্শবাদিতাও ভেঙে যায়

এক সময়। কনট্রোল ছাড়া অন্য পন্থায় কেরোসিন না নেবার প্রতিজ্ঞা ভেঙে যায় তাঁর। সিদ্ধার্থের স্ত্রী সুনীতি দেড়শো টাকায় সংসার চালানো সম্ভব নয়, জানিয়ে দিয়ে, প্রতি মাসে আরও কিছু টাকা দাবি করে। সিদ্ধার্থ ভেবে কূল পায় না কোথা থেকে পাওয়া যাবে টাকা, কারণ প্রভিডেন্টফাণ্ড, ইনসিওরেন্স সব জায়গা থেকেই সর্বোচ্চ পরিমাণ লোন নেওয়া আছে তার। এই সব যথার্থতা ও বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যেতে যেতেই প্রকাশ পায় সিদ্ধার্থ-সুনীতির অসুখী দাম্পত্যজীবন। বাস্তবিকপক্ষে জীবনানন্দ উপন্যাসে কখনও সুখী দাম্পত্যজীবনের চিত্র এঁকেছেন বলে মনে হয় না। মালাবানের দাম্পত্যচিত্রের মতো নিষ্ঠুর করুণ দাম্পত্যসম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে সম্ভব কি না কে জানে! এটাও জীবনানন্দের উপন্যাসের একটা সাধারণ লক্ষণ মনে করা যেতে পারে।

অনেকে অবশ্য বলেন, বাস্তবগুণান্বিত হলেও জীবনানন্দের উপন্যাসে 'ঘটনা' নেই। ঘটনাবিহীন উপন্যাস আস্বাদ্য হয়ে পড়ে ঢেলা কঠিন হয়ত। কিন্তু 'ঘটনা' মানে কী? আমরা কি এখন উপন্যাসে কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টোর মতো ঘটনা চাইব? থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু থাকতেই হবে তার কি মানে আছে? অথবা নতুন করে একখানা ওয়ার এন্ড পিস্ রচনা করতে হত জীবনানন্দকে? নিদেনপক্ষে, এখনকার উপন্যাসকার মার্কেজের উপন্যাসে যেমন ঘটনা থাকে? 'ক্রনিক্‌ল্ অব অ ডেথ ফোরটোল্ড' বা 'হানড্রেড ইয়ারস্ অব সলিটিউডে' যেমন? এমনকী ডস্টয়েভস্কির 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্টে' যেমন একটা বড় ধরনের ঘটনা ঘটে গিয়ে মনোভূমি পর্যন্ত আলোড়িত হতে থাকে, জীবনানন্দের ঘটনা সেভাবে ঘটে না। তাছাড়া 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি' উপন্যাসে কি ছিল ঘটনা? আমাদের নিত্যদিনের জীবনযাপনে যে রকম ছোট ছোট ঘটনা ঘটে বা ঘটনার সূত্র আমরা দেখতে পাই, সেসব ছোট ছোট ঘটনার কোনও কারণ থাকে না হয়ত বা, কোনও উদ্দেশ্য থাকে না, সেই সব ক্ষুদ্র ঘটনাই ধীরে ধীরে আমাদের অজ্ঞাতসারেই কখন যেন বিরাট আলোড়ন তুলে দেয় আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয়, আমাদের মনোরাজ্যে। এরকম ঘটনার কথা বলার আগে 'বাসমতীর উপাখ্যান' গ্রন্থটির কাঠামোটিকে একটু পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

বাসমতী এখনকার বাংলাদেশের, তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার, একটি মফঃস্বল শহর। নিশ্চয়ই বরিশাল। কারণ কবি যেভাবে কলেজের ও ব্রাহ্ম সমাজের বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন অন্তরঙ্গভাবে বর্ণনা আছে প্রকৃতির, তাতে বরিশাল হওয়া সম্ভব, যদিও বর্তমান নিবেদক কখনও বরিশাল যায়নি। উপন্যাসটিতে মোটামুটি তিনটি বৃত্ত আছে। একটি বৃত্তে রয়েছে বাসমতী কলেজের অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেন, প্রিনসিপ্যাল মজুমদার, কলেজের ছাত্রী রমা ও তার বাবা প্রভাসবাবু, কলেজের কেরানি রাজীববাবু, রাজীববাবুর মেয়ে সীমা যে আবার রমার সহপাঠী,অধ্যাপক বিনয়তোষ প্রভৃতি। অন্য বৃত্তটিতে রয়েছে সরোজিনী, টিনি, ছাতু, ফাটা মহালনবিশ, সুকুমার, বনজুবি, বিশাখা, গগনবাবু, হিতেনবাবু ইত্যাদি। এই বৃত্তটি ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মসমাজের বৃত্ত। তৃতীয় বৃত্তে সিদ্ধার্থ, সুনীতি, তাদের ছেলেমেয়ে। সিদ্ধার্থের বৃত্তটি অন্য বৃত্তের কাছাকাছি যায় অনেক সময়। অনেক সময় আবার অন্য বৃত্ত দুটিকে শুধু যে স্পর্শ করে তাই নয়, আদানপ্রদানও চলে, পরস্পরের মধ্যে প্রভাবও বিস্তার করে। এরকম অভাস্তরীণ আদানপ্রদানের ফলেই উপন্যাসটি গতি পায়, গড়ে ওঠে। এ ছাড়াও আরেকটি বৃত্তের সংবাদ আমরা উপন্যাসের মধ্যেই পাই—সেটা সিদ্ধার্থ, রজনীলাল, সুকুমার ইত্যাদি ব্যক্তির সামাজিক কর্মবৃত্ত। এই তিনটি বা চারটি বৃত্তেই অন্তর্লীনভাবে প্রবাহিত হয়ে আছে দেশভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ইত্যাদির চিন্তা-ভাবনা। চতুর্থ বৃত্তটিকে আমরা অবশ্য স্পষ্ট দেখতে পাই না। অনুভব করি মাত্র। বৃত্তটির সুদূর মানবিক অনুভূতি আমাদের মনে এক ধরনের ভাললাগার সঞ্চার করে। সুতরাং ওই চতুর্থ বৃত্তটিকে আলোচনার মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে আনা যাবে না। সব বৃত্তগুলির ঘূর্ণন উপন্যাসের একেবারে শেষ পর্যায়ে একটি শান্ত 'শমে' এসে স্থিতিলাভ করে। এই 'শমের' স্থানটি হচ্ছে ফাটামহালনবিশ ও বনজুবির কথোপকথন—গোধূলিবেলার কথোপকথন—প্রতীকী গোধূলিবেলার বিষাদমধুর কথোপকথন।

জীবনানন্দের উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ হিসাবে বাসমতীর উপাখ্যানে ঘটনার অভাবের কথা হচ্ছিল। আমি বলেছিলাম জীবনানন্দের সেই সূক্ষ্ম নৈশ্চিক্য কাজ যা ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে ধীরে ধীরে আবর্তের ও আলোড়নের সৃষ্টি করে। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। রমা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে অকস্মাৎ প্রিনসিপ্যাল মজুমদারের চেম্বারে ঢুকে পড়ে। খুব ছোট একটি ঘটনা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এরকম ঘটনা ঘটতেই পারে। হামেশাই ঘটে। কিন্তু ছোট এই ঘটনা থেকেই তারপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে রাজীববাবুর মেয়ে কলেজের ছাপোষা কেরানির চাকরি যায়। হয়ত রাজীববাবুর মেয়ে সীমারও আর পড়াশুনা হয় না। কী গভীর আলোড়ন নিয়ে আসে ঘটনাটি রাজীববাবুর সংসারে, রমার মনোরাজ্যে! একটি ছোট ঘটনার সূত্র ধরে এত বড় ঘটনা ঘটে এবং তার মধ্যে উপন্যাসকার যেন একেবারে নির্লিপ্ত থেকে পাত্রপাত্রীদের মনোরাজ্য নিয়ে খেলা করতে থাকেন। এই রকম আরেকটি ছোট ঘটনা হল মধ্যরাতে সিদ্ধার্থ সেনের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করা, রমার সঙ্গে, রমার বাড়ির জানলার ধারে। সিদ্ধার্থ গিয়েছিল চায়ের ফ্লাস্ক নেবার জন্য। পাশের জিরানডাঙার মুসলমান বস্তিতে

কলেরা লেগেছে। সেখানে কাজ করতে করতে, কাছেই, প্রভাসবাবুর বাড়ি থেকে চা ও চায়ের ফ্লাস্ক নিতে আসা বিচিত্র নয়। এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। অবশ্য এটাও ঠিক যে রমা ও সিদ্ধার্থ পরস্পরের প্রতি মনে মনে অনুরক্ত ছিল, যদিও সিদ্ধার্থ বিবাহিত এবং যদিও কেউ-ই কখনওই অনুরক্তির কথা উচ্চারণ করেনি, ভাবেভঙ্গিতেও প্রকাশ করেনি। একজন আরেকজনের মনের খবরটিও জানত কিনা সন্দেহ। ওই ছোট ঘটনাটি বাদে তাদের আচরণেও কেউই অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেনি। তবু এই ঘটনাটিই মাঝে মাঝে টিনি সরোজিনীদের শান্ত স্নিগ্ধ বিষাদমধুর পরিবেশে ক্রেদের মতো জেগে ওঠে আবার মিলিয়েও যায় এবং এই সামান্য ঘটনাটিই সিদ্ধার্থ ও সুনীতির সম্পর্কের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ছিদ্র বা ফাটলের সৃষ্টি তো করেই; দুজনের মনোরাজ্যেই অপরিসীম দাহের সৃষ্টিও হয় এবং উপন্যাসকার পরম নির্লিপ্তিতে তাদের মনোভূমিতে বিচরণ করেন। এরকম আরও ঘটনার উল্লেখ করা যায় বাসমতীর উপাখ্যান থেকে। এতৎসত্ত্বেও আমরা কি বলব, জীবনানন্দের উপন্যাসে 'ঘটনা' থাকে না? এই ঘটনাগুলি থেকে কীভাবে শাখাপ্রশাখা নির্গত হয় এবং কীভাবে তা পাত্রপাত্রীর মনোরাজ্যে ফাটল ধরায় এবং কীভাবে উপন্যাসকার তাঁর অনবদ্য ভাষায় তাদের মনোরাজ্য নিয়ে খেলা করেন, তা উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারলে ভাল হত। কিন্তু নিবন্ধটি দীর্ঘতর করা অনাবশ্যক।

জীবনানন্দ সাধারণত তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি আঁকতেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। দ্বিতীয় যে বৃত্তের কথা আমি উল্লেখ করেছি সেই বৃত্তটি তিনি এঁকেছেন বরিশালের ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মসমাজের চিত্র থেকে। আমরা জানি জীবনানন্দের ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, বাবা, কাকারা, পিসিমারা প্রায় সকলেই বরিশালের ব্রাহ্মসমাজের সক্রিয় সভ্য শুধু নন, অনেকেই—যেমন, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, বাবা ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট পদাধিকারীও ছিলেন। পিতামহ সর্বানন্দের সাতপুত্র, চারকন্যা। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দের অন্যান্য ভাইবোনেদের মধ্যে (সত্যানন্দ ছাড়া) আরও পাঁচজনের কথা দেবীপ্রসাদ বলেছেন। সপ্তমজনের কথা বলেননি। জীবনানন্দের আরেক কাকা কি অবিবাহিত ছিলেন এবং বরিশালের সর্বানন্দভবনে থেকে গিয়েছিলেন? ব্রাহ্মসমাজের কাজে নিবেদিত সংযত, শান্ত চরিত্রের এই কাকাই কি বাসমতীর উপাখ্যানের ছাতুকাকা? দেবীপ্রসাদ বা সুরজিৎ দাশগুপ্ত হয়ত বলতে পারবেন। দেবীপ্রসাদের বই থেকে আরও জানতে পারছি বিবাহের পর জীবনানন্দের এক পিসিমা 'প্রেমদা সত্তরও সর্বানন্দভবনেই থেকেই যান। (তাঁর বাবার) ছোট বোন স্নেহলতা চিরকুমারী, বাবার প্রতিষ্ঠিত সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।' প্রেমদাকে অবলম্বন করেই কি জীবনানন্দ সরোজিনীর চরিত্র চিত্রিত করেছেন কিংবা স্নেহলতাকে অবলম্বন করে টিনি মজুমদারের?

দ্বিতীয় বৃত্তটি যেইমাত্র উপন্যাসে অঙ্কিত হয়, ঠিক সেই মুহূর্তেই উপন্যাসটি অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। একটা ধীর শান্ত স্নিগ্ধ পটভূমি তৈরি হয়, অথচ যা প্রবহমান। এই বৃত্তের প্রত্যেকেরই মূল্যবোধ আছে। ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। যে মুহূর্তে দ্বিতীয় বৃত্তের পাত্রপাত্রী আবির্ভূত হয়, সেই মুহূর্তেই অন্ধকার, ধূপ ধোঁয়া, শান্ত পরিবেশ, ছোট ছোট কথা ও শব্দ, যেন অন্য এক পৃথিবী তৈরি করে—বাইরে চাঁদ থাকে আবার, ফালি চাঁদ—একটা বিষাদমধুর ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মসমাজের ঘোরলাগা বাসমতীর পৃথিবী। সরোজিনী টিনির এই বাড়ি এবং সিদ্ধার্থের বাড়ি, বস্তুত একটাই বাড়ি। অনুমান করা অসঙ্গত নয় এটি বরিশালের সর্বানন্দভবন। সরোজিনী সিদ্ধার্থের পিসিমা। লেখক বলছেন "সিদ্ধার্থেরা কায়েত নয়—সেনগুপ্ত—সিদ্ধার্থ গুপ্ত কেটে ফেলে শুধু সেন লেখে। সরোজিনী পিসিমা বিধবা হবার পর এনট্রান্স্ পাশ করেছিলেন। ফার্স্ট আর্টস পড়েছিলেন।" এখন বয়স প্রায় সত্তর। টিনি মজুমদারের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। অবিবাহিতা। ওখানকার স্কুলে টিচারি করে। এই বাড়িতে ছাতুকাকাও থাকে। সন্ধ্যাবেলায় ব্রাহ্মসমাজের আরও লোকজন সরোজিনীর এই বাড়িতে চলে আসেন। বাসমতীর ব্রাহ্মসমাজকে কীভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায় সে বিষয়ে নানারকম আলোচনা হয়। কলকাতায় ব্যবসা করে কিছু টাকা জমিয়ে বাসমতীর ফেলে যাওয়া জমিদারি ফিরে পেয়ে, ব্রাহ্মসমাজের প্রয়াত বড়কমলবাবুর ছেলে ফাটা মহালনবিশও এসে হাজির হয় এবং আর কলকাতায় ফিরে না গিয়ে ওখানেই থেকে যেতে চায়। সেও চলে আসে সরোজিনীর বাড়িতে সান্ধ্য আড্ডায়। ফাটা মহালনবিশের বয়স নিয়ে লেখক যদিও এক এক জায়গায় এক এক রকম উক্তি করেছেন, তবু বোঝা যায় ফাটার বয়স চল্লিশের হয়ত কিছু বেশিই। সিদ্ধার্থের খোঁজে এসে এই আড্ডায় বিশাখা ও বনচ্ছবিও চলে আসে। কথায় কথায় রাত বাড়ে। গগনবাবু বলেন, "ধর্ম আন্দোলন আরম্ভ করেছিল বটে ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু মানুষ আজকাল ধ্যানট্যান ধর্মকর্মের গণেশ উল্টে দিয়েছে। ধর্মসমাজ হিসাবে ব্রাহ্মসমাজের কাজ প্রায় ফুরিয়ে গেছে বলেই মনে হয়।" এই প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া ব্রাহ্মসমাজের চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করেছেন লেখক, চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মসমাজকে ধরে রাখার আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যেও এই চরিত্র গুলিতে খাদ নেই। অন্ধকার, জ্যোৎস্না, স্তিমিত আলো সবই হয়ত ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মসমাজের প্রতীক-পটভূমি হিসাবে কাজ করে। রাত্রি বাড়লে গগনবাবু, হিতেনবাবু, মেয়েরা সকলেই ফিরে

যান বটে, কিন্তু রাত্রে সরোজিনীর বাড়িতে থেকে যায় ফাটা মহালনবিশ। খুব ছোট ছোট আঁচড়ে এই বাড়ির এবং সিদ্ধার্থের বাড়ির এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থানটি চিত্রিত করেন লেখক। ফাটা মহালনবিশ বলছেন, "আপনারা মাসে তিন বোতল তেল পান নাকি সরোজিনীদি?"

—"হ্যাঁ, চার বোতলও পাই কোনও কোনও মাসে। দেড় সের দু সের তেল এক মাসের জন্যে।"

—"কী করে চলে তাহলে?'

"এই ত কী রকম করে চালাচ্ছি দেখছ ত? তোমরা সকলে এসেছ অথচ বাতি জ্বালাতে পারছি না।"

বয়সের জন্য সরোজিনীর ঘুম হয় না ভাল। ঘুম ও জাগরণের সন্ধিক্ষণে, নাকি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, সিলিঙের কাঠের পাটাতনের ওপর ভোঁদড়ের ছুটোপুটির শব্দ শুনে, ভোঁদড়দের মিলিত হবার শব্দ শুনে, সরোজিনী, টিনি জীবনের প্রতি আবার আকর্ষণবোধ করেন, হয়ত নতুন করে। তাঁরা যে সারাজীবন বিবাহিত জীবনের স্বাদ অনুভব করলেন না একথা বলেই ফেলেন টিনি। এই সময়, সরোজিনী, ফাটা ও টিনির অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে যে কথোপকথন তা সেই বিস্ময়কর মুহূর্তটি স্পর্শ করে যখন কবি জীবনানন্দ উঁকি মারেন উপন্যাসের মধ্যে থেকে। আসলে প্রকৃতির বর্ণনাতে তো জীবনানন্দ ক্লান্তিহীন। কবিতার কথা ছেড়েই দিলাম। ছেড়ে দিলাম 'রূপসী বাংলা'র কথাও। উপন্যাসকার হিসাবে প্রকৃতি বর্ণনার সময় বিভূতিভূষণের তুলা যদি কেউ থাকেন তিনি জীবনানন্দ। এরকম বর্ণনার সময় উপন্যাসকার জীবনানন্দের ও কবি জীবনানন্দের মেরুমৈত্রী ঘটে। পাঠক অনাবিল মুগ্ধতায় চেয়ে দেখে সেই মেলবন্ধন। লাভ করে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

"এই বারে ডাকবে পেঁচা' সরোজিনী বললেন, 'এটা কাল পেঁচা নয়, কালপাখি, হুতোম পেঁচা—ভারি চমৎকার লাগে এর ভাব আমার। কোকিল ডাকে সে এক রকম। হুতোম ডাকে সে আর এক রকম। বেশ গাম্ভীর্য আছে এর ডাকের ভেতর। কার্তিক অঘ্রাণে খুব অথই নিশ্চুপ হয়ে উঠলে অন্ধকার আর শিশিরের ভেতর জেগে ওঠে হুতোম। কেমন ডাক ছাড়ে শুনেছ? ফাটা—'

শুনছিল। ভারি আশ্চর্য লাগছিল তার। অনেক দূরে মোরগ ডাকছে কোনও গেরস্তের ঘরের ভেতর থেকে হয়ত। কিংবা বুনো পাখি। চারদিককার জমি জঙ্গলের ভেতর থেকে বনমোরগ ডাকছে খুব সম্ভব....মানুষকে আলগোছে নিজেদের দিকে টেনে রাখে যেন এই সব পাখিদের ডাক—হেমন্ত শীতে বাসমতীর এক কিনারে প্রকৃতির ধান মাঠ জঙ্গল গন্ধের খুব কাছে বসে—এত রাতে এত নক্ষত্রের ভেতর...শহরপাড়ার রাতের নিঃশব্দতায় ছেলেবেলার বাসমতীর কথা মনে পড়ছে তার, বিশেষত পাশাবতী আর সিদ্ধার্থের এই সাহেবডাঙার শ্বেত জঙ্গল ঝিল নক্ষত্র হেমন্ত রাত্রির কথা....."

"সরোজিনী বললেন, 'পেঁচাটা উড়ে গিয়েছে।'

'কেন গেল?'

'এক জায়গায়ই কি থাকবে সারারাত? আবার আসবে।'

'কখন?'

'আজ নয়, কাল রাতে আবার। এখন সাকরখোরা নদীর দিকে গেছে—'

'রয়নী নদীর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, সেটা আমাদের বাড়ির পেছনে উত্তর দিকের ধান জমি দু তিন কানি শেষ হলে কালিঝিরা ধানের খেতগুলোর পাশ দিয়ে সাকরখোরার খেতটা আছে—ঐখান দিয়ে ঘুরে যায়—দেখনি তুমি?'

'...নদীটা মোড় ঘুরে কোন দিকে যায় ওখান থেকে?'

'জলজিরানির দিকে।' "

সিদ্ধার্থ সে রাত্রে বাড়ি ফেরে না। পরের দিন যখন ফেরে তখন সুনীতি জেনে গেছে সিদ্ধার্থ রমার জানালায় কোনও এক গভীর রাতে দাঁড়িয়েছিল। কেন দাঁড়িয়েছিল জানে না। সিদ্ধার্থ ও রমার সম্পর্ক তৃতীয় বৃত্তটিতে এসে সুনীতি ও সিদ্ধার্থের দাম্পত্য সম্পর্ককে যেমন গুলিয়ে তোলে, তেমনই সেই ঘোলা জলের পাঁক থেকে সিদ্ধার্থের দারিদ্র্যের চিত্রটিও উদ্ঘাটিত হয়ে আসে।

"অত রাতে জিরানডাঙায় প্রভাসবাবুর জানলায় দাঁড়িয়ে তুমি কী করছিলে?'

সিদ্ধার্থ এক মিনিট চুপ করে থেকে বললে, 'রমার সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'রমা?' সুনীতি জলের ভেতর বাঁ হাতটা ডুবিয়ে রেখে সিদ্ধার্থের দিকে তাকাল।"

যত সহজে উপরের বাক্যালাপ উদ্ধৃত করা গেল তত সহজে সবটা ঘটেনি। সুনীতি বারবার বলতে বলতে পারছে না, প্রকারান্তরে বলার চেষ্টা করছে; আবার তার মধ্যে চলে আসছে সংসারের প্রয়োজনে টাকার কথা—লেখক যে কি অনবদ্যভাবে দুজনের মনোজগতে ভ্রমণ করেছেন তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে সম্পর্কটা মালাবানের দাম্পত্যসম্পর্কের মতো বিষিয়ে বা একেবারে ঘুলিয়ে ওঠেনি। ঘুলিয়ে ওঠার মতো অবস্থা একেবারেই দাঁড়িয়েছিল উপরোক্ত কথোপকথন চলাকালীন এবং ঠিক সেই সময়েই দ্বিতীয় বৃত্তের সংস্পর্শে এসে গেল তৃতীয় বৃত্তটি। প্রায় শান্তির প্রতিমূর্তি সরোজিনী

প্রবেশ করলেন এবং আবার দারিদ্র্যের ছবিটি প্রাধান্য পেয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল।

" 'ঘরে একটা বাতি নেই' — সরোজিনী বললেন।

'কেরোসিন নেই' — সুনীতি বললে।

'মোম আছে?'

'আছে — খাওয়ার সময় ছালাব। এখন আলো চাই আপনার পিসিমা?'

'না, বেশ জ্যোৎস্না আছে। কী রান্না করলে এবেলা?'

'এখনও উনুন ধরাই নি'

'এখনও না!"

কিন্তু বাইরে অন্ধকার বাড়ছে ভিতরের মতোই। কিছুক্ষণ পরই সাইক্লোন উঁচবে সিদ্ধার্থ-সুনীতির মনের ভেতরের সাইক্লোনের মতোই। তাদের ছেলেমেয়েরা এই জল ঝড়ের মধ্যে কোথায় আছে? এখনও ফেরেনি। সুকুমার তাদের খুঁজতে বের হয়ে গেছে। সিদ্ধার্থও চলল। গাছ ভেঙে পড়ছে। বৃষ্টির সমুদ্র পার হয়ে অন্ধকারে ছেলেমেয়েদের খুঁজছে সিদ্ধার্থ, যেমন করে খুঁজেছিল তার বাবা সিদ্ধার্থকে এই রকমই অন্ধকার রাতে। খুঁজে পাবে কি সিদ্ধার্থ তার ছেলেমেয়েদের? প্রশ্নটির কোনও উত্তর দেননি লেখক। সমগ্র ছবিটি তাই হয়ে উঠেছে অসম্ভব রকমের প্রতীকী। অধ্যাপক সেন অন্ধকারে হেঁটেই যাচ্ছে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খুঁজতে। কিন্তু পাচ্ছে না। হাঁটছে প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে আমরাও হাঁটছি কি? খুঁজছি কি এখনও? এ রকম প্রতীকী চিত্রের ব্যবহার খুব ছোট আকারে অনেকে রয়েছে উপন্যাসটিতে। তৃতীয় বৃত্তের মধ্যেই রয়েছে। রমা ও সিদ্ধার্থের সম্পর্কে যে রটনা তা ক্রমশ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জালের মতো বিস্তৃত হয়ে পাত্রপাত্রীদের আবৃত করে ফেলছে। সরোজিনী, সিদ্ধার্থ, সুকুমার, সুনীতি এদের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। এমত সময়ে এই জালের প্রতীকটিই ব্যবহার করেছেন জীবনানন্দ। অবশ্যই এই জাল মাকড়সার জালের মতো, হয়ত বিষাক্ত মাকড়সার লালার মতো বিরক্তি উদ্রেককারী, কেবল একটু ছালা ধরায় মাত্র — বাস্ তার বেশি কিছু নয়।

জীবনানন্দের প্রতীকিতা পদ্মা নদীর মাঝির ময়নাদ্বীপের প্রতীকিতার তুলনায় আরও অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও অনুচ্চারিত। বরং পুতুল নাচের ইতিকথার আরম্ভে বজ্রাহত মানুষের মৃত্যু যে অন্ধশক্তির প্রতীক হয়ে সমগ্র উপন্যাসটিকে ছেয়ে আছে সেই ধরনেরই বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত প্রতীক বলে মনে হয় সিদ্ধার্থের ঝড় জলের মধ্যে ছেলেমেয়েদের খুঁজতে বের হওয়া। তখনই তার মনে পড়ে বাবার কথা। অর্থাৎ অন্ধকারে পরবর্তী প্রজন্মকে ট্রাডিশনাল খোঁজা এক ব্যাপ্ত প্রতীকিতায় পরিণত হয়। সেই কবে থেকে আমরাও পরবর্তী প্রজন্মকে খুঁজছি অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্যে, আমরা তাদের জন্য যে স্বল্পালোকিত আলোকবৃত্ত তৈরি করতে পেরেছি তাও কোনও এক সময় নিবে যায় ঝড়ের দাপটে। (পারমাণবিক বিস্ফোরণের দাপটে হয়ত বা।) এত বছরের সাধনার শেষে আমরা তাদের কিছুই দিতে পারিনি, খুঁজেই পাইনি তাদের অন্ধকারে বৃষ্টির সমুদ্রে।

এইখানেই উপন্যাসটি শেষ হতে পারত। কিন্তু শেষ হয় না। আরও একটি ছোট বৃত্ত তৈরি হয় শুধু দু'জনকে নিয়ে। — ফাটা মহালনবিশ ও বনজুবি। এদের ভালবাসার সম্পর্কটি তৈরি হয়েও হয় না। হয় না, কারণ অনিশ্চিতির জন্য। এই অনিশ্চিতি দেশভাগ জনিত অনিশ্চিতি যেমন, তেমনই সে সময়কার পরিবর্তিত মূল্যবোধগুলির অনিশ্চিতির জন্যও হয়ত বা। আসলে কটি বৃত্তেই দেশভাগজনিত অনিশ্চিতি ও আশঙ্কা ছায়া ফেলেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষফল যেমন প্রত্যক্ষ করছে মানুষ, তেমনই আশ্চর্য এবং আশ্বাসময় এক মানবিকতাকেও প্রত্যক্ষ করছে। গ্রন্থের শুরুতেই গফুরের মতো সহৃদয় মানুষের সাক্ষাৎ পাই। প্রভাসবাবু স্টিমারে যাচ্ছেন, রমা সঙ্গে আছে। নিশিন্দার লাইনের জাহাজের বাটলার গফুর প্রভাসবাবুকে আর রমাকে ভাল করে খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত। হিন্দুরা কি খায় কেমন জিনিস পছন্দ করে তা সে জানে। তার আন্তরিকতাও নিশাদ। গফুর বলছে —

" 'পাকিস্তান হইব না কি কত্তা?"

'হবে শুনছি।'

'আউজগাই?'

'হ্যাঁ, শিগগিরই।'

'আপনারা পাকিস্তানে থাকইয়া না কত্তা?'

'দেখা যাক —'

'থাইক্যা যায়ন মাইয়া পোলা লইয়া; আন্ডাবাচ্চা আরামে থাকব।'

গফুরকে প্রভাসবাবু আবার বলছেন —

'আমি তো টাকা পয়সা দিয়ে দাম মিটিয়ে দেব গফুর। কিন্তু আরো কিছু পাওনা থাকে তোমার।'

গফুর গামছা দিয়ে কনুই ঘষছিল। গামছাটা বাঁ কাঁধের ওপর ফেলে বলল 'হেইডা আপনারা খুশি হইয়া আমাগো মুল্লুকে থাকলেই মিটব আমার।'

'তোমাদের মুল্লুক?'

'পাকিস্তানের কথা কইছি। হইব না?'

প্রভাসবাবু চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, 'শিগগিরই হবে শুনছি।'

'হইলে দৌড় বাজাইবেন না কি কলকাতায়?'.....

'কেউ কেউ চলে যাবে হয়ত। আমি থাকব ভাবছি।'

'জবরদস্তির কথা কইছু না। কলকাতার দিকে দৌড় বাজাইতে খুব ফুর্তি হইবে অনেকের, কিন্তু এই দেশে না থাকনের কিছু নাই, ভালবাইস্যা থাকোন লইয়া কথা।' "

উপরোক্ত অংশটিতে একটা আশা ব্যাপার লক্ষ করার মতো। গফুরের মতো সহৃদয় মানুষেরও অবচেতনে মনে হচ্ছে পাকিস্তান তাদেরই অর্থাৎ মুসলমানদের মুল্লুক। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার বিষ কীভাবে ঢুকে পড়েছে সরলচিত্ত সাধারণ মানুষের ভেতরও।

রমা ও প্রভাসবাবুর কথোপকথনের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা এসে যায়।

"প্রভাসবাবু বললেন, "ও সব রক্তের সমুদ্দুর ডিঙিয়ে এক হয়ে থাকবার দরকার নেই।'

— 'নোয়াখালি কলকাতায় কি কম রক্ত ঝরেছে?' "

এরকম টুকরো টুকরো অনেক চিত্র সমগ্র উপন্যাসের পটভূমির মতো কাজ করছে। উপন্যাসটিকে গেঁথে রেখেছে যেন। মুহূর্তের মধ্যে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাল্টে যাচ্ছে, সুস্থিতও হচ্ছে আবার। এ বড় অনিশ্চিতের সময়। তবু জয় হয় মনুষ্যত্বের, মানবিকতার। অধ্যাপক রজনী নানের গরু হারিয়ে গিয়েছিল। সিদ্ধার্থ ও রজনী নান গরু খুঁজতে গিয়েছিল কষাইপাড়ায় মুসলমানদের কাছে। সিদ্ধার্থ বর্ণনা দিচ্ছে পরে প্রভাসবাবু আর রমার কাছে —

"দল শুদ্ধ দা নিয়ে ছুটে এলেও অস্বাভাবিক হত না; কিন্তু দু-তিনজন হেঁকে এসেছিল শুধু। কিন্তু বাকি কষাইরা মাঝখানে পড়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখল, থামাল। দা বাগিয়ে এসেছিল যারা তারা ঠাণ্ডা হয়ে তামাক খেতে বসল।"

এইখানে, এই কশাইদের মধ্যিখানে এসে, এই দেশ বিভাজনের, সাম্প্রদায়িকতার সময়েও এক অপার মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছিল সিদ্ধার্থ যার বর্ণনা করার শক্তি তার নেই। অথবা সিদ্ধার্থ 'জীবনের মানে সম্বন্ধে হঠাৎ একটা অর্থ, প্রতিদিনের দেখা জিনিসকে অন্য জিনিসে দাঁড় করিয়ে স্বরূপের ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ সত্যস্বরূপ'কে দেখতে পায়। এই কশাইপাড়াতেই কলেরা লাগলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সিদ্ধার্থ, রজনী নান, সুকুমার প্রমুখ অধ্যাপকেরাই। দেশভাগ সত্ত্বেও সিদ্ধার্থ সিদ্ধান্ত নেয়, দেশ ছেড়ে বাসমতী ছেড়ে না যাবার।

বস্তুতপক্ষে দেশবিভাজনের সময়কে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময়কে এত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করেছে, সেই সময়ের স্পিরিটকে এত যথার্থভাবে তুলে ধরেছে এমন উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর কয়টি আছে বা আদৌ আর আছে কি না আমার জানা নেই। অন্তত এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

আলোচনাটি এইখানে শেষ করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু বাসমতীর উপাখ্যানের আর দুটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এক — এই উপাখ্যানটিতে পশ্চিমের তৃতীয় বিজ্ঞানজনিত বোধের প্রতিফলন ও তার ফলে উদ্ভূত নতুন প্যারাডিমের ছায়াপাত এবং দুই — এই উপাখ্যানটিতে জীবনানন্দের ভাষার ব্যবহার।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, জীবনানন্দ যে সময়টায় লিখেছেন সেটা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়, তেমনই বৃহত্তর বিশ্বের প্রেক্ষাপটেও সে সময়টা প্রভূত পরিবর্তনের সময়। সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়ে বিজ্ঞানজগতে বিজ্ঞানদর্শনের ক্ষেত্রে নানারকম পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে এবং তার জন্য আমাদের চিন্তাভাবনার রাজ্যেও সে সময় ওলোট পালোট ঘটে যাচ্ছে নানা প্রকার। নিউটনীয় বিজ্ঞানের যাকে বলা হয় দ্বিতীয় বিজ্ঞান (এরিস্টটেলীয় বিজ্ঞানকে প্রথম বিজ্ঞান বলা হয়) — তার সূত্রের মধ্যে ও চিন্তার মধ্যে বৃহত্তর চিন্তা সূত্রের অনুপ্রবেশ ঘটছে। নিউটনীয় বিজ্ঞানের ধারণা একটা সীমা পর্যন্ত ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পরমাণুর সূক্ষ্মতম ক্ষেত্র ও মহাবিশ্বের ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অন্য নিয়ম। জড় ও জীবনের পার্থক্য ঘুচে যাচ্ছে। পরমাণু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনিশ্চিতের রাজত্ব দেখছি আমরা। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণতত্ত্ব সময়ের ভাবনাকে পাল্টে ফেলছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে ও জীবনানন্দ সমগ্র জীবন ধরে এই পরিবর্তনের আন্দোলনের মধ্যে পড়েছিলেন। জীবনানন্দের কবিতাতে এই পরিবর্তনের অভিঘাত কীরকম তা বর্তমান নিবেদক পৃথক নিবন্ধে নিবেদন করার চেষ্টা করেছে। অতীতে চতুরঙ্গের কয়েকটি সংখ্যায় বিজ্ঞান ও কবিতার পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে জীবনানন্দ যে সচেতনভাবে এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করেছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর প্রবন্ধগুলি থেকে। 'কবিতার কথা'র প্রারম্ভিক একটি লাইন — 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' — নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে। লাইনটি অবশ্যেষে ক্লিশেতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কেউ কি লক্ষ করেননি, 'কবিতার কথা'র প্রবন্ধগুলির মধ্যে কি অসাধারণ বিজ্ঞানদর্শনজনিত বোধের অনুরণন! সময় সম্বন্ধে কীভাবে চিন্তা করছেন তিনি। জড় ও জীবনের পার্থক্য ঘুচে যাওয়ার চিন্তা বা এনট্রপির ভাবনা বাসমতীর উপাখ্যানে নানা স্থানে নানাভাবে ফলিত হয়েছে। নীচে একটি ছোট উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিতে দাঁড়ি টানব। তা না হলে আরও একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা হবে হয়ত এবং পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। তৃতীয় বিজ্ঞানের সামগ্রিকতার চিন্তা নীচের ছত্রটিতে। ফাটা মহালনবিশের চিন্তা। ফাটা পদার্থবিদ্যায় এম. এসসি।

"মানুষ বুদ্ধির উৎকর্ষে সমস্ত জড় পৃথিবী প্রাণী পৃথিবীর থেকে খানিকটা আলাদা হয়ে পড়লেও সকলকে যুক্ত করে

সব কিছুর সঙ্গে যে নিখুঁত গ্রন্থি রয়েছে সেটা আবিষ্কারের ভার পড়েছে মানুষের ওপর। এই আবিষ্কার করার সহজ প্রতিভার ভেতর দিয়েই মানুষ ক্রমে ক্রমে শুধু যে আত্মীয়তায়ই মিলিত করতে পারছে অপ্রাণকে প্রাণের সঙ্গে, প্রাণকে প্রাণীর সঙ্গে, প্রাণীদের পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে তা নয়, নিজেও স্পষ্ট সফল আত্মীয়তা বোধ করছে এদের সকলের সঙ্গে। ঐ অত বড় নক্ষত্রলেহী সরু সজনে গাছটা একটা জিরাফের মতো, জিরাফ আমারই মতো — এই অন্ধকার নিঃশব্দতায় স্থিত হয়ে আছে সে বটে আজ, মুছে যাবে কাল, আবার মণ্ডিত হয়ে উঠবে অন্য কোথাও, আবার মুছে যাবে — সৃষ্টির মনের ভয়াবহ অনিশ্চয়তার (প্রাণীদের কাছে) নিরাবিল আনন্ত্যের কাছে রেণুর মতন সে আজ, সূর্য হতে হবে তাকে আর একদিন; কিন্তু নিরাবিল আনন্ত্যের শেষ হলো না তখনো তবুও, সূর্য আর ধূলি সূর্য, রেণু সূর্য একটা বিস্তীর্ণ আত্মীয়তায় গ্রথিত হয়ে চলতে লাগল। শেষ শৃঙ্খলা শেষ হয়ে গেলে কী থাকে তারপর?

কিন্তু কোনো শৃঙ্খলাই পরিসমাপ্ত হবার নয়, গ্রথিত হয়ে চলেছে সব, গ্রথিত হবার প্রতি মুহূর্তই প্রাণঘন মুহূর্ত...”

মনে পড়ছে একটি ছোট চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকে তিরস্কার করেছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল জীবনানন্দ কবিতার ভাষার ওপর ইচ্ছাকৃত ভাবে জোর খাটাচ্ছেন। বাসমতীর উপাখ্যানে জীবনানন্দের ভাষার ব্যবহার দেখলে কি বলতেন রবীন্দ্রনাথ? দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতেন। উপন্যাসে, ছোটগল্পে জীবনানন্দ ভাষার চলনই পাল্টে ছিলেন। ভাষা এত সাবলীল অথচ দেশি বিদেশি তৎসম তদ্ভব চলিত সব কিছু মিশ্রিত একটা আধুনিক নতুন ভাষা যেন। এখনও এত আধুনিক ভাষায় উপন্যাস লেখা হয় কি? অন্তত ১৯৪৭।৪৮ সালে উপন্যাসের এই ভাষা যে আধুনিকতম ছিল একথা অবশ্যই বলা যায়। প্রত্যন্ত প্রদেশের বাগধারা ও শব্দগুলি হয় সরাসরি কিংবা কিঞ্চিদধিক পরিবর্তিত হয়ে, লেখকের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এবং ভাষার নিজস্ব একটা কেন্দ্রাভিমুখী টানে, মূল ভাষার সঙ্গে মিলিত হয়ে ভাষাকে সচল রাখে, গতিশীল ও ঋদ্ধ করে তোলে। আগে দুই বাংলা জুড়ে ছিল একটা বিরাট এলাকা এবং সামগ্রিক আদানপ্রদানের ফলে বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশের নানা শব্দ, নানা বাগধারা, বাকরীতি, সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করত। দেশভাগের সময় জীবনানন্দের আশঙ্কা ছিল, যেহেতু এলাকাটা বা এলাকা দুটো ছোট ছোট হয়ে যাবে সেহেতু ভাষার সে রকম সমৃদ্ধি ঘটবে না। কারণ আদানপ্রদানও কমে যাবে, সাহিত্যের পটভূমির ব্যাপ্তি কমে যাবে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত ভাষার ঋদ্ধি সর্বজনবিদিত। ঘটেছেও তাই। এখন বাংলাভাষার এভাবে শ্রীবৃদ্ধি সীমিত হয়ে গেছে। কিন্তু বাসমতীর উপাখ্যান উপন্যাসটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ভাষা ও ভাষার ব্যবহার কোথায় পৌঁছতে পারে। আমি ভাষাতাত্ত্বিক নই, কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা বলি। আমি কোনও দিন পুব বাংলায় / বাংলাদেশে যাইনি। বরাবর বীরভূমের একটি অজ পাড়াগাঁয় মানুষ। এতদিন পরে বাসমতীর উপাখ্যান পড়তে গিয়ে দেখলাম জীবনানন্দ এমন সব শব্দ ও শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন, এমন বাকরীতি ব্যবহার করেছেন যা বীরভূমে ব্যবহৃত হয়। আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম এই ধরনের শব্দগুলি। কতকগুলি শব্দের উল্লেখ করছি — খানিক, খটকা, ভিয়েন, তড়পে, জাবড়া, সেঁদিয়ে। চুনমুন করা, খটাশ, চ্যান চ্যান, গাবিয়ে যাওয়া, ঢ্যাব ঢ্যাব করা, গাদিয়ে দেওয়া, মাহিন্দার, বালাপোষ, কাছড়ে, নাকের ফুকো, কানি, তিড়বিড়, গজাল ইত্যাদি। রাঢ় বাংলার শব্দগুলি কেমন অনায়াসে মিশে গেছে, ফেউ লাইয়া, গোথলাইয়া, গোস্তাগুস্তি, নাপাট, জাইককর, হুলাগ ইত্যাদি পূর্ব বাংলার শব্দের সঙ্গে। “ঘেটিতে লাথি মাইরা পেরির মধ্যে ডাবাইব, না তকমা পরাইয়া ঢাকা খুলনার রাজা বাদশা বানাইব হালারা জানে” — ইত্যাদি শব্দবন্ধের পাশাপাশিই আছে ‘একটু কড়া চা খাওয়ার অভ্যাস প্রভাসবাবুর, ঠিক মতন দুধ মিশিয়ে, ফ্লেভারের চেয়েও পাতার রসের দিকে নজর রেখে বেশি’ বা একই সঙ্গে অবস্থান করছে জীবনানন্দীয় প্রকৃতি বর্ণনা, “চারদিকে পূর্ব বাংলার সরু সরু উঁচু উঁচু — অগাধ সুপুরিশ্রীর নীলচে বনানী। আরও গাছ আছে ঢের: জারুল, জামরুল, শিশু, শিরিষ, আম, মহানিম, ঝাউ — প্রকৃতির বিরাট পরিভাষা শক্তির মতো। রোদের ভেতর আলোকিত হয়ে কথা বলছে নদীগুলো — ঘুরে চলেছে নদীদের শাখা...” ইত্যাদি।

নিবন্ধটি শেষ করার আগে উল্লেখ করা উচিত জীবনানন্দের ডিটেলিং-এর ক্ষমতার। সম্ভবত সত্যজিৎও হার মানবেন। বর্ণনার সময় সমগ্র পরিবেশ, প্রকৃতি, বর্ণিত চরিত্রের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন এমনকী চরিত্রের মনোজগতের দ্রুত বিবর্তনের খুঁটিনাটিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। উদাহরণ দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম কারণ তাতে প্রায় সমগ্র পুস্তকটিকেই উল্লেখ করতে হয় উদ্ধৃতি হিসাবে।

বর্তমান নিবন্ধকার একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে বাসমতীর উপাখ্যান অন্যতম। □

গ্রন্থ সমালোচনা

তাঁর উপন্যাস একটা ক্লাসের, সকলের নয়

সুধীর চক্রবর্তী

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় আমার একজন প্রিয় লেখক ও কবি, একেবারে প্রথম থেকে অর্থাৎ যখন তিনি স্বনামে লিখতেন না, ছিলেন নমিতা মুখোপাধ্যায়, তখন থেকে। বরাবর কবিতাতেই তিনি দুরন্ত, কিন্তু একবার ‘কৃত্তিবাস’-এ তাঁর একটা গল্প পড়ে চমকে গিয়েছিলাম। শরৎ আমাদের চেয়ে বছর তিনেকের বড় (সেই হিসাবে সুনীল-শক্তিরও), কিন্তু তাঁর লেখক হিসাবে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। এখানে একটা খেদ, ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে রাখি, তিনি কোনও অজ্ঞাত কারণে আজ পর্যন্ত একটাও মান্য সাহিত্য পুরস্কার পাননি। সেটা হয়ত দলছুট বলে, কিংবা বোধহয় মুখফোড় মানুষ বলে, জানি না। সাহিত্য-পুরস্কার পাওয়া না-পাওয়া তো একজন স্রষ্টার বিচারের মাপকাঠি নয়, তবে অনুরাগী পাঠকের পক্ষে অনেকটাই আনন্দ বা শোচনার। যাই হোক, গত তিন চার দশকের একজন শক্তিমান মৌলিক কবি বলে তাঁর খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই, প্রতিষ্ঠানও তাঁর প্রতি বীতরাগ নয়, তবু....

কবিতাই লিখতেন শরৎ, হঠাৎ হঠাৎ হয়ত একটা দুটো গল্প লিখতেন। ‘আমাকে উপন্যাস লেখায় টানলেন দেশ-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ। সেটা ১৯৭২ সাল। আমার বয়েস ৪১। পাঁচ বছরের দিল্লি প্রবাস থেকে সবে কলকাতায় ফিরেছি।’ এই আত্মকথনের ধরতাই থেকে ঔপন্যাসিক শরৎকুমারকে আমরা বুঝে নেব তাঁর ‘উপন্যাস সমগ্র’ বোঝবার জন্য। অর্থাৎ নিজের টানে উপন্যাসের জগতে তিনি আসেননি, কিন্তু থেকে গেছেন — ১৯৭২ থেকে ১৯৯৩ সাল এই ১৯ বছরে লিখেছেন সাতটি উপন্যাস, যার কোনওটারই অবয়ব বেশ দেখনসই নয়, কৃশ চেহারার, স্মার্ট আর অন্তঃস্পন্দী। পুরীতে জন্ম শরতের, কাশীতে আর বিহারে লেখাপড়া শেখা, পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, উচ্চতর শিক্ষা বিদেশে, এহেন মানুষটি পুরো সময়ের লেখক হবার জন্য মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছেন। থাকেন দক্ষিণ কলকাতার এক উঁচু ফ্ল্যাটে (ফ্ল্যাটের জীবন তাঁর উপন্যাসে খুব বড় ভূমিকা নেয়, কবিতাতেও), দেখার চোখ প্রখর, বুদ্ধিমান, টিপিকাল নাগরিক লেখক। স্বভাবে আর লেখায় তাঁর জোলো ভাবালুতা নেই, সংস্কার কম, বাল্য-কৈশোরের প্রবাস এবং পরে বিদেশবাসের ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালিয়ানার নানা অনুপুঙ্খ তাঁকে বিব্রত করে না। প্রথম উপন্যাসের (‘সহবাস’) বিষয় নির্বাচনে আমাদের যে তিনি চমৎকৃত ও চমকিত করেছিলেন তার কারণও ওই জীবন-পটভূমির মুক্ত অভিজ্ঞতা। উপন্যাস সমগ্রের ‘প্রসঙ্গ-কথা’-য় শরৎকুমার তাঁর স্বাভাবিক রসবোধের টানে লিখেছেন — ‘রকমারি বিষয় নিয়ে লেখা সাতটি উপন্যাস একত্র করে এই ‘উপন্যাস সমগ্র’ সম্পাদিত হয়েছে। এতে একটা উপকার হল এই যে, আমার দুষ্প্রাপ্য সব বইগুলি পাঠক একখণ্ডে পেয়ে যাবেন।’ শরতের বই দুষ্প্রাপ্য এই অর্থে যে তার পুনর্মুদ্রণ হয় না বা হয়নি। ক'জনেরই বা হয়? সমরেশ বসুর মৃত্যুর পর তাঁর বই সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারি তাঁর গোটা পাঁচেক বই বাদে কোনওটারই (অন্তত পঁচিশ তিরিশটা) সংস্করণ হয়নি। তার মানে তিনি জনপ্রিয় কিন্তু বহুপঠিত ছিলেন না।

আলোচনার মুখপাতে এসব কথা টেনে আমি যেটা বলতে চাই তা হল, শরৎকুমারের উপন্যাস প্রথমত একজন কবির লেখা উপন্যাস নয়। তিনি বুঝে শুনে লিখেছেন, তাঁর কোনও ত্বরা ছিল না, বেশি লেখার দায় ছিল না, এমনকী ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখার সুযোগ পেয়েও মাত্র ছ' মাসের বেশি ‘কথা ছিল’ উপন্যাসের কিস্তি টানতে পারেননি। পারেননি, কারণ কাহিনীর ঝুরি-নামানো বটবৃক্ষ নন তিনি, যেন একমুখী তালগাছ।

একটু আগে লিখেছি যে, শরৎকুমার কবি কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলি কবির লেখা উপন্যাস নয়। তাতে আবেগবহুলতা বা শীতল ভাষা প্রয়োগ নেই, বেশ টানটান আঙ্গিক। নিজের গদ্যরচনা বিষয়ে তিনি নিজে লিখেছেন; ‘আবেগ, যা কবিতার আশ্রয়, গদ্যে তাকে এড়িয়ে চলতে চাই। শব্দ ব্যবহারে তাই হয়ত আমি একটু খুঁৎখুঁতে। ফলে, দ্রুতবেগে লেখা আমার হয়ে ওঠে না একেবারেই।’

অত্বর ভাবে লেখা তাঁর সাতখানি উপন্যাস পড়ে বেশ লাগল, এটা আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। তবে ভাললাগার তর তম আছেই। ‘সহবাস’ তো সাড়া-জাগানো উপন্যাস কিন্তু ‘রেলকামরার যাত্রীরা’ এবং ‘নাশপাতির গন্ধ’ লেখা দুটি আমাকে টানল বেশি। প্রথমটি শরতের বিহার-কাশী জীবনের আত্মজৈবনিক স্মৃতিতে মেদুর, যৌথ পরিবারে ভাঙাজোড়ার কথনে মায়াবি। ‘নাশপাতির গন্ধ’ একেবারে যৌবনের গল্প, তার কবোষ্ণ অনপনেয় আচরণে ঝকঝকে। ‘চার পাই ভাই ভাই’ জর্জ অরওয়েল অনুপ্রেরিত প্রতীকী রচনা, উপভোগ্য কিন্তু প্রতীকী আড়াল সরে গেলে তেমন আর উত্তেজক নয়। ‘সৌতি উবাচ, সঞ্জয় উবাচ’ কলকাতা নগর নিয়ে একটি নিরীক্ষাধর্মী রূপক রচনা — ভঙ্গিপ্রধান ও ইনটেলেকচুয়াল। সকলের পছন্দসই না-হওয়ারই কথা।

এটা ঠিক যে, একজন আধুনিক মানুষ তাঁর চারপাশের যাপিত নাগরিক জীবনের সঙ্গে অতীত যাপনের স্মৃতি মিশিয়ে লিখবেন তাঁর কাহিনী। শরৎ দেশবিদেশ ঘোরা মানুষ, হয়ত সেইজন্য নীতিবোধ নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই, যৌনতা বিষয়ে খোলামেলা, অবৈধ প্রেম ('অবৈধ' মানেই বা কি?) তাঁর কাছে তত অস্বাভাবিক নয়। তাঁর এসব ব্যক্তিগত চিন্তার ধরন উপন্যাসকটিতে খুঁজে নেওয়া যায়। নিঃসন্দেহে তিনি কাহিনীর পেছনে ছোটেননি, চরিত্রের আচরণ কিংবা অত্যাশ্চর্য মানবজীবন তাঁর লক্ষ্য। সদ্যস্নাতা বান্ধবীর শরীরে নাক ডুবিয়ে একজন যুবক নাশপাতির গন্ধ খোঁজে এবং পেয়ে যায়, মধ্যবয়সিনী বিধবা নারী খুঁজে নেয় নিরুপায় যৌনসঙ্গী কিন্তু ধরা পড়ে অপরাধবোধে আচ্ছন্ন না হয়ে বলে, 'আমি তো মানুষ'। অনবদ্য। শরতের লেখা আখ্যান সবই মানুষের কথায় মহিমময়। মানুষ আর তার ব্যাখ্যাহীন আচরণবাদ, মানুষ আর তার অন্তর্গোপন বেঁচে থাকা, মানুষ আর তার শরীরী ভাল লাগার অনিবার্য বিস্ফোরণ। শরৎ এইসব ধরতে চান।

ধরতে চান বলে কাহিনীর জাল ফেলেন, সেই জালে শামুক ঝিনুক যেমন ওঠে তেমনই উঠে আসে এমন দুয়েকটা চরিত্র যারা দুর্জ্ঞেয় হয়ত নয় কিন্তু অগতানুগতিক। 'কথা ছিল' উপন্যাসের দেবযানী এমন একজন অজানা নারীচরিত্র, জীবনাকাঙ্ক্ষা যাকে মজিয়ে রাখে। 'সহবাস' উপন্যাসে অভ্র-র জ্যেঠামশাই সুশোভন এক চমৎকার চরিত্র। কেউ জানত না অবিবাহিত মানুষটি নিষিদ্ধ পল্লীতে বীণাকে রেখেছিলেন। সেইখানে তাঁর মৃত্যু ঘটলে জানা গেল। অন্য এক উপন্যাসে এমন একটি চরিত্র আছে যাঁর নেশা হল বনসাই চর্চা। কিন্তু জীবনকে তো বনসাইয়ের মতো খর্ব করে রাখা যায় না, তা বিস্তারিত হয়ে পড়ে নানামুখে বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। এমন দুটি বহুদর্শী চরিত্র 'কথা ছিল' উপন্যাসের অভিজিত এবং 'নাশপাতির গন্ধ'-তে রাজর্ষি। দুজনেরই জীবনদৃষ্টি গড়ে ওঠে প্রতীচীর জীবন যাপনের ছন্দে। এ দুজনের মধ্যে রাজর্ষি একেবারে দেহসংস্কারমুক্ত। অভিজিতের বিদেশ-ঘোরা চোখে যদি বা বিস্ময়ের ঘোর থেকে থাকে (অমর আর গীতাকে দেখে) রাজর্ষি একেবারে নির্বিকার ও নির্বিচার। বন্ধু সিদ্ধার্থের স্ত্রী মমতাকে যথেচ্ছ উপভোগ করে অথচ আবার মোমকে পেতে চায় জীবনসঙ্গিনীরূপে। এসব পরিকল্পিত মেলামেশা আর কামনার জগতে কেমন সুন্দর বেঁচেবর্তে ভালবেসে রয়ে যায় উদ্দালকের মতো মোহনস্বভাবের যুবা। শরৎকুমারকে একচোখো বলা যাবে না। উচ্চাবচ জীবনকে তাঁর নিজস্ব আততিতে ধরতে চান তিনি।

'সহবাস' শরৎকুমারের প্রথম উপন্যাস, ১৯৭২ সালে লেখা, কিন্তু ১৯৯৮ সালেও ঝলমল করছে, তার কারণ এর থিমেটিক ভিন্নতা এবং মনোবিকলনের নিগূঢ় লক্ষ্য। দুই বন্ধু রণেন আর অভ্র, তাদের স্ত্রী সোমা আর উজ্জয়িনী। একদিন বেড়াতে গিয়ে ডাকবাংলোয় প্রায় খেলাচ্ছলে নিজেদের স্ত্রী বদল করে আলাদা আলাদা ঘরে নিশিযাপন করে। তার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। রণেন আর উজ্জয়িনী শারীরিকভাবে যুক্ত হয় কিন্তু অভ্র আর সোমার মাঝখানে এসে যায় শৈত্য। বিচিত্র মানবচরিত্র শরৎ চমৎকার ফুটিয়ে তোলেন কিন্তু 'সহবাস' উপন্যাসে শরীর শেষ কথা নয়, তার উপজীব্য মন এবং কিছু প্রশ্ন। তাঁর একটি চরিত্র বলে: 'দরকার ফুরোতেই আমাদের বহুবিবাহ প্রথা বর্জিত হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য, পৃথিবীর কোথাও, এক নারীর সঙ্গে একজন পুরুষকে চিরদিনের মতো বেঁধে দিয়ে বিবাহ-নামক যে অদ্ভুত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, কোনও এক সময়, তার পরিবর্তন হয়নি। একটা পুরনো অভ্যেস আমরা ছাড়তে পারছি না। অথচ, জীবনের অন্য সব দিক এত বদলে গেছে।.... তোমার কি মনে হয় না, ফুলের মালা দিয়ে বাঁধা নরনারী আর আমরণ এক থাকতে পারছে না?'

শরৎকুমারের সবকটি উপন্যাস এই ধরনের প্রশ্নময়। 'চার পাই ভাই ভাই' কিংবা 'সৌতি উবাচ, সঞ্জয় উবাচ' উপন্যাসে হয়ত প্রশ্ন এত প্রত্যক্ষ নয়, প্রচ্ছন্ন। কিন্তু অন্য উপন্যাসগুলির নানা চরিত্র নানা প্রশ্ন তুলেছে। তার কারণ এসব উপন্যাসীয় আখ্যানের অন্তবর্তী হয়ে আছে লেখকের যাপিত জীবনের সংশয়, সম সময়ের অস্থিরতা, প্রচলিত মূল্যবোধ বিষয়ে অনাসক্তি। আধুনিক জীবনের দোটানা, প্রেমহীনতা, দ্রুতগামী সমাজ আর ব্যক্তির স্ববিরোধ লেখক এতটাই চাক্ষুষ করেছেন যে তার থেকে পলায়নপরতা তাঁর ধাতে নেই। বরং সেটাই তাঁর অনুধাবনের বিষয়। অথচ আশ্চর্য, তাঁর উপন্যাসে দুজন নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি আছেন, নেপথ্যে আছে পাগলের চিৎকার। সাম্প্রতিকের তাপ কিংবা বর্ণবৈষম্যের চাপ তাঁরা নিতে পারেননি। অথচ এই সব চাপ নিতে পারার যে আধুনিকতা তা-ও রয়েছে তাঁর উপন্যাসে। যেমন 'আশ্রয়' উপন্যাসের কল্যাণ। স্ত্রী গৌরী চলে এসেছে রবির কাছে, মাঝে মাঝে কল্যাণও তাদের কাছে গিয়ে থাকে। তার কোনও রকম ইনহিবিশ্যান নেই, তাই 'গৌরী চলে এসেছে, কল্যাণ তা নিয়ে ক্ষুব্ধ নয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একটা তৈরি করা জিনিস, কী সহজে ছিঁড়ে ফেলা যায়। লোকে অকারণ কোর্ট কাছারি নালিশ-পুলিশ করে নাটক করে, যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে মাটিতে। কিছু না। তোমার যেখানে ভাল লাগে থাক, সুখে থাক। নিজের জীবন তোমার নিজের হাতে।'

এমন সরল সমাধান সকলের পক্ষে করা কঠিন কেননা আমাদের সমাজ এতটা এগোয়নি, তা ছাড়া অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বা সচ্ছলতার প্রশ্নটি মৌলিক। শরৎকুমারের সৃষ্ট বেশির ভাগ চরিত্র যে-সমাজের ও মানস সমুন্নতির স্তরে থাকে তা মধ্যবিত্ত জীবনদর্শনের সঙ্গে মেলে না। সেই অর্থে তাঁর উপন্যাস একটা ক্লাসের, সকলের নয়। শরতের ঝোঁক এই অনাবিল খোলামেলা চরিত্রগুলিকে মেলে ধরা কিন্তু পাঠকের দিক থেকে প্রতিপ্রশ্ন

উঠবেই যে, এই মুক্ত জীবন — যার আসা-যাওয়ার দুই দরজা খোলা, তা কি স্বস্তিকর? শান্তিদায়ী? অন্তত এই টানাপোড়েনের দোলাচল 'নাশপাতির গন্ধ'-র মোমকে করে তোলে মনোরোগী। সেই রোগের অবসানে তার স্বচ্ছ পুনর্বাসন সকলের ভাল লাগবে। আমার নিজস্ব পক্ষপাত অবশ্য 'রেলকামরার যাত্রীরা' উপন্যাসটির প্রতি। বেশ একটা ছড়ানো জীবনের ছন্দ, পারিবারিকতার ভালমন্দ মেশানো। মানুষগুলো তাদের প্রীতি, বিবাদ, হিংসা, মমতা নিয়ে ভারি কাছের। 'পুরনো বাক্স ঘাঁটতে ঘাঁটতে কত মূল্যবান সম্পত্তি' বেরিয়ে পড়ার মতো শরৎকুমারের বর্তমান জীবনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে তাঁর বাল্য-কৈশোরের যাপিত জীবন। তার মোহ বড্ড মায়াবি আর রক্তগত। □

উপন্যাস সমগ্র — শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় / আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯ / ১৫০.০০

মহাভারতের মহারণ্যে — নতুন আলোকপাত

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

"আমি সংস্কৃত জানি না। অতএব মূলগ্রন্থ পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তদ্ব্যতীত, তুলনামূলক ব্যাখ্যার জন্য অন্য কোনও পৌরাণিক পুঁথি বা আধুনিক নথিও আমি ঘাঁটিনি। আমার নির্ভর শুধুমাত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলায় অনূদিত মহাভারত। তাঁর অনুবাদই আমি প্রামাণ্য বলে মেনেছি, কারণ সেই বিশাল মনীষীর পাণ্ডিত্য সংশয় করার মতো স্পর্ধা আমার নেই। রাজশেখর বসুর সারানুবাদ এবং ভূমিকায় তাঁর নিজস্ব পক্ষপাত প্রতিফলিত দেখেছি। অনেক ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন এবং রাজশেখর বসুর ভাষা-শব্দ ব্যবহার করেছি উদ্ধৃতির মধ্যে, কিন্তু আমার সংশয় আছে কিছু উদ্ধৃতি সঠিকভাবে উদ্ধৃত হয়নি।" (প্রাক্‌কথন — লেখিকা)

বোঝা গেল লেখিকা কালীপ্রসন্ন সিংহকেই নির্ভর করেছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ তো আলোচ্য মহাভারতটি অনুবাদ করেননি। আসমুদ্রহিমাচল থেকে প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের আনিয়ে তাঁদের দিয়েই অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। ভোলানাথ চন্দ্র প্রণীত, কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনীতে সেই সব পণ্ডিতদের ছবিও আছে। তিনি শুধু এই কাজে অর্থব্যয় করেছিলেন। তাঁর সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য এমন কিছু ছিল না যাতে তাঁকে বিশাল মনীষী বলা যেতে পারে। শুধু সম্পাদক হিসাবেই তাঁর নাম ব্যবহৃত হয়েছিল।

তবে আলোচ্য গ্রন্থটি অসামান্য এই কারণে যে এই প্রথম তিনি দক্ষ শল্যবিদের নিপুণতায় মহাভারতের অসঙ্গতিগুলি অভিনন্দনযোগ্য ভাষাশৈলীতে আমাদের দেখিয়ে দিলেন। আমরা যে একেবারেই আগে লক্ষ করিনি তা নয়, অগ্নি থেকে দ্রৌপদীর জন্ম, মৃত ব্যুষিতাশ্বের শবের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে পত্নী ভদ্রার সাত-সাতটি প্রসব, কুন্তীর আগে গর্ভাধানের ঈর্ষায় গান্ধারীর নিজের ভ্রূণ ছিন্ন করা এবং পরে ঘৃতসিঞ্চনে শতপুত্র এবং এক কন্যার জন্ম — ইত্যাকার আজগুবি বিষয়গুলি স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবই যখন লিখে গেছেন তখন কি আর করা যাবে! নিজের কাণ্ডকারখানা নিজে লিখলে সম্ভবত এ-রকমই হয়। তবে আমরা শুনেছি বেদব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের মুখে। তিনি "জন্মেজয়ের সর্পসত্রকালে তাহা কীর্তন করিয়াছিলেন"। কীর্তনকালে বৈশম্পায়ন কিছু আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে থাকলেও থাকতে পারেন!

তবে মহাভারত ভরতবংশের ইতিহাস হলেও প্রকৃতপক্ষে যে সত্যবতী-দ্বৈপায়ন বংশেরই ইতিহাস, সম্ভবত এই লেখিকাই প্রথম অবশ্যমান্য যুক্তি-ব্যবচ্ছেদে তা আমাদের দেখিয়ে দিলেন। মূল লেখক দ্বৈপায়ন অবশ্যই মাত্রাতিরিক্ত স্বাধীনতা নিয়েছেন। তস্য মাতা সত্যবতীও অসংখ্যবার মিথ্যার রক্ষিতা হয়েছেন। দশ দিনের যুদ্ধ যে অগণন পাতার মহাভারতকথার জন্ম দেবে, তার তাৎপর্য যুক্তিগ্রাহ্য হোক বা না হোক, এটাই যে ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম ম্যাগনাম-ওপাস — এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কোনও যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ হতে পারে না। সম্ভবত সে কারণেই এই অধর্ম-যুদ্ধকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার বিবেকী প্রচেষ্টায় এল গীতা-উপদেশ। এই গীতাভাষ্য না থাকলেও মহাভারতের কোনও ক্ষতি হত না, এই অংশকে প্রক্ষিপ্ত ও আরোপিত বলে অনেকের মনে হতে পারে। যতই কৃষ্ণকথিত উপদেশ হোক, লিখেছেন তো সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! সত্যিই কি তিনি লিখেছিলেন? না অন্য কেউ পরে এই সংযোজন করেছেন! রামায়ন যেমন বিভিন্ন যুগে নানা ঘটনার সংযোজন ও বর্জনে আমাদের কাছে এসেছে, মহাভারতও তাই। সবই তো স্মৃতিধার্য গণেশরচনা। তা ছাড়া মহাভারতের কৃষ্ণ কি মথুরা নিবাসী রমণকুশল কৃষ্ণ? একই নবদুর্বাদলশ্যাম? বহু পণ্ডিত তাতেও সংশয় প্রকাশ করেছেন। (লেখিকা চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে "যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা হয়েছে, তা বড়ই বিভ্রান্তিকর। চার দশকেরও অধিক কাল ধরে নিবিষ্টচিত্তে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পূর্ণ মহাভারত পাঠ করে সাহিত্য হিসাবে তা যতই মনোমুগ্ধকর বলে মনে করেছি, ততোটাই উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করেছি ধর্মাধর্মের অবিচার দেখে। যুদ্ধ যে ভাবে আগত হল, তখন যে সব ঘটনা ঘটেছে, যুদ্ধের পূর্বে যে সব ঘটনা ঘটেছে, যুদ্ধের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে, সেই সব ঘটনার মধ্যে যা নিহিত আছে অথচ

বর্ণিত নেই, আবার যা সরাসরি বর্ণিত, সেই সব ঘটনা যদি স্তরে স্তরে সাজিয়ে ক্রমান্বয়ে বর্ণনা সমেত পাঠকের নিকটে তুলে ধরি, বিচক্ষণ এবং সংস্কারহীন বিবেচনার দ্বারা বিশ্লেষণ করলে তারাও আমার বিচারকে অগ্রাহ্য করবেন এমন মনে হয় না। (পৃষ্ঠা ৩৪)"

বর্তমান আলোচকের কাছে লেখিকার এই বিশ্লেষণপ্রণালী খুবই উদ্দীপক। কেননা তার রচনাও এক অনবদ্য সাহিত্য প্রণালী। কোন তথ্য ভুল বা সঠিক সে বিচার কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। প্রচলিত চেনা তথ্যের ব্যত্যয় অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তা এক গভীর প্রত্যয়ের হাত ধরে এসেছে। সেই প্রত্যয়ের নাম যুক্তি। তবে বুদ্ধিতে যেমন সবকিছুর ব্যাখ্যা চলে না, যুক্তিও কি সব আখ্যান ব্যাখ্যা করে শেষ কথা বলার অধিকার পাবে!

এই বইয়ে কালী সিংহী সম্পাদিত মহাভারতের কিছু কিছু উদ্ধৃতিও দোলাচলগ্রস্ত করে আমাদের। তিনি দুর্যোধনকে গরিমাযুক্ত করতে গিয়ে, বিদুরকে 'জম্বুক' অর্থাৎ শৃগাল সম্বোধন করেছেন! কার্ভের গবেষণার পর আমরা প্রায় মেনে নিয়েছি যুধিষ্ঠির বিদুরেরই পুত্র। সুতরাং পুত্রের প্রতি বা পাণ্ডবদের প্রতি বিদুরের তো বিশেষ পক্ষপাত থাকাই স্বাভাবিক। যেমন ব্যাসদেব তাঁর নিজের উৎপাদিত অ-ক্ষেত্রজ দাসীপুত্রকে প্রায় সারা মহাভারতেই মহাত্মা বলে যে সম্বোধন করেছেন তাতে আমাদের আর কি-ই বা করার থাকে। পুত্রের প্রতি পিতার এই পক্ষপাতই তো স্বাভাবিক। দুর্যোধনের জন্ম এবং তাকে কেন্দ্র করে বিদুরের যে অমূলক অসূয়া, তার বর্ণনা কিন্তু কালী সিংহীর মহাভারত থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। মূল মহাভারত থেকেই দুর্যোধনের জন্মকালীন বৃত্তান্ত তুলে দিচ্ছি: আদিপর্ব ১৫৪ পৃষ্ঠা — (কালীপ্রসন্ন সিংহ — বসুমতী সংস্করণ)

দুর্যোধনের জন্মকালীন অশুভ লক্ষণ

"অনন্তর দুই বৎসর অতীত হইলে প্রথমতঃ দুর্যোধন জন্মিল। ঐ দিবসেই মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেনের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির জন্মানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন। দুরাত্মা দুর্যোধন জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল; গর্দ্দভ, গৃধ্র, গোমায়ু, বায়স প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক জন্তুগণ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ানকস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। সেই সব বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল; দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সাতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম, বিদুর, অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ ও কুরুগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন....."

সুতরাং একা বিদুর দুর্যোধনের জন্মকালীন 'গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশধ্বনি' শ্রবণ করেননি, বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ভীষ্মের সঙ্গে বিদুরও সেই আওয়াজ শুনেছিলেন। আলাদাভাবে একলা শোনেননি। তা ছাড়া উপরের উক্তি তো স্বয়ং মহাভারত রচয়িতার, তার জন্য একা বিদুরকে দায়ী করা কেন? পরে ব্রাহ্মণগণ ও অবশ্যই বিদুর, বলেছিলেন, "আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য"!

লেখিকা নিজেই বলেছেন, জরায়ু ছিন্ন মাংসপিণ্ডর গালগল্প বাদ দিয়েই বলেছেন, দুর্যোধনের পিতা অনির্ণেয়। যদি তাই হয় তবে দুর্যোধন তো আর যাই হোক ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত নয়। সুতরাং জন্মসূত্র-অনিশ্চিত দুর্যোধনের প্রতি বিদুরের দ্বেষ থাকাই কি স্বাভাবিক নয়? যদিও লেখিকা অতি সত্যই বলেছেন "প্রাচীন ইতিহাস অনেক স্থলেই রূপকথার সহযোগে সম্পাদিত", তবে মহাভারতকথার সব কিছুই রূপকথা হয়ত নয়, রূপকথার ছলে কিছু অপরূপ কথাও আছে। সব তথ্যকে তত্ত্ব হিসাবে না ধরেও বলা যায় — যুদ্ধ বলি বা চরিত্রচিত্রণই বলি, কোনও একটা সংঘটনের ছায়া তো ছিলই। কয়লার বিপুল কালিমার মধ্যে যে এক কণা হীরকউপস্থিতি, তার মূল্য থাকবে না!

আমি ইচ্ছে করেই গ্রন্থটির সমস্ত বক্তব্যের ব্যাপক আলোচনা করছি না। কেননা শুরু থেকেই লেখিকা আমাকে এক আভূমিনত কৃতজ্ঞতায় আক্রান্ত করেছেন। যদি মহাভারতের পূর্বাপর ভুলে যেতে পারি তবে এক মহান সাহিত্যকর্ম বলতে আমার বিন্দু দ্বিধা নেই। কী ঐশ্বর্যময় ভাষা! এ-রকম ভাষা পাঠও এক মুগ্ধ অভিজ্ঞতা। আমার নিজের সংস্কৃতভাষাকৃতি একেবারেই অনুল্লেখ্য। তবে জানি বারবার উচ্চারণে অনেক সময় ভুলও সত্য বলে প্রতিভাত হয়। যা সময়ের পরম্পরাক্রমে জ্ঞাত তাই যে মান্য করা উচিত নয়, এই গ্রন্থ সে শিক্ষাই আমাদের দেয়। যা নেই মহাভারতে তা নেই ভারতে — এটা শুধু কথার কথা! বরং বলা যায় যা নেই ভারতে তা কেন থাকবে মহাভারতে?

আসলে মহাভারতই ভারতীয় সাহিত্যের সূতিকাগার। ধর্মের উপলক্ষ্য ছাড়া কি গদ্য কি পদ্য কোনও কিছুই তো সেকালে রচিত হত না। দেবীর আদেশ ছাড়া প্রাচীন কাব্যের কবিদের নাকি রচনার স্ফূর্তি ঘটত না। সত্যবতীর আদেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের খুশিতে, গণেশের বকলমে যা আমরা যুগের পর যুগে পড়েই চলেছি, তার মধ্যে ধর্মউপাদানের চেয়ে সাহিত্যসংক্রমই সম্ভবত আমরা লক্ষ করেছি বেশি। আসলে মানুষের সুখ দুঃখ, ক্রোধ, যৌনমিলন, ক্ষমতালিপ্সা, রাজনীতি, অনীতি — সবই সৃষ্টির আদি থেকেই ছায়ার মতো মানুষকে অনুসরণ করে চলেছে। অতীতে তো করেইছে, বর্তমানেও করে, ভবিষ্যতেও করবে। তাই সাহিত্যের অন্দরমহলে পৌঁছাবার আগে আমাদের মহাভারতের দরজায় এসে দাঁড়াতেই হবে। প্রতিভা বসু সাহিত্যের অন্দরমহলে তো বহু আগেই অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পৌঁছে গেছেন। তাই তার দৃষ্টি যতটা সাহিত্যিকের ততটা হয়ত ঐতিহাসিকের নয়। ভাগ্যিস নয়! তথ্য বা তত্ত্ব কি সব সময় আমাদের সত্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

'মহাভারতের মহারণ্যে' একটি উঁচুদরের সাহিত্যকর্ম। সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও লেখিকার যুক্তি একচুলও জায়গা ছেড়ে দেয়নি আবেগকে। প্রকাশককেও এই সাহসী প্রকাশনার জন্য ধন্যবাদ জানাতেই হয়। এই বই-এর ব্যাপক প্রচার প্রার্থনা করি। □

মহাভারতের মহারণ্যে — প্রতিভা বসু / বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা–৯ / ৬০.০০

সংখ্যালঘুর মধ্যে সংখ্যালঘু

ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অন্ধদের দেশে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কী দশা হতে পারে, তা নিয়ে এইচ. জি. ওয়েলস-এর একটি বিখ্যাত গল্প আছে। আবার ইংরেজিতে একটা প্রবাদও আছে, অন্ধের দেশে যার একটি চোখ সে-ই রাজা। এক চোখ থাকলে রাজা, দু' চোখ থাকলে বিপদ। ইস্কুল কলেজে পড়ানোয় যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা জানেন, আপনার ক্লাসে একশোজনের মধ্যে পাঁচজন যদি এমন হয় যে পাঠ্যবিষয় তাদের বিদ্যা-বুদ্ধির নাগালের বাইরে, তা হলে সেই পাঁচজন অধ্যাপকের দৃষ্টির আড়ালে থাকবার চেষ্টা করে, কিংবা পালাবার পথ খোঁজে। পক্ষান্তরে, অবস্থাটা সে-রকম এলিটিস্ট দোষযুক্ত না হয়ে যদি তার বিপরীত হয়, অর্থাৎ একশোজনের মধ্যে পঁচানব্বই জনই হয় (দোষ যারই হোক) সেই ক্লাসে বসবার অনুপযুক্ত তা হলে বেচারি অধ্যাপক সেখানে হয়ে ওঠেন হাসির পাত্র, আর সেই পাঁচজন ছাত্র মুখ নিচু করে বসে থাকে, যেন তারা চুরির দায়ে ধরা পড়েছে।

আমাদের সমাজে মুক্ত মনের মানুষদের অবস্থা অতখানি করুণ হওয়ার কথা ছিল না। শুনেছি, বিদ্যা হল তাই, যা মুক্ত করে। দেশের বেশির ভাগ মানুষ আজও নিরক্ষর বটে, কিন্তু শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়, একটু উচ্চশিক্ষিত, বিবিধ বিদ্যায় ভূষিত ব্যক্তিগণ সমাজে গণ্যমান্য, প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী। বিদ্বজ্জনের সভা-সমিতিতে, সেমিনারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গিয়ে পড়লে মনে হয়, এঁরা রয়েছেন, এত প্রবলভাবে রয়েছেন, আমাদের ভাবনা কী? অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, প্রগতির পথে যত কাঁটা, সব তো দূর হল বলে।

তা হলে সংকট কীসের? আবদুর রউফ বলেছেন, "বিচ্ছিন্নতা মাঝে মাঝেই যেন অনিবার্য হয়ে পড়ে।" কারণ কী? বলেছেন, "এর কারণ বোধ করি আমাদের যুক্তিবাদী মনোভাব। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার ফলে এবং যুগপ্রভাবে আমাদের মন অন্ধভাবে কিছুই .মানতে চায় না।" (মুক্তমনের সংকট) তা হলে সভা-সমিতিতে, সেমিনারে যাঁদের দেখি, যাঁদের কথা শুনি তাঁরাও কি আবদুর রউফের মতো বিচ্ছিন্ন? কই, এমন কথা তো তাঁদের বড় একটা বলতে শুনি না? বরং তাঁদের ভাব-গতিক দেখে মনে হয়, তাঁরাই সমাজ, তাঁরাই সংসার। আসলে, পাঁচ জনের একটি গোষ্ঠীও ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে ভাবতে পারে, তারাই সব, তাদের ভাবনাই একমাত্র ভাবনা, তাদের কথাই একমাত্র কথা। আবদুর রউফ নিজের সমাজ, সংসারকে অস্বীকার করতে পারেননি, "যাদের মধ্যে জন্মেছি তাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে বিশেষ কোনও গোষ্ঠী বা দলভুক্ত হওয়ার বাসনা আমাদের নেই।" তবু বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তার কারণ, তিনি নাস্তিক নন বটে, ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা তিনি গর্বের বিষয় বলে জানেন, কিন্তু তাই বলে দেড় হাজার বছর আগে আরব দেশে যে-সব বিধি-বিধান প্রবর্তিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলতে হবে পৃথিবীর সর্বত্র, তা নিয়ে নতুন করে কোনও বিচার-বিবেচনার চেষ্টা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলেই বিবেচিত হবে চিরকাল, এই যাদের বিশ্বাস তাদের দলেও ভিড়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই ধারণা যে কতটা অবাস্তব হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন। গ্রিনল্যান্ডে ছ'মাস দিন ছ'মাস রাত্রি। সেখানে রমজানের উপবাসের নিয়ম কী হবে? তবু, (অবশ্য গ্রিনল্যান্ডের কী অবস্থা আমি জানি না) আজকের পৃথিবীতে ইসলাম বহুদূর বিস্তৃত, নানা রকম ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। তার মানে, অদলবদল চলছেই। যে ধর্ম সজীব, সে কখনওই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

তবু আবদুর রউফ বলছেন, "আমরা বিচ্ছিন্ন বোধ করি।" নিজের সমাজের সঙ্গে "আত্মিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলা সম্ভব হচ্ছে না।" কারণ, তিনি নিজেই বলেছেন,' পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ধর্মেই এমন কিছু মৌলিক বিষয় আছে, যেগুলির প্রতি নিঃশর্ত আস্থা এবং অন্ধ বিশ্বাস জ্ঞাপন না করলে প্রকৃত ধার্মিক হওয়া যায় না। সেই কারণেই বোধ হয়, খাঁটি মুসলমানগণ আমাদের মতো সংশয়বাদী মানুষদের আপন বলে গ্রহণ করতে চান না, যদিও জন্ম আমাদের তাঁদের ঘরেই।" তবু সমাজে তাঁদের পরিচয় মুসলমান বলে। তিনি বলেছেন, তাঁদের মতো "সংশয়বাদী কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচরণের ব্যাপারে উদাসীন লোকদের জন্যে আলাদা কোনও স্বীকৃত সমাজ নেই।"

কী ধরনের আলাদা স্বীকৃত সমাজ আবদুর রউফ চান, সেটা পরিষ্কার নয়, তবে ধর্মীয় ব্যাপারে যাঁদের মনোভাব ওঁরই মতো, তাঁরা মুসলমানই হন, হিন্দুই হন, আর যাই হন, তাঁদের মধ্যে একটা আত্মীয়তা অবশ্যই গড়ে উঠতে পারত এবং তা

হলে ওই যে বিচ্ছিন্নতা বোধ তারও নিরসন হতে পারত বহু ক্ষেত্রে। মানুষ যে পরিবারে জন্মায়, যে পরিবেশে বড় হয়, ক্রমে তাকে ছাড়িয়ে ওঠে, নিজের গণ্ডির বাইরে সে বন্ধু খুঁজে পায়, আত্মীয় খুঁজে পায়। এই পথে মনের মুক্তি আপনি আসে। রউফ যে বলেছেন, "স্বাধীন যুক্তিবাদী চিন্তার একটা ধারা বরাবর মুসলমানদের মধ্যে ছিল।" সে ধারা শুকিয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করা কঠিন।' হয়ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, অসংখ্য ছোট ছোট স্রোতে আলাদা আলাদা বইছে। তারা কেন পরস্পরকে চিনতে পারবে না? পরস্পরের কাছে আসতে পারবে না?

আবদুর রউফ ঠিকই বলেছেন। তালাকপ্রাপ্তা মুসলমান মেয়েদের একটা কিছু সুরাহা করার জন্য দরকার হলে শরিয়তের নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করা হোক, তাঁদের এই মনোভাবের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আমাদের এই ভাবনাকে মূল্য দেওয়া হয়নি। ভোটের কথা মাথায় রেখে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের মতামতকেই গুরুত্ব দিয়েছেন যাঁরা অন্যায়ভাবে তালাকপ্রাপ্তা নারীর দুর্দশার কোনও প্রতিকারই চান না।" এখনও যদি কেউ এই আশায় বুক বেঁধে থাকে যে "দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সর্বাগ্রে নিজেদের ভাল ছাড়া অন্য কিছু চাইবেন, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া অন্য কোনও দিকে আগে তাকাবেন, তা হলে তার মোহভঙ্গ আর কোনও দিনই হবে কিনা সন্দেহ।" সরকার পক্ষের রাজনৈতিক নেতার প্রথম কর্তব্য ক্ষমতা বজায় রাখা, বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক নেতার প্রথম কর্তব্য ক্ষমতা হাতে পাওয়ার চেষ্টা করা। তবু, (এর পিছনে কী কী ঐতিহাসিক কারণ আছে জানি না) আমাদের এই পোড়া দেশে, এবং সবচাইতে বেশি পশ্চিমবঙ্গে, রাজনৈতিক নেতাদের যত কদর, সব ব্যাপারে তাদের উপর যত নির্ভরতা, তত আর অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

"প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষতার অনুষ্ঠাননির্ভর অবয়ব" শীর্ষক নিবন্ধে রউফ রাজনৈতিক নেতাদের আচার-আচরণে ধর্মনিরপেক্ষতার অভাব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আসলে ধর্মের ব্যাপারে তাঁরা নিরপেক্ষই বটে, যখন যা প্রয়োজন তখন তাই করেন। তিরুপতির মন্দিরে জাঁক-জমক করে সাঙ্গোপাঙ্গো-অনুচর সমভিব্যাহারে পুজোও দেন, আবার সাড়ম্বরে ইফতার পার্টিরও আয়োজন করেন। সর্ব ধর্মে সমভাব। লোভ পুণ্যের নয়, ভোটের। কাজেই সঙ্কীর্ণ ধর্মবিশ্বাসের বাধা কাটিয়ে আধুনিক মানুষজনকে পরস্পরের কাছে আসতে হবে, নিজেদেরই তাগিদে, নিজেদেরই উদ্যোগে। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক নেতা চাইবেন দলবদ্ধ ভোট, যার পরিণতি মুক্তচিন্তা, মুক্তমন।

আবদুর রউফ অনেক প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন, কিন্তু দলীয় রাজনীতি যে মানসিক মুক্তির পথে কত বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কথা একটা ধ্রুবপদের মতো সারাক্ষণ বেজে গেছে এই চিন্তাভারাক্রান্ত পুস্তকে। চিন্তার বলীরেখা যেন মনে হয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর কপালে। এবং সে চিন্তা প্রধানত জাতীয় জীবনে বিচ্ছিন্নতা এবং তাতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অবদান নিয়ে। এই বই পড়ার পর এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না যে দলিত-সমস্যাই হোক, উত্তরপূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলনই হোক, আর কাশ্মীর-সমস্যাই হোক, সব কিছুরই সমাধান সম্ভব, যদি রাজনৈতিক নেতাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বুদ্ধিমান, হৃদয়বান, আধুনিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ নিজেরাই এগিয়ে আসেন জাতীয় জীবনের পুরোভাগে।

তার সঙ্গে আর যা ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে, সেটা হল পুরনো মানসিক অভ্যাস, মানসিক জড়তা। এই জিনিসটাই মানুষকে ছোট ছোট গণ্ডির ভিতর বন্দি করে ফেলে। এরই ফলে হিন্দু মুসলমানকে মুসলমান হিসাবে দেখে, তারই মতো একজন মানুষ হিসাবে নয়, মুসলমানও হিন্দুকে তাই। এই অভ্যাসের দাসত্ব মনে হয় যেন আরও শক্ত হয়ে চেপে বসেছে আমাদের মনে।

সংখ্যালঘুদের সমস্যা, দলিতদের সমস্যা, খণ্ডজাতীয়তাবাদের সমস্যা এবং প্রতিবেশী নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়নমার ও আফগানিস্তানের সমস্যা নানা প্রবন্ধে আলাদা আলাদা করে বুঝবার চেষ্টা করেছেন আবদুর রউফ, বিশেষ করে আমাদের দেশের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতার মনোভাবের যে সমস্যা সেটা বিশেষভাবে তিনি অনুধাবন করতে চেয়েছেন। তাঁর সব চিন্তাই যে সকলের পছন্দ হবে তা নয়। কাশ্মীর সম্পর্কে তিনি যা চেয়েছেন, পাক কাশ্মীরিরও বলেছেন তাকে, অর্থাৎ কাশ্মীরিদের নিজস্ব স্বতন্ত্র জাতিচেতনাকে মর্যাদাদান, এ বাজারে তার যে আদৌ কোনও খরিদ্দার মিলবে, তার সম্ভাবনা কম। রাজনীতিকদের কথা ছেড়েই দিন, তাঁদের লাভ-লোকসানের হিসাব তো চব্বিশঘণ্টার গণ্ডি পেরোয় না, আমরা যারা সাধারণ লোক, এবং আমাদের যারা নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ, লেখক, অধ্যাপক ইত্যাদি, তাঁরা কেউই এসব কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে প্রস্তুত নন। কাজেই যা হবার তাই হয়েছে, একই বৃত্তে আমরা ঘুরপাক খেয়ে চলেছি।

আবদুর রউফ নতুন করে চিন্তা করেন, এবং সেসব চিন্তা সহজ, স্বচ্ছ ভাষায়, পরিষ্কার করে, নিজে উত্তেজিত না হয়ে এবং পাঠককে উত্তেজিত করবার চেষ্টা না করে, সব রকম কায়দা-কৌশল পরিহার করে ব্যক্ত করতে পারেন। এইখানেই তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য, এইখানেই তাঁর মূল্য। □

মুক্তমনের সংকট— আবদুর রউফ / র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা-৯ / ৫০.০০

তন্ত্রের তন্তুবয়ন

রত্না বসু

শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তির 'ডিস্‌কোর্সেস অন্ তন্ত্র' গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে আনন্দমার্গ-মতে তন্ত্র সাধনার তাৎপর্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীআনন্দমূর্তির বিভিন্ন ছোট-বড় বক্তৃতার অনুলিখন। দুই-খণ্ডে প্রকাশিত এই বক্তৃতামালায় তন্ত্র-সাধনার স্বরূপ, লক্ষ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে; সেইসঙ্গে আছে তন্ত্র-সাধনার সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধান ও বর্তমান সমাজের আর্থসামাজিক সুবিন্যাস ও ব্যক্তির মনোমুক্তির এবং আত্মিক উত্তরণের পথনির্দেশ। গ্রন্থবিচারের গভীরে প্রবেশ করার আগে তন্ত্রমার্গ ও তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক কথা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হওয়া প্রয়োজন।

পাণিনি-ব্যাকরণের ধাতুপাঠে 'তন্' (তনু) ধাতুর অর্থ বিস্তার (তনু বিস্তারে, ধাতু পাঠ ৮.১); তন্-ধাতুর সঙ্গে ষ্ট্রন্ এই উণাদি প্রত্যয় যোগ করে 'তন্ত্র'-শব্দ নিষ্পন্ন। তন্ত্রশাস্ত্রের মূল হল বিভিন্ন আগম-গ্রন্থ। এই আগম-গ্রন্থ বা শাস্ত্রকে বেদের মতোই অনাদি মনে করা হয় এবং তার মর্যাদা শ্রুতিঃ সমকক্ষ — 'দ্বিবিধা শ্রুতিঃ, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ' এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তন্ত্রের সাধনমার্গে দুটি পথ — কঠিন বা 'গুহ্য' এবং 'সহজ' বা লোকাতত। তন্ত্রের বিভিন্ন ধারার মধ্যে শৈব-সম্প্রদায় ও তার নানা বিভাগ, শাক্ত সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব মৌলিক তত্ত্বগ্রন্থ এবং দর্শনগ্রন্থ রয়েছে। তদনুসারে আত্মমুক্তির সাধনা ও স্বরূপেরও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। তান্ত্রিক সাধনার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি লক্ষ করলে বোঝা যায়, তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক মার্গে বিভিন্ন দশা বা স্তর প্রাপ্ত হবার উপায় স্বরূপ। মনে রাখতে হবে বর্তমান হিন্দুদের নিত্যকার সন্ধ্যাবন্দন, দেবপূজা প্রভৃতির মধ্যেও তন্ত্র ও মন্ত্র দুই-ই আছে। অন্যদিকে তন্ত্রে স্বীকৃত দেবতাসমূহও বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে স্থান লাভ করেছেন। যে-কোনও পুণ্য-অনুষ্ঠানে 'মাতৃকাপূজা' অনুষ্ঠান করে ছয় স্থূলমাতৃকার পূজা এর বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রতিদিন অনুষ্ঠিত 'ষোড়শোপচার পূজা' প্রকৃতপক্ষে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রাবলি ও পদ্ধতিসমূহের এক চমৎকার সমন্বয়।

শৈবতন্ত্র ও দর্শনের পীঠস্থান কাশ্মীর। শৈবতন্ত্রের তিনটি মূল ধারা — **কুল, ক্রম** এবং **প্রত্যভিজ্ঞা**। প্রত্যভিজ্ঞা প্রধানত দার্শনিক ব্যাখ্যা ও সাধনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে; কোনও আচার-অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধ করে না। প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনে শৈব অদ্বৈতবাদের দর্শন বিবৃত; অন্যদিকে অদ্বৈত তন্ত্রসমূহে বিবৃত হয়েছে বাস্তবে জীবাত্মা কীভাবে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে, অর্থাৎ শুদ্ধ যোগী হয়ে উঠতে পারে। শুদ্ধ যোগী তিনিই, যিনি বাহ্য বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে অন্তঃপ্রবেশ করেন এবং অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত হয়ে বাহ্যবিষয়ের স্বরূপে অনুপ্রবেশ করেন এবং এই দুই ভাবেই পরমাত্মার অনুভব করেন। পরমাত্মাকে অনুভব করার দুটি উপায় — একটিতে বাহ্য অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, অন্যটিতে অভ্যন্তরের স্থূল রূপ হিসাবে বাহ্যকে অবলোকন করতে হয়। সীমিত শক্তির যোগী প্রথম মার্গ গ্রহণ করেন, দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেন শুদ্ধযোগী। শুদ্ধযোগী শুদ্ধ-আত্মার অনুভব করেন জ্ঞেয়বস্তুর অনুভবের মধ্যেও, কারণ তিনি তাকে দেখেন নিজ-স্বরূপ হিসাবে।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বর্তমান অসাধারণ মনীষী অভিনব গুপ্তকে সাধারণভাবে কাশ্মীরি শৈব তত্ত্ব ও দর্শনের প্রবক্তা মনে করা হয়। কিন্তু অভিনব গুপ্ত শিবাদ্বয়তত্ত্বের নানা গ্রন্থের বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন এবং আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেছিলেন; সে-কারণে তিনি সকল শৈব সম্প্রদায়েরই গুরুরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তাই সিদ্ধান্ত, বাম, যামল, ভৈরব, কুল, ক্রম, ত্রিক এবং একবীর — সমস্ত শৈব সম্প্রদায়েরই গুরুরূপে অভিনব গুপ্তের স্বীকৃতি অবিসংবাদিত। উল্লেখ্য যে, সিদ্ধান্ত ও বীর-শৈবমতের প্রাধান্য দক্ষিণভারতে লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় যে, যে ক্রম ও কুল ধারা অভিনব গুপ্ত অনুসরণ করেছেন, তারা অদ্বৈত তত্ত্বেরই ভিন্ন ধারা যেন। উভয়েরই বক্তব্য অদ্বৈততত্ত্ব। উভয়েই আছে ঘাদশ-কালীর তত্ত্ব। অবশ্য সাধনতত্ত্বের ক্ষেত্রে মতের ভিন্নতাও আছে। **প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনে** ৩৬ টি তত্ত্ব স্বীকৃত; **ক্রম-দর্শনে** শুধুমাত্র গূঢ় তত্ত্বগুলি আলোচ্য এবং তাদের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি আসে — এই বক্তব্য সেখানে। এই দর্শনের নাম ক্রম; কারণ, এতে স্তরে স্তরে ক্রমশ মুক্তি স্বীকৃত। ক্রম-দর্শনে ঘাদশ-কালীর পূজা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অতএব পূজা-অর্চনার আচার এই ধারায় তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে **কুল**-ধারার অনুগামীদের পক্ষে এ ধরনের যে কোনও আচার নিষিদ্ধ।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই **ক্রম**-দর্শনের দুটি ধারা ছিল — একটিতে শিব পরমতত্ত্ব, অন্যটিতে কালী বা কাল-সংকর্ষিণী নাম্নী শক্তি পরমসত্তা। ক্রমদর্শনের আগমসমূহের প্রকাশক পার্বতী বা ভৈরব। যে-শাখায় শক্তি পরমতত্ত্বরূপে স্বীকৃত ছিল, ক্রমে তারই নাম হয় **শক্তি মার্গ**। যেহেতু **ক্রম**-দর্শনে শক্তি বা কালী পরমতত্ত্বরূপে স্বীকৃত, সে-কারণে 'কালীনয়' বা 'দেবীনয়' নামেও এর উল্লেখ দেখা যায়।

তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনার একটি বিশিষ্ট দিক মন্ত্র এবং মন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বীজমন্ত্রের উচ্চারণ — ওঁ, ফট্, হুং, ঐং, আঃ ইত্যাদি। এ ছাড়াও পরমশক্তিরূপিনী দেবীকে বলা হয়েছে 'বর্ণেশ্বরী' — আমাদের বর্ণমালার ৫০ টি অক্ষরসমষ্টি তাঁর শরীর,

তাকে নিজ শরীরে আবিষ্ট বা আবির্ভূত করতে হলে চাই বিশিষ্ট বীজসাধনা ও বর্ণতন্ত্র সাধনা। বর্ণের অপর নাম মাতৃকা; তাই মাতৃ-সাধনায় 'মাতৃকা' অর্থাৎ বর্ণের তাৎপর্য উপলব্ধি একটি বিশিষ্ট দিক। বর্ণসমূহের তাৎপর্য বুঝতে হলে 'বীজকোষ', 'বর্ণোদ্ধারতন্ত্র', 'বর্ণাভিধান', 'কামধেনুতন্ত্র', 'নানাশাস্ত্রতন্ত্র' ইত্যাদি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। অন্যথায় গোড়ায় গলদ থেকে যাবার আশঙ্কা অনিবার্য।

আমাদের আলোচ্য 'ডিস্‌কোর্সেস্‌ অন্‌ তন্ত্র' গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়াবলির আপাত-আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই তা লোকপ্রচলিত উক্তি-বিনিময় এবং লৌকিক দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যার উর্ধ্বে পাঠককে পৌঁছে দেয় না। এ গ্রন্থের অধ্যায়গুলি একেকটি বক্তৃতা, সেকথা আগেই বলেছি। সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জাগে, এই বক্তৃতামালার পৃষ্ঠভূমি, উদ্দেশ্য বা শ্রোতৃমণ্ডলী কেমন প্রকৃতির? শাস্ত্রার্থের গভীরে প্রবেশ করে ঐতিহাসিকতার আলোকে ভারততত্ত্বসমৃদ্ধ গবেষণাত্মক আলোচনা উপস্থাপন করা যদি বক্তার লক্ষ্য না হয়, তবে সে ধরনের গাম্ভীর্যপূর্ণ তত্ত্ব-আলোচনা যে অনুপস্থিত থাকবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মূল শাস্ত্র-অধ্যয়নের প্রতি কোনও ইঙ্গিত এই বক্তৃতামালায় নেই; নেই কোথাও মূল গ্রন্থের প্রতি কোনও উল্লেখপঞ্জি বা নির্দেশিকা। সাধারণ এবং লোকপ্রচলিত দৃষ্টিতে কিছু আকর্ষক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে সর্বত্র। এই উদ্যোগ নিজ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত, মূলশাস্ত্রের প্রতি উদাসীন, কিছু ভক্তকে উদ্দেশ করে অগ্রসর হয়েছে বলে আগাগোড়া মনে হয়।

অন্যদিকে উল্লেখ্য, আপাত-বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে ভারতীয় বর্ণমালার ব্যাখ্যা করে যে দীর্ঘ অধ্যায় প্রস্তাবিত হয়েছে, তার মূল উৎস কী, সে প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। কোনও মূল শাস্ত্রে আনন্দমূর্তি প্রস্তাবিত বর্ণার্থের সমর্থন পাওয়া যায় না। **তন্ত্র** শব্দের নির্বচনের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য। গ্রন্থকার ত-ত্রৈ+ড এই ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন; ত্রৈ ধাতুর অর্থ ত্রাণ করা, তাতে ড-প্রত্যয়; ত-শব্দের অর্থ 'স্তিমিতভাব', "dullness", তা থেকে যা ত্রাণ করে, তাই নাকি **তন্ত্র**।। **তন্ত্র**-শব্দের পাণিনি ব্যাকরণসম্মত ব্যুৎপত্তি আগেই দিয়েছি। তা ছাড়া প্রশ্ন — ত-এর অর্থ 'dullness' কোথায় পাওয়া গেছে? **কামধেনুতন্ত্রে** তো ঠিক বিপরীত তাৎপর্যই ত-সম্বন্ধে উচ্চারিত! ত-এর অর্থ স্বয়ং 'পরমকুণ্ডলী', যা তন্ত্রসাধনার মূল কথা; তা 'পঞ্চদেবাত্মক বর্ণ', যে পঞ্চদেবতা মূল **তন্ত্র** শ্রবণ করেছিলেন এবং পৌরাণিক ও স্মার্ত মার্গের পাঁচ উপাস্য দেবতা — এঁরা হলেন গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য, শিব ও পার্বতী; তা 'পঞ্চ প্রাণময়', 'ত্রিশক্তিসহিত', 'আত্মাদিতত্ত্বযুক্ত' এবং 'বিদ্যুৎসম প্রভাময়'।

"তকারং চঞ্চলাপাঙ্গি! স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
পঞ্চদেবাত্মকং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা॥
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণম্ আত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্।
ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণং পীতবিদ্যুৎসমপ্রভম্॥।

— কামধেনুতন্ত্র।

তন্ত্র-শব্দের নির্বচন দিয়ে অভিধানে বলা হয়েছে — এ হচ্ছে শিবোক্ত শাস্ত্র, এর মোট সংখ্যা ৬৪। এ ছাড়া বৌদ্ধ প্রভৃতি উপতন্ত্র রয়েছে।

এভাবেই অন্যান্য বর্ণ সম্বন্ধেও যে-অর্থ দেওয়া হয়েছে, তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে তার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়নি। দেব, দেবতা, যোগ — প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য। গ্রন্থকার তন্ত্র ব্যাখ্যা করে যোগশাস্ত্রের মূল প্রবক্তা মহর্ষি পতঞ্জলির দেওয়া যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিকে অযৌক্তিক বলেছেন (পৃ. ২০৬, ২য় খণ্ড)। তন্ত্র-শাস্ত্রের অতবড় ব্যাখ্যাতা স্বয়ং অভিনব গুপ্তও একথা বলেননি। আশ্চর্য, এত দীর্ঘ তন্ত্র-আলোচনায়, অভিনব গুপ্ত রচিত সুবিশাল গ্রন্থ **তন্ত্রালোকে**-র কোনও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি তন্ত্রের মূল কথা **শ্রীবিদ্যা** ও **শ্রীযন্ত্রের** কথাও, যদিও তা সুদৃশ্য প্রচ্ছদে স্থান পেয়েছে দুই খণ্ডেই। **তন্ত্র** প্রসঙ্গে এসেছে তন্‌-ধাতুর অর্থ। গ্রন্থকার **তনু-বিস্তারে** উদ্ধৃতি দিয়েছেন সঠিকভাবে; তবে ব্যাখ্যা নিজস্ব। তাঁর বক্তব্য শিশুর দেহকে (body) 'তনু' বলা হবে, বৃদ্ধের দেহকে বলতে হবে 'শরীর', 'তনু' নয়; যেমন শিশুর দেহকে 'শরীর' বলা যাবে না। এখানে বক্তব্য — সংস্কৃত ভাষায় বা তৎসম শব্দ হিসাবে 'শরীর' বলতে বোঝায় 'রূপ' অর্থাৎ আকারযুক্ত, স্পর্শযোগ্য দ্রব্য, যা বিনাশশীল। সেক্ষেত্রে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের দেহই শরীর! আর সুন্দর ক্ষীণ শরীরকে বলা হয়েছে তনু, তন্বী ইত্যাদি!

যখন গ্রন্থকার তন্ত্র-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদ্যাতন্ত্র ও অবিদ্যাতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তখন মনে হয় যেন তিনি প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের মায়া-অবিদ্যা-সদ্‌বিদ্যা এসব কথা বলবেন। কিন্তু তিনি পৌষ্টিক ও আভিচারিক ক্রিয়াকর্ম ও লৌকিক উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত; উদ্ধৃতিতে এসেছে হিতোপদেশ ও লোককথা, পরমপুরুষ বা পরমাত্মার তত্ত্বব্যাখ্যায় যার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। (পৃ. ২৫০-২৫১, ২য় খণ্ড)। তেমনই সঙ্গতি পাওয়া যায় না যেসব বক্তব্যের তা হল, তন্ত্রসাধনা যেন শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ গড়ার পক্ষে প্রথম ধাপ, যা বৈদিক শাস্ত্রমার্গে ব্যাহত, যেহেতু তাতে জাতপাতের ব্যবস্থা ও শোষণের যন্ত্র সুদৃঢ়। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু তাতে নেতৃত্ব দেওয়া তন্ত্রসাধকের লক্ষ্য (পৃ. ২২–৩৫, ২য় খণ্ড) — এ তত্ত্ব কোন তন্ত্রগ্রন্থে আছে। বর্তমান বিশ্বের সঙ্কট মোচনে সকল তান্ত্রিক একযোগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও — এই শ্লোগানেরই বা কী তাৎপর্য? বেদ ও তন্ত্রের মধ্যে বিরোধ নয় — একই ভারতীয় সংস্কৃতির দুটি ভিন্ন ধারা বয়ে চলেছে পরস্পর সাযুজ্য ও ভিন্নতা বজায় রেখে — এই মূল সত্যটি গ্রন্থকারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, যেকথা শ্রীমৎ অনির্বাণ তাঁর বেদমীমাংসা (১ম খণ্ড) গ্রন্থে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন।

তন্ত্রশাস্ত্র ও বৈদিক উপাসনার সমস্ত প্রক্রিয়ার লক্ষ্য সৎ-তর্ক, মন্ত্র ও ভাবনা এই তিনের সমন্বয়ে সদ্‌ বিদ্যা-অর্জন।

ভারতীয় আর্য সভ্যতা ও তন্ত্র, রাঢ়ের শিব, তারক ব্রহ্মনাম, যোগ, ভক্তি ও তন্ত্র ইত্যাদি অধ্যায়ের শিরোনাম গভীর ব্যঞ্জনাময় কিন্তু প্রায় কোথাও ভারতবিদ্যাচর্চার গভীরতা, পদ্ধতিগত শৈলী ও বিন্যাস দেখা যায়নি। এমনকী সংস্কৃত শব্দাবলি বা ধ্বনিসমষ্টির যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিবর্ণিত রূপ সর্বজনগ্রাহ্য, তাও এ গ্রন্থে বর্জিত এবং অতি অস্বচ্ছ প্রতিবর্ণীকরণ গৃহীত, যা প্রতিপদে পাঠের বাধা সৃষ্টি করে; কারণ এই প্রক্রিয়াতে 'জিন' এবং 'জ্ঞ' এক হয়ে গেছে 'সর্প' এবং 'সৃপ' একাকার ইত্যাদি। তন্ত্রালোচনায় 'পরমাত্মা' শব্দ বেশি প্রত্যাশিত 'ব্রহ্ম' বা 'পরব্রহ্ম' নয়, যা উপনিষদের বা বেদান্তদর্শনের মূলতত্ত্ব। এ-শব্দটি ব্যবহার করলে তার প্রাসঙ্গিক ও তুলনাত্মক বিশ্লেষণ অপেক্ষিত ছিল। অবশ্য আগেই বলেছি বক্তার ও শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের উপরে অনেকটাই নির্ভর করে বক্তব্য বিষয়কে কোন পথে, কতটা গভীর ও শাস্ত্রসম্মত আলোচনা ও বিশ্লেষণের আকার দেওয়া হবে। উল্লিখিত বক্তব্য ভারতবিদ্যাচর্চার দৃষ্টিতেই নিবদ্ধ হল, যেখানে তন্ত্রশাস্ত্র বর্তমানে গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তের দার্শনিক মতের সঙ্গে শৈবতন্ত্র-প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের তুলনা করে আচার্য অভিনব গুপ্ত যা বলেছেন তা পাঠকের সুবিধার্থে তুলে ধরছি। অভিনব গুপ্ত বলেছেন — 'শাস্ত্রসমূহের লক্ষ্য সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি বা মোক্ষলাভ। কিন্তু প্রত্যেক দর্শনে মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে ভিন্ন কথা বলা হয়েছে। যদি আগমিকেরা দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা ত্যাগ করে, যদি বেদান্তীরা মায়াকে ব্রহ্মের শক্তিরূপে স্বীকার করে, যদি বৌদ্ধেরা আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞানকে আত্মা বা মহেশ্বর বা পরচৈতন্যের অভিব্যক্তিরূপে স্বীকার করে, তাহলে প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন এবং আগমিক, বেদান্তী ও বৌদ্ধদের মধ্যেকার মতপার্থক্য দূরীভূত হবে'। তিনি আরও বলেছেন — বৌদ্ধ, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের সহায়তায় সাধক পাঁচটি কঞ্চুক বা আবরণের স্তর অতিক্রম করে আত্মোপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা মতে এও প্রকৃত মোক্ষ নয়। প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনে বলা হয়, মোক্ষ নিষ্কলুষ শুদ্ধ চৈতন্য, আত্মানুভব, শুদ্ধা সংবিৎ অথবা পরচৈতন্য।

সাধক এই স্তরে উন্নীত হয়ে কি শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্রোহ করবেন? তন্ত্রশাস্ত্রে সে কথা কি বলা হয়েছে? তন্ত্রশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে অনেক প্রশ্নই মাথা চাড়া দেয়; না হলে শ্রেণীশোষণহীন সমাজ গড়াতে,কি কারও আপত্তি হবে? □

ডিসকোর্সেস অন তন্ত্র (১ম ও ২য় খণ্ড) — শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি / আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, কলকাতা / ১০০.০০

সমতট শতক প্রবন্ধ

রণেন্দ্রনাথ দেব

সাড়ে আটশো পৃষ্ঠার এই সংকলন গ্রন্থটি আকারে বৃহৎ এবং পড়তে গিয়ে যথেষ্ট সময় দিতে হয়েছে, কিন্তু সে পরিশ্রম সুখকর। 'সমতট' চিন্তাশীল পাঠকের কাছে সুপরিচিত। পত্রিকাটির পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সম্পাদকেরা এমন একটি সংকলন বার করতে চেয়েছেন যাতে "সমতটের বহুবৃত্তিক চরিত্র রক্ষা করা হবে" এবং "আগে যাঁরা সমতট প্রকাশন দেখেননি তাঁরা এর চরিত্র ও মান সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।" সম্পাদকমণ্ডলীর প্রয়াস সফল হয়েছে।

সংকলিত রচনার কিছু কিছু অংশ অবশ্য অন্য পত্রিকা থেকেও (যেমন স্টেট্‌স্‌ম্যান) সংগৃহীত। আলোচনার পূর্ণতার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ "সেমিনার"। সেমিনারে আলোচ্য বিষয় চারটি — ১. আমাদের শিক্ষানীতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা ২. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ৩. হিংসা ৪. বাঙালি বুদ্ধিজীবীর আত্মজিজ্ঞাসা। এই চারটি প্রসঙ্গই একালের চিন্তাশীল মানুষের গভীর ভাবনা উদ্রেক করে। প্রসঙ্গগুলি একে একে বিশ্লেষণ করছি।

শিক্ষানীতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন অম্লান দত্ত, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুভাষচন্দ্র সরকার, মানসী দাশগুপ্ত, অমৃতানন্দ দাস ও শ্যামল চক্রবর্তী। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি পরীক্ষাকেন্দ্রিক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আয়তন বৃদ্ধির ফলে পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে এসে পড়েছে। সাংবাদিক সুভাষ সরকার বিহারের পরীক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র দিয়েছেন তা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কতকটা খাটে। অম্লান দত্ত ও সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরীক্ষাব্যবস্থার গুরুদায়িত্ব প্রধানত কলেজগুলির হাতে সমর্পণের পক্ষপাতী। ধীরেশ ভট্টাচার্যের মতে পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কারে তিনটি মূল নীতির দিকে লক্ষ রাখা আবশ্যক:

"প্রথমত পরীক্ষাপদ্ধতি যেন যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য হয়, পরে পরীক্ষার্থীরা অযথা বিপন্ন হবার আতঙ্ক থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত যিনি শিক্ষাদাতা তিনি যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তার সঙ্গে পরীক্ষার যোগাযোগ যেন ঘনিষ্ঠ হয়।

তৃতীয়ত পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যক্তিবিশেষের পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভরশীল না করে তাকে যেন যতদূর সম্ভব ব্যক্তি-নিরপেক্ষ করে তোলার চেষ্টা করা হয়।"

সেমিনারে এই পর্বটির সম্পাদক শুভ্রাংশু ঘোষ সংযোজন অংশে মন্তব্য করেছেন —

"যে তিনটি পরীক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প এখানে এসেছে সেগুলি হল :

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে অন্তত স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পরীক্ষা নেওয়া ও ফলাফল প্রকাশের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া ; (২) পাঠ্যক্রমকে সময়সূচী দিয়ে ভাগ করে ছ'মাসে অথবা প্রতিমাসে বা সম্ভব হলে সপ্তাহে পরীক্ষা নেওয়া এবং এইসব পরীক্ষার যোগফল দিয়ে (আনুপাতিক যোগও হতে পারে) চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ, এবং(৩) জীবিকাকে শিক্ষাগত পরীক্ষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে নেওয়া অর্থাৎ প্রতিশ্রেণীর জীবিকার জন্য বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা ব্যবস্থা করা যার সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।"

আলোচকদের সকলেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। এঁদের মতামত অবশ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিতব্য। কিন্তু সন্দেহ থেকে যায়, বর্তমান স্নাতক স্তরে শিক্ষার যে অবস্থা তাতে পরীক্ষাপদ্ধতির বিকেন্দ্রীকরণে হিতে বিপরীত না হয়। জীবিকার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজন নিশ্চয় রয়েছে। কিন্তু সরকার যদি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে প্রায় সচেতনভাবে পঙ্গু করে রাখেন কোনও সংস্কারের উদ্যম ফলপ্রসূ হবে কি? নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষা নেবার পদ্ধতি স্কুলের নিচু ক্লাস থেকে সর্বভারতীয় কৃত্যকের পরীক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র চলছে। এর দ্বারা যোগ্যতার বিচার, বিশেষত ভাষার ক্ষেত্রে, অনিয়মিত হতে পারে এবং এর একপেশে প্রয়োগ হয়ত বা বিপজ্জনক।

সেমিনারের দ্বিতীয় পর্যায়ে "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি" বিষয়ে লিখেছেন অম্লান দত্ত, গৌরী আইয়ুব, পরিতোষ পালচৌধুরী , আবদুল জব্বার। অম্লান দত্তের প্রবন্ধ এবং তার সংযোজন অংশটি নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রীদত্তের অভিমত—"ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, সমাজতন্ত্রী পর্যন্ত সব দলই সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করেছে" এবং "ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এদেশের মুসলমানকে" অভ্রান্ত সত্য। তাঁর অন্য একটি অভিমতও বিনা দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য — সারা পৃথিবীতে সংস্কৃতিভিত্তিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা যে জেগে উঠেছে তা "একমাত্র ধর্মের ব্যাপার নয়, এটা আরও বড় একটা সমস্যার প্রতিফলন মাত্র"।

তৃতীয় পর্যায়ে 'হিংসা' বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রশান্ত সান্যাল, পান্নালাল দাশগুপ্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, অন্নদাশঙ্কর রায়, রণজিৎ গুপ্ত, জয়প্রকাশ নারায়ণ, কমল মুখোপাধ্যায়, পরিতোষ রায়চৌধুরী ও মিহির সিংহ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা ও মতি নন্দীর একটি গল্পও এ পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। দু'টিই বিষয়োপযোগী ও সুনির্বাচিত।

প্রশান্ত সান্যালের লেখাটিতে (মূল ইংরাজি ও বাংলা অনুবাদে) ১২টি অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে তা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। জয়প্রকাশ নারায়ণ ও পান্নালাল দাশগুপ্ত একদা সহিংস বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই হিংসা বিষয়ে তাঁদের মতামত নিতে পাঠকের কৌতূহল হয়। শ্রীদাসগুপ্ত গান্ধীজির সুপরিচিত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন — Violence is hundred times better than cowardice ; শ্রীদাশগুপ্তের লেখাটি আরও বিস্তৃত হলে পাঠকের পরিতৃপ্তি হত। অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখটিও অতিশয় সংক্ষিপ্ত। তুলনামূলকভাবে, কলকতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রণজিৎ গুপ্তের রচনাটি আকারে ছোট হলেও, তীক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দেয়। মিহির সিংহ-কৃত 'সার সংকলন'ও সুগ্রথিত। পুনর্মুদ্রিত সেমিনারের সম্পাদক শুভ্রাংশু ঘোষের সংযোজনও মূল্যবান।

সেমিনারের সবচেয়ে মনোজ্ঞ অংশ চতুর্থ পর্যায়ের "বাঙালি বুদ্ধিজীবির আত্মজিজ্ঞাসা"। লেখাগুলি পড়ে মনে হচ্ছে লেখকেরা এই বিষয়টির মধ্যে উপযুক্ত অবলম্বন পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন — মিহির সিংহ, পান্নালাল দাশগুপ্ত, চাণক্য সেন, বিপ্লব দাশগুপ্ত, দীপঙ্কর লাহিড়ী, মুকুল ঘোষাল, সুজিৎ চৌধুরী, আহমদ শরীফ, শীতাংশুকুমার চক্রবর্তী ও নরহরি কবিরাজ। প্রায় সবকটি লেখায় লেখকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পর্শ আছে বলে এগুলি নীরস তত্ত্ববিচার হয়নি। মিহির সিংহের "লুসিফারের উত্তরাধিকার" দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক রচনা। "স্বার্থ ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী" প্রবন্ধে পান্নালাল দাশগুপ্ত এবং "বাঙালি বুদ্ধিজীবীর রাজনৈতিক চেতনা" প্রবন্ধে চাণক্য সেন একালের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে হতাশা ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিদেশবাসী বিজ্ঞানী কল্যাণ দাশগুপ্তের 'রূপান্তরিত বাঙালি" অন্য দিকে প্রবল আশাবাদে পূর্ণ এবং তা আমাদের প্রোৎসাহিত করে। ধীরেশ ভট্টাচার্যের ':মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর আত্মজিজ্ঞাসা: অর্থনীতির ক্ষেত্রে' ঈষৎ সংক্ষিপ্ত হলেও ভবতোষ দত্তের "অর্থশাস্ত্র চর্চায় বাঙালি" একটি উঁচু আদর্শপ্রাণিত রচনা। শীতাংশুকুমার চক্রবর্তীর "বাঙালি ও বাণিজ্যে নির্বাসিত লক্ষ্মী" নামক আলোচনাটিতে ব্যবসায় ও বাণিজ্য সংগঠনে বাঙালির বিফলতার হেতুগুলি উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সঙ্কট বিষয়ে দুটি বড় আলোচনা দীপঙ্কর লাহিড়ীকৃত "বিজ্ঞান গবেষণার অন্তরায়" এবং মুকুল ঘোষাল লিখিত "একজন বিজ্ঞান অধ্যাপকের আত্মজিজ্ঞাসা"। একালের বাঙালি জীবন সম্বন্ধে আরও দু-টি সুলিখিত প্রবন্ধ — সুজিৎ চৌধুরীর "আসামের বাঙালি অস্তিত্বের সঙ্কট" এবং আহমদ শরীফের "বাংলাদেশের এখনকার বুদ্ধিজীবী সমাজ"। দুটি প্রবন্ধই সত্যনিষ্ঠ ও প্রকৃত বিচারমূলক। স্বর্গত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন অল্প, কিন্তু তাঁর লেখা সর্বদা

গভীর মননশীলতায় সমৃদ্ধ। আলোচ্য সংকলনে "ধর্ম ও দর্শন জিজ্ঞাসায় বাঙালির ভূমিকা" তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও সহজ করে বলবার দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় দেয়। ভক্তিবাদ, নব্য ন্যায় এবং আধুনিক কালের বাঙালি দার্শনিকদের ভাবনা সম্বন্ধে সরল ভাষায় মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে যে আলোচনা করা হয়েছে তা বারবার পাঠ করার যোগ্য। এই প্রবন্ধটি বাঙালি সংস্কৃতিতে আগ্রহশীল সব ছাত্রের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য বলে গণ্য হবে।

বাঙালি জীবন নিয়ে আরও তিনটি রচনা সংকলনে স্থান পেয়েছে। প্রথমটি "বঙ্গ সংস্কৃতির লেনদেন সম্পর্কে অধ্যাপক ডক্টর বিনয় সরকার"। এটি বিনয় সরকারের নিজস্ব লেখা নয়। কোনও সংবাদপত্রসেবীর প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদের গবেষক ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় এই কথাগুলি বলেছিলেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় অধ্যাপক সরকারের অভিমত অবিকৃতভাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং বিনয়বাবুর কথনবৈশিষ্ট্যও বজায় রেখেছেন। যাঁরা অধ্যাপক সরকারকে চিনতেন তাঁদের সন্দেহ হবে না প্রবন্ধে ব্যক্ত মতগুলির প্রামাণিকতায়। অধ্যাপক সরকারের আলোচনার মুখ্য বিষয় বাঙালি সংস্কৃতি আসলে 'এ সিস্টেম অব মিউচ্যুয়াল আক্‌কুলটুরেশনস্"। এটি কি চিজ? কোনও সংস্কৃতি অন্য কোনও সংস্কৃতির ভিতর প্রবেশ করলে দ্বিতীয় সংস্কৃতিটিতে অল্পবিস্তর রদবদল ঘটতে থাকে। একে "সংস্কৃতীকরণ" বলা যেতে পারে। অধ্যাপক সরকারের মতে "কোনও জিনিসকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভোল বদলাইয়া দিবার নামই সৃষ্টি, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। আধিপত্য করা, কর্তৃত্ব চালানো প্রভৃতি কাজ সংস্কৃতির অঙ্গ, — অঙ্গ শুধু নয়, সংস্কৃতির প্রাণ"। অধ্যাপক সরকারের মতটির অভিনবত্ব এবং এর পিছনে কোনও পাশ্চাত্য কু-চিন্তার প্রভাব আছে কি না সে বিষয়ে মন্তব্য করব না। অধ্যাপক সরকারের মতে হিন্দুধর্ম বাঙলায় বিদেশি। আর্যেরা বাঙালিকে "বয়াংসি" অর্থাৎ "চিড়িয়ামাত্র সমঝিতে অভ্যস্ত ছিল"। পারিয়া অর্থাৎ অনার্য বাঙালির সঙ্গে বৈদিক ও বৌদ্ধধর্মের একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। এইজন্য "বঙ্গ সংস্কৃতি দো-আঁশলা মাল"। শুধু হিন্দুধর্ম নয় ইসলামকেও বাঙালির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। অনার্য, আদিম, বুনো নরনারীর ধর্ম ও সংস্কৃতিই হল বাঙালির খাঁটি স্বদেশি ধর্ম ও সংস্কৃতি। অধ্যাপক সরকারের মত যতই প্রথাবিরোধী মনে হোক তার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে এবং তা আমাদের ভাবায়।

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রাজ্যেশ্বর মিত্র রচিত "নবরূপায়ণে বিশ শতকের সঙ্গীতের ধারা: প্রথম তিন দশক"। রাজ্যেশ্বর মিত্র সঙ্গীত সম্বন্ধে বহু প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক। বর্তমান প্রবন্ধে এই শতকের প্রথম তিন দশকে বাংলার সঙ্গীত জগতে যে ধারাগুলি প্রবল ছিল সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধটি সংকলনের গৌরব।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে কটি প্রবন্ধ আছে (সেকালের নভেল, একালের নজরে এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি রচনা) তাদের মধ্যে অত্যন্ত কৌতূহলজনক হচ্ছে কমলকুমার মজুমদার সম্বন্ধে আলোচনাগুলি। কমলকুমারের ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টি বিষয়ে লিখেছেন অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত, সত্যজিৎ রায়, নরেশ গুহ, অহিভূষণ মালিক ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। তা ছাড়া আছে মানসী দাশগুপ্ত ও নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেওয়া সাক্ষাৎকার। নাটক বিষয়ে আলোচনা রয়েছে একটি। অঞ্জন দাশগুপ্তের "অ্যাবসার্ড থিয়েটার" নামক সহজবোধ্য লেখাটি পড়ে পাঠক অ্যাবসার্ড থিয়েটারের তাৎপর্য এবং বাংলা নাটকে অ্যাবসার্ড থিয়েটারের প্রভাব বিষয়ে অবহিত হবেন। কিন্তু সাহিত্য-সঙ্গীত-নাটকের তুলনায় চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় না থাকার সামিল। সন্দীপ সরকারের লেখাটি লেখার খসড়ামাত্র। অথচ চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনার কতই না সুযোগ ছিল।

এই প্রসঙ্গে অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্তের "ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম" প্রবন্ধটির উল্লেখ করা সমীচিন। অধ্যক্ষের একটি কাস্টিং ভোটের জোরে হিন্দিকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষারূপে নির্ধারণ করা হয়। এরপর থেকে ছলেবলেকৌশলে হিন্দি ভাষার আধিপত্য বাড়াবার চেষ্টা চলেছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদকরাকে বাঙালি প্রাদেশিকতাবাদ বলে নিন্দা করা অযৌক্তিক। রাজস্থানী বা মৈথিলভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দি ভাষার প্রতি বিমুখতা কতখানি তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি। যাঁরা হিন্দি বলেন না, তাঁদেরও হিন্দি বুঝতে হয়। হিন্দি ভাষার প্রভুত্ব কায়েম করতে গিয়ে দেশের সংহতিকে কতখানি বিপন্ন করে তোলা হচ্ছে সে বিষয়ে হিন্দি প্রবক্তারা অচেতন ও নিষ্ক্রিয়।

আলোচ্য সংকলনগ্রন্থে আধুনিক কালের চিন্তাধারার প্রায় সবগুলি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের মানস সম্পদের কোনও দিকই উপেক্ষিত হয়নি। স্বাভাবিকভাবে বিজ্ঞানের বিশ্লেষণও করা হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র না হওয়ায় সিদ্ধান্ত তত্ত্বের গোড়ার কথা (অতীন্দ্রমোহন গুণ), পরিসংখ্যানের ফাঁক (দিঙনাগ আচার্য) প্রাণ ও ইলেকট্রন (মুকুল ঘোষাল) — এই প্রবন্ধগুলির উৎকর্ষ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারছি না। কিন্তু সরোজবন্ধু ঘোষের "আণবিক গবেষণা" প্রবন্ধটি পড়ে প্রভূত উপকার পেয়েছি। আমেরিকবাসী বিজ্ঞানী সরোজবন্ধু "আণবিক গবেষণা: বিপদ" সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, চের্নোবিলের দুর্ঘটনা এর উদাহরণ। পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা" লেখাটিতে গবেষণার বিফলতা ও প্রগতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ আছে। ১৯৭৫-এ লেখা হলেও রচনাটির মূল্য কমেনি। যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ব্যক্তিরা আইনস্টাইন ও ফ্রয়েডের পত্রালোচনা পড়েও চিন্তার রসদ পাবেন। এটির পুনর্মুদ্রণ সময়োচিত।

ইতিহাস বিষয়ক রচনার মধ্যে প্রধান দুটি "ভগিনী নিবেদিতার রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বিদায়" ও "ভাষা আন্দোলনের শতবর্ষান্তে"। প্রথম প্রবন্ধে প্রীতিতোষ রায় যথার্থ ঐতিহাসিক পদ্ধতির বিচার করে দেখিয়েছেন ভগিনী নিবেদিতাকে প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্কচ্যুত করা হয়নি, ক'টি বিষয়ে তাঁকে নিজ অভিপ্রায় মতো কাজ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। এই প্রবন্ধ পড়বার পর নিবেদিতা সম্বন্ধে অনেক জল্পনাকল্পনার অবসান হবে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির লেখক দীনেশচন্দ্র সিংহ দেখিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্নস্তরের পাঠ্যক্রমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবর্তনের জন্য স্যার আশুতোষকে কতখানি সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

অজ্ঞাতপূর্ব অনেক তথ্যের সন্ধান দেওয়ার জন্য সাধন দাশগুপ্ত লিখিত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় লেখাটিও প্রশংসিত হবে।

শীতাংশুকুমার চক্রবর্তীর "ব্যবস্থাপকের ধ্যানধারণা: একটি সমীক্ষা" লেখাটিও পরিশ্রমের ফল। মননশীল পাঠক এটিকে উপেক্ষা করবেন না। ত্রিদিব ঘোষের "বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শন" একটি দীর্ঘ নিবন্ধ। বাংলা ভাষায় রাসেলের দুরূহ দর্শনকে প্রকাশ করা কঠিন। সম্ভবত সেই জন্য প্রবন্ধটির ভাষা কোথাও কোথাও স্বচ্ছন্দ হতে পারেনি।

একালের চিন্তাশীল সকল পাঠক এ সংকলন পড়ে আনন্দ পাবেন, উদ্বুদ্ধ হবেন। ছাপা অবশ্য লেখার মানের মতো উঁচুদরের হয়নি। দেড়শো টাকা দামও সাধারণ মধ্যবিত্ত পাঠকের পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ। তবে আজকাল কোন বইয়েরই বা দাম কম? সাধুবাদ সম্পাদকমণ্ডলীর অবশ্যপ্রাপ্য। □

সমতট শতক প্রবন্ধ — (রৌপ্যজয়ন্তী স্মারক সংকলন)। সঃ — অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত, শুভ্রাংশু ঘোষ, সাধন দাশগুপ্ত / সমতট, কলকাতা–২৯ / ১৫০.০০

শিক্ষাচার্য মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

মালবিকা সেনগুপ্ত

অনুসন্ধিৎসু ও ভাষামনস্ক বাঙালি পাঠকসমাজে মণীন্দ্রকুমার ঘোষের নামটি পরিচিত অন্যতম বৈয়াকরণ হিসাবে। যাঁর 'বাংলা বানান' বই বাংলা ভাষা ও শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে উদাসীন বাঙালিকে নাড়া দিয়েছিল। বাংলা ভাষা, বানান বিধি ও লিখনশৈলী নিয়ে মণীন্দ্রকুমারের আমৃত্যু সাধনা। বাংলা ভাষা, শব্দ ও বানান নিয়ে কোনও সংশয় সন্দেহ নিরসনে এমনকী প্রত্যয় প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহসী পত্রালাপে মণীন্দ্রকুমারের কোনও সঙ্কোচ ছিল না। বরিশালের (বর্তমানে বাংলাদেশে) চন্দ্রহার থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই ভাদ্র রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে মণীন্দ্রকুমার লিখেছিলেন — '...ও-কার ব্যবহার আপনার লেখায় কোনো শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিতে পারিতেছে না। হ'ল ছিল, কিন্তু এল! ক্রিয়াগুলিতে যেখানে অ-কারের উচ্চারণ অনেকটা ও-কারের মতো সেখানে উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য আপনি (') চিহ্ন ব্যবহার করিতেছেন — ক'রে, ব'ললে। তাহ হইলে এলো না লিখিয়া 'এল', ছিলো না লিখিয়া ছিল' লেখা যায় কী? আমার মনে হয় এ সমস্ত ক্ষেত্রে উচ্চারণ বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা।...'

কেবল ভাষা বা বানানবিধি নিয়ে নয়, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুলেখক, সফল সংগঠক হিসাবেও মণীন্দ্রকুমারের ছিল বিস্তৃত কর্মপরিধি। তাঁর জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে 'শিক্ষাচার্য মণীন্দ্রকুমার ঘোষ' — লেখক অজয়কুমার নন্দী। গ্রন্থের নিবেদনে লেখক জানিয়েছেন মণীন্দ্রকুমার ঘোষকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ প্রকাশের অবচেতন ইচ্ছার ফল 'শিক্ষাচার্য মণীন্দ্রকুমার ঘোষ' গ্রন্থটি।

মণীন্দ্রকুমারের সঙ্গে লেখকের পরিচয় শিক্ষাচার্যের জীবনের প্রান্তবেলায়। পড়ন্ত সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে মধ্যাহ্নসূর্যের তাপ অনুভবের চেষ্টার মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা থাকে, আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই ফাঁকটুকু পূরণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

ক্ষীণ কলেবরের এই গ্রন্থটিতে বিবৃত হয়েছে মণীন্দ্রকুমার ঘোষের জীবন ও কাহিনী, কর্মজীবন, শিক্ষক মণীন্দ্রকুমার ঘোষের কথা। এছাড়া রয়েছে মণীন্দ্রকুমার ও কালিন্দীর আড্ডা, স্মৃতিচারণে মণীন্দ্রকুমার ও তাঁর দু'টি লেখা, তাঁর দুটি বইয়ের আলোচনা, মূল্যবান কয়েকটি পত্রালাপ, একটি সাক্ষাৎকার, অসংকলিত রচনা ইত্যাদি — যার বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুনর্মুদ্রণ।

মণীন্দ্রকুমারের শিক্ষক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আদর্শ বিদ্যালয়, মহেশতলা হাইস্কুল, বরিশাল চন্দ্রহার কে আর শিক্ষায়তন, কলকাতা ব্রাহ্ম বয়েজ, পাবনা চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ, খড়্গপুর কৃষ্ণলাল শিক্ষানিকেতন, কলকাতা বেনেপুকুর বিদ্যাপীঠ।

শিক্ষাসংস্কার, সহশিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যাপীঠে এক্সটেনশন লেকচার প্রবর্তন, ছাত্রদের সমাজসেবায় ও ইতিহাস চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা — এসবের মধ্য দিয়ে ছাত্রদরদী, আদর্শবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, দৃঢ়চেতা মণীন্দ্রকুমারের যে পরিচয় পাওয়া যায় বর্তমানে সেরূপ ব্যক্তিত্ব বিরল।

প্রধানশিক্ষক সমিতির প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রধান সদস্য ছিলেন মণীন্দ্রকুমার। বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় 'Headmasters Manual' গ্রন্থের জন্য তাঁর অবদান অসামান্য।

কালিন্দীর আড্ডাতেই লেখকের সঙ্গে মণীন্দ্রকুমারের প্রথম পরিচয়। যা শ্রদ্ধা ও নির্ভরশীলতার সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল। বার্ধক্যের কারণে অসমর্থ মণীন্দ্রকুমারের চিঠিপত্রের অনুলিখনের কাজও লেখক করেছেন। মণীন্দ্রকুমারের কাছে লেখক জেনেছেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মণীন্দ্রকুমার ঘোষের আন্তরিক সম্পর্কের কথা। জেনেছেন কীভাবে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাচার্যের চিন্তা ও চেতনায় স্থান করে নিয়ে ছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে দৃষ্টিকটু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এড়াতে পারলে ভাল হত। বৈয়াকরণকে নিয়ে লেখা বইতে অন্তত সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিদগ্ধজনের নামের বানানে দ্বিচারিতা বাঞ্ছনীয় নয় (সুণীতি – পৃ: ২৮)। এই বইটিতে লেখকের সৎ প্রচেষ্টা প্রমাণিত। বিশেষ করে শুদ্ধভাবে মাতৃভাষা লিখতে পারা বাঙালির সংখ্যা যখন ক্রমেই কমছে তখন এই জীবনকথা থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। এখনও যাঁরা বাংলা ভাষা, শব্দ ও সুনির্দিষ্ট বানানবিধি নিয়ে কিছুমাত্র ভাবেন তাঁদের কাছে গ্রন্থটি অবশ্যই নতুন করে চিন্তার উপাদান যোগাবে।

শিক্ষাচার্য মণীন্দ্রকুমার ঘোষ — অজয়কুমার নন্দী / পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯ / ৫০.০০

ল্যুইস ক্যারলের পত্রসাহিত্য

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃষ্টির একটি দিক নিয়েই মেতে থাকি। অর্থাৎ যে দিকটি অধিকতর আলোচিত বা প্রচারিত, তাই-ই হয়ে ওঠে আমাদের আকর্ষণের প্রধান ক্ষেত্র। কিন্তু এর আড়ালে কখনও সখনও থেকে যায় অজানা হীরকদ্যুতি, অশ্রুত সুরধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা-কথাসাহিত্য আমাদের কাছে যতটা পরিচিত, তাঁর প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র ততটা নয়; বালজাকের উপন্যাসের বর্ণচ্ছটায় আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় তাঁর অনুপম গল্পমালা; লিওনার্দো-র চিত্রকলা আমাদের যতটা কাছের, তাঁর নোটবুক আমাদের পক্ষে ততটাই সুদূর। অনির্বাণ রায়কে ধন্যবাদ, 'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর স্রষ্টা ল্যুইস ক্যারলের এক বিশেষ দিক তিনি তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। ছেষট্টি বছর আয়ুষ্কালে তাঁর লেখা চিঠির সংখ্যা এক লক্ষ। রজার ল্যান্সলীন গ্রীনের সহায়তায় ক্যারলের চিঠিপত্র সম্পাদনা করেন মর্টন এন. কোহেন। তার দুটি খণ্ড ম্যাকমিলান লন্ডন লিমিটেড প্রকাশ করে ১৯৭৯ সালে।

সাতষট্টি পৃষ্ঠার এই সুমুদ্রিত বইটিতে ল্যুইস ক্যারলের একাধিক চিঠির উদ্ধৃতিসহ লেখক আলোচনা করেছেন এই বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিকের জীবনের বহু পর্ব বহু স্তরের কথা। সেইসঙ্গে রয়েছে লুইস ক্যারলের আঁকা কিছু ছবি ও চিঠির প্রতিরূপ। প্রতিরূপ এই জন্যই যে তাঁর চিঠি পড়া ছাড়া দেখার বস্তু হিসাবেও অতুলনীয়। বিভিন্ন নকশা বা রেখাচিত্রের মাধ্যমে ক্যারলসাহেব ফুটিয়ে তুলতেন চিঠির বয়ান, ভাষার জাদুকরি, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে এহেন মণিমুক্তো: "জীবনের গভীর রহস্যগুলোর ভেতর একটা হল সত্যিকার কিছু করা, অন্যের জন্য কিছু করা।" (বন্ধু এলেন টেরি-কে লেখা, ১৩ নভেম্বর ১৮৯০) শুধু নিজে চিঠি লেখা-ই নয়, চিঠি লেখার সাধারণ নিয়ম নিয়ে কয়েকটি অসাধারণ কথা বলেছেন ল্যুইস ক্যারল, তাঁর 'এইট অর নাইন ওয়াইজ ওয়র্ডস অ্যাবাউট লেটার-রাইটিং' গ্রন্থে। এরই অংশবিশেষ সুরমা ভাষায় অনুবাদ করেছেন লেখক। বর্তমান তথাকথিত আধুনিক গতিময় যুগে, যেখানে মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে চিঠি লেখা আমাদের অধিকাংশ মানুষেরই বাহুল্য বোধ হতে পারে, সেখানে ক্যারলের অভিমত এবং উপদেশ নতুনতর জীবন ও মূল্যবোধের দিশারী হবে।

ছেলেবেলায় কবে থেকে তিনি চিঠি লেখা শুরু করেন, কীভাবে তাঁর মাথায় আসে অ্যালিস-এর বই লেখার ভাবনা ইত্যাদি তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েও আলোচ্য বইটি হৃদয়গ্রাহী হত না যদি না এর মধ্যে প্রতিফলিত হত এক চিরন্তন প্রতিভার ব্যক্তিত্ব। বস্তুতপক্ষে, এক নিশ্বাসে এই বইটি পাঠ করার পর (অকিঞ্চিৎকর কিছু ছাপার ভুল অগ্রাহ্য করে) আমাদের লাভ এক ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্ব-আস্বাদন। চার্লস লুটউইজ ডজসনের (যিনি লুকিয়ে আছেন ল্যুইস ক্যারল নামের আড়ালে) মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আর কীভাবেই বা হতে পারে। □

পত্র লেখক ল্যুইস ক্যারল — অনির্বাণ রায় / রবিবার লেখক-শিল্পী সংঘ, কলকাতা–৩১ / ৩০.০০

দহন — ভাবানোর মতো ছবি

হাফিজুর রহমান

২৪শে জুন ১৯৯২। বৃষ্টিভেজা শহর কলকাতায় নামছে রাত। কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরছিল পলাশ ও রমিতা চৌধুরী। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন চত্বরে পাঁচজন ভদ্রমুখোশধারী যুবকের হাতে ইভটিজিং এর শিকার হয় গৃহবধূ রমিতা। স্ত্রীর সম্মান বাঁচাতে গিয়ে ইভটিজারদের হাতে অমানুষিকভাবে প্রহৃত হয় পলাশ। ভিড়ে ভরা মেট্রো স্টেশনে সবার চোখের সামনে এই অঘটন ঘটে গেলেও ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না। ব্যতিক্রম স্কুলশিক্ষিকা শ্রাবন্তী সরকার ওরফে ঝিনুক।

নিজে মহিলা হয়ে চোখের সামনে অন্য এক মহিলার অপমান দেখতে না পেরে ঝিনুক প্রতিবাদের চেষ্টা করে। মাঝরাস্তায় অটো থেকে নেমে সাহসে ভর করে একাই ইভটিজারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। নিজে মার খেলেও এলোপাথাড়ি মার দিয়ে হটিয়ে দেয় দুষ্কৃতীদের। ঝিনুকের দৃঢ়তায় রমিতাকে মোটরসাইকেলে অপহরণের অপচেষ্টা মাঠে মারা যায়, থানা পুলিশ হয়, বলতে গেলে ওর একার তৎপরতায় ধরা পড়ে অপরাধীরা। এরপরেই শুরু হয় অন্য কাহিনী।

অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে ইভটিজারদের হাত থেকে রমিতাকে বাঁচিয়ে রাত্যারাতি পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসে ঝিনুক। কাগজ থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। একটা কাগজের প্রথম পাতায় ছবিও ছাপা হয় তার। আসে পরিচিত অপরিচিতদের কাছ থেকে অজস্র অভিনন্দন। অন্যদিকে ঘরে বাইরে রসালো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে অসহায় রমিতা। সমবেদনার নামে শ্লীলতাহানির কেচ্ছা শুনতে আসে সবাই। শ্লীলতাহানির ঘটনায় বনেদি শ্বশুরবাড়ির আভিজাত্যে কালির দাগ লাগবে। তাই যেনতেন প্রকারে এই কেলেঙ্কারি ধামাচাপা পড়ুক এটাই তাদের ইচ্ছে। শুরুতে সাহসিকতার জন্য প্রশংসা পেলেও যত দিন যায় ঝিনুকের পরিবারের লোকেরাও ব্যাপারটা এড়াতে চায়। থানায় গিয়ে অপরাধীদের শনাক্ত করা, বারবার পুলিশের কাছে যাওয়া, কোর্টে ধর্না দেওয়ার ব্যাপারটা উটকো আপদ মনে হয় সবার। এজন্য পরোক্ষভাবে ঝিনুককে দায়ী করে সবাই। মুখে সেভাবে না বললেও তাদের আচরণেই ধরা পড়ে সেটা।

চাপের মুখে ঝিনুক অবিচলিত থাকলেও রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়ির বনেদিয়ানা বজায় রাখতে এত বড় অন্যায় মুখ বুজে সয়ে যেতে হয় রমিতাকে। প্রতিবাদের ইচ্ছে থাকলেও বিবেকের গলা টিপে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হয় তাকে। ঘরে বাইরে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিব্রত হয় রমিতার স্বামী পলাশ। অন্যদিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রেমিক তুনীরের কাছে পরোক্ষভাবে চাপ আসে ঝিনুককে দিয়ে কেস তুলে নেওয়ার। সবাই যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন একমাত্র ঝিনুকের লক্ষ্য স্থির। আত্মসমর্পণ না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে একলা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয় সে। প্রতিপক্ষের ঋনু উকিলের প্রস্রাবাগে জর্জরিত ঝিনুককে শেষ অবধি দুশ্চরিত্রা বদনাম নিয়ে আদালত ছাড়তে হয়। প্রমাণাভাবে অপরাধীরা বেকসুর খালাস পায়। বুকের মধ্যে একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে (হয়ত বা পরোক্ষভাবে অপরাধবোধ নিয়ে) রমিতা বিদেশে পাড়ি দেয়। হয়ত বেলাশেষে পাখির মতো নীড়ে ফিরবে অথবা ফিরবে না। ঝিনুকও স্রোতে গা ভাসাতে বাধ্য হয়। ছবির শেষে সে হাঁস্তি আছে।

সত্য ঘটনা আধারিত সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসের চিত্ররূপ ঋতুপর্ণ ঘোষের 'দহন' টালিগঞ্জের হিংলা (হিন্দি + বাংলা) বা বাংলাদেশের মোটা দাগের যাত্রা ছবির ভিড়ের মধ্যে চাঁদিফাটা গরমে এক পশলা বৃষ্টির মতো স্বস্তিদায়ক।

পরিচালকের আগের ছবি '১৯শে এপ্রিল'। মা মেয়ের সম্পর্কের টানাপোড়েনের কাহিনী। চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

'দহন'-এ ঋতুপর্ণর ক্যানভাস আরও বিস্তৃত। চার দেয়ালের বাইরেও মায়াজাল দিয়ে স্বপ্ন বুনতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তার প্রমাণ রয়েছে 'দহন' ছবির পরতে পরতে। প্রয়োজনে মূল কাহিনী থেকে সরলেও বিষয়ের কেন্দ্র থেকে সরে যাননি পরিচালক। প্রতিটি চরিত্রের নিখুঁত চিত্রণ আর যথাযথ সংলাপের যুগলবন্দীর সাহায্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিচারিতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলেছেন তিনি। মানুষ আধুনিক হলে কিভাবে তার মূল্যবোধ হারায়। কীভাবে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে। অদৃশ্য তর্জনি তুলে এই নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না যে ঠিক জায়গায় আঘাত হেনেছেন তিনি।

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা যেন তৃণসম দহে।' রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত লাইন দুটি স্মরণে আসে। নামে আধুনিক হলেও পচাগলা এই সমাজব্যবস্থায় সবাই যখন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাতে ব্যস্ত তখন এই ক্ষয়িষ্ণু সময়ের মধ্যেও স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে উঠে আসা। মনে হয় সব শেষ হয়ে যায়নি। এখনও আশা আছে। ঐতিহ্যময় কলকাতা কাপুরুষ হয়ে যায়নি। ক্লীবত্বার মধ্যেও ঝিনুকের মতো প্রতিবাদী চরিত্র মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। এটাই এ ছবির বৈশিষ্ট।

প্রকাশ্যে বিবাহিতা মহিলার শ্লীলতাহানির ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়াই হতে পারত 'দহন' ছবির মূল উপাদান। কিন্তু ঋতুপর্ণ সে পথে না হেঁটে জোর দিয়েছেন মানবিক সম্পর্কের উপর। মূল কাহিনীর সমান্তরালভাবে রমিতা আর ঝিনুকের মধ্যে এক অদৃশ্য বন্ধনের সুর বেজেছে গোটা ছবি জুড়ে। অন্যায়ের প্রতিবাদের বদলে শ্বশুরবাড়ির চুনকে আভিজাত্য বজায় রাখতে গিয়ে রমিতাকে পরোক্ষভাবে সমঝোতা করতে হয়। অপরদিকে চোখের সামনে ঘটতে থাকা শ্লীলতাহানির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় সমর্থনের বদলে ঝিনুকের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জোর করে থামিয়ে দেওয়া হয়। মন মেজাজ মানসিকতায় বিপরীত দুই মেরুর বাসিন্দা হলেও ঝিনুক আর রমিতা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে। এখানেই 'দহন'এর পরিচালক ব্যতিক্রমী কেন তার উত্তর খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। দক্ষ চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে কোলাজের বিস্তৃত ক্যানভাসে আঁকা হয় আমাদের অন্তঃসারশূন্য নপুংসক সামাজিক মূল্যবোধের বাস্তব চিত্র।

সত্যকাহিনী আধারিত এছবি রক্তশূন্যতায় ভোগা বাংলা সিনেমা জগতে এক ব্যতিক্রমী সংযোজন। '১৯শে এপ্রিল'-এ যে সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন ঋতুপর্ণ 'দহন'-এ তার পূর্ণতা এসেছে। পরিচালক হিসাবে তিনি যে আরও পরিণত হয়েছেন তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ন্যারেটিভ ছবি জুড়ে। প্রতিটি চরিত্রে শিল্পীদের অভিনয় ছবিটিকে অনামাত্রা এনে দিয়েছে। শুধু তাই নয় বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রকে দিয়ে পরিচালক যেভাবে স্বাভাবিক অভিনয় করিয়ে নিয়েছেন তাও প্রশংসার যোগ্য।

অপ্রত্যাশিত ইভটিজিংয়ের ঘটনার পর তির্যক সমালোচনার শিকার হয় পলাশ ও রমিতা। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত দুজনই স্বাভাবিক মিলনে আবদ্ধ হতে পারে না। ফলে রমিতাকে ধর্ষিতা হতে হয় পলাশের হাতে। এ দৃশ্যটি 'দহন' এর বাণিজ্যিক সাফল্যলাভের পরোক্ষ কারণ। দৃশ্যটি এক শ্রেণীর দর্শককে রিরংসায় উদ্বুদ্ধ করে। আরোপিত দৃশ্যটি না থাকলে ছবির কোনও ব্যাঘাত ঘটত না এমন সমালোচনা অনেকেই করছেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় ঘটনাটি আরোপিত নয়। মূল কাহিনীর পরিপূর্ণতায় এটি সঙ্গত দৃশ্য। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় শ্বশুরবাড়ির প্রতি চাপা ক্ষোভ উগরে পলাশ নিজেরই স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। নিছক ধর্ষণদৃশ্য হিসাবে না দেখে মধ্যবিত্ত অবক্ষয়ের প্রতীক চিত্র হিসাবে এটি মেনে নেওয়া যায়। সামান্য সময়ের জন্য দেখানো এই দৃশ্য ছবিটির বাণিজ্যিক সাফল্যের একমাত্র কারণ বলে যারা দাবি করছেন তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করলে ঋতুপর্ণর এই অনবদ্য শিল্পকর্মটির প্রতি অবিচার করা হয়।

সুখ্যাতির পর এবার ছবিটির বিচ্যুতির দিকে নজর দেওয়া যাক। ছবির শুরুতেই পর্দাজুড়ে দেখা যাচ্ছে শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে ২৪শে জুন ১৯৯২ তারিখে। কোর্টে সরকারি কৌঁসুলির মুখে শুনছি ঘটনা ঘটেছে ১৭ই মে ১৯৯২। ছবিতে দেখছি ইংরাজি খবরের কাগজে একই ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে ৩০শে জুলাই ১৯৯২। এহন সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে কোন তারিখটি সঠিক?

প্রমাণাভাবে অপরাধীরা যখন বেকসুর খালাস পাচ্ছে তখন ইংরাজি কাগজের ক্লিপিংসে সে খবরের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় জনতা দলের রেল রোকো আন্দোলন প্রথম দিনেই ভেস্তে যাবার খবর ঘলঘল করছে। এক ধাক্কায় সময়ের ব্যবধান উধাও। অন্য কোনও পরিচালক হলে ব্যাপারটা উল্লেখ না করলেও চলত। কিন্তু '১৯শে এপ্রিল'-এর পরিচালক ইতিমধ্যেই আমাদের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী করে দিয়েছেন। তাঁর হাতে এই ধরনের ডিটেলসের ভুল আশা করা যায় না।

তা সত্ত্বেও বলা যায় ঋতুপর্ণের 'দহন' আমাদের অস্বস্তি বাড়িয়ে দেয়। মূল্যবোধ সম্পর্কে বেয়াড়া প্রশ্ন তোলে। আমাদের বিবেকের গোড়া ধরে টান দেয়। আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। □

স্মরণে

গৌরী আমাদের জীবনের অন্যতম প্রধান বিস্ময়

অমিতাভ চৌধুরী

গৌরীর বিয়ের দিন সকালবেলাটা ঠিক কেমন ছিল, এখন আর স্পষ্ট মনে নেই। মেঘলা ছিল না, এইটুকু অস্পষ্ট মনে পড়ছে। ডা. এ. এম. ও ঘনির উপরের তলার এপার্টমেন্টে সিঁড়ির দিকে যে বসবার ঘরটি ছিল, সেখানে আমরা—দু'হাতের আঙুলে গোনা যায়—মাত্র কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছি বেলা এগারোটা নাগাদ। গৌরী যেমন নিরাভরণ থাকতে ভালবাসত, ঠিক তেমনই এসে একটা চেয়ারে বসে, ঠিক যেমন তার চিরকালের স্মিত মুখখানা ছিল, সেই মুখটি তুলে, চোখে শান্ত একটি হাসি মাখিয়ে আমাকে আদরের-অনুযোগের সুরে বলল, "যাক, একদিন তবু সময় মতো কোনও একটা কাজে যে এসেছ, তা দেখা গেল।" আইয়ুব বেশ পাটভাঙা পায়জামার উপরে পাঞ্জাবি পরে ঘরে ঢুকেছিলেন। গায়ে জহরকোট কিংবা একটা শাল চড়ানো ছিল, এখন আর পরিষ্কার মনে নেই। জানি আমার মনটা ভার হয়েছিল। হাসি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মুখ থেকে। সৌজন্যমূলক কথা ছাড়া আর কিছু বলতে মন সায় দিচ্ছিল না। একবার গৌরী আমার হাতে হাত রাখল।

ঘরে যে সাত-আটজন আমরা ছিলাম সকলেই অত্যন্ত নিম্ন স্বরেই কথা বলছিলাম। তবু কয়েকটি পরিচারিকার ত্রস্ততা, খাবার প্লেট, চায়ের কাপ এবং জলের গেলাসগুলি—সবাই মিলে ছোট ঘরটির মধ্যে অকারণ একটা ভিড়ের ভাব তৈরি করে দিচ্ছিল। কোথায় একটা টাইম পিস্, কিংবা দেয়াল ঘড়ি ছিল। এরই মধ্যে তার টিক্ টিক্ আওয়াজটা সবচেয়ে বড় হয়ে আমার কানে বাজছিল।

রেজিষ্টার শেষ পর্যন্ত কলমটা আমার হাতে দিলেন। বাঁধানো, মোটা রুল করা একটা খাতায় আগেই বরপক্ষের হয়ে ডা. ঘনি সই করেছিলেন। মেয়ের দিকের হয়ে গৌরীর সই-এর তলার কোনও একটা জায়গায় আমারও স্বাক্ষর পড়ল।

মনে হল, আমাদের বাড়ির সুন্দর একটি মঙ্গলঘট স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম। গৌরী দত্ত পূর্ববঙ্গের একটি অসাধারণ উচ্চমধ্যবিত্ত ঘর থেকে এসেছিল। তৎকালের কিশোরগঞ্জ মহকুমার সিঙরৈল গ্রামের ওই নাম মহকুমায়, কিংবা সেকালের প্রকাণ্ড ময়মনসিংহ জিলায় এমন লোক ছিল না যে জানত না। আমার মাতামহী ওই সিঙরৈলের দত্ত বাড়ি থেকে এসেছিলেন, যে-বাড়ির উত্তরসূরী ছিল গৌরী। গৌরীর বাবা ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত ওই বংশের চার ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠতম এবং চার জোতিষ্কের মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা জোতির্ময় নক্ষত্র। হ্যারিকেন লণ্ঠনের পীতাভ আলোয় চোখ জুড়ে আমার আগে আমার দিদিমা কত সন্ধ্যায় যে আমাকে কোলের কাছে বিছানায় নিয়ে ওই অস্পষ্ট নক্ষত্রটি দেখিয়েছেন, তাঁর মা-মরা, কোলে পিঠে করে মানুষ করা আদরের ছোট ভাইটির কথা কত হাজার বার যে শুনিয়েছেন, তা কী করে বোঝাব। আমার ছোটবেলায় ঘুমিয়ে পড়ার গল্পের সবচেয়ে বড় রাজপুত্তুর ছিলেন ধীরেন্দ্রমোহন। অদ্ভুত আদরের ডাকনাম ছিল তাঁর 'নুনু', আমার দিদিমা ছাড়া তখনই ওইটি ব্যবহার করার আর কোনও লোক ছিল না।

ধীরেন্দ্রমোহন যখন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদস্থ, ভারতবিখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক তখন আমাদের বয়স কত হবে, ছয় কিংবা সাত। তাঁর পাটনার বাড়িতে নিজের পুত্রকন্যা ছাড়া কিশোরগঞ্জ মহকুমার দূরাত্মীয় এবং দুর্ভাগা আরও চার-পাঁচটি কিশোর এবং যুবককে নিয়ে ধীরেন্দ্রমোহন এবং তাঁর নীরব সহধর্মিনী একটি 'আশ্রম'ই চালাতেন। দিদিমার কাছে ওই আশ্রমের কঠোর নিয়মাবলি, সাত্ত্বিক আহার, মেঝের উপরে কম্বলে শোওয়া, দিনে কয়েক ঘণ্টা চরখা কাটা এবং স্বাবলম্বনের দীর্ঘ প্রশিক্ষণ তালিকা একটা বিশেষ গর্বের বস্তু তো ছিলই। তদুপরি ছিল ধীরেন্দ্রমোহনের পূর্ববর্তী জীবনের সালঙ্কার বিবরণ—তাঁর জেলে বসে অর্জন করা এম.এ., প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ, ব্রিটিশরা তাঁকে কী সম্মান এবং ভয়ের চক্ষে দেখত, তিনি যে সর্বস্বত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গান্ধীর সবরমতি আশ্রমে গিয়েছিলেন— এইসব গল্পের অতিরঞ্জিত রামধনু-রঙ-মাখা, খদ্দর-পরা, জেল-খাটা রাজপুত্তুরের কথা শুনতে শুনতে আমার চোখ যখন জড়িয়ে আসত তখন অনেক সময়ই অন্য সমস্ত শব্দ স্তব্ধ করে দিয়ে টিনের চালে পূর্ববঙ্গের রাত্রির ঝমঝমানো বৃষ্টির অন্ধকার এসে দাঁড়াত।

দিদিমার কাছে শুনেছি বৃষ্টির পর সিঙরৈল একটা নাতিবৃহৎ দ্বীপে পরিণত হত। ধীরেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরেশচন্দ্র দত্তর মনোবিজ্ঞানের বই দর্শনের ছাত্রদের নাকি না পড়ে উপায় ছিল না। তাঁরই কৃতী একমাত্র সন্তান সাধন দত্ত। এখন পশ্চিমবঙ্গের সব শিক্ষিত বাঙালি বাড়িরই একটি পরিচিত ঘরোয়া নাম।

যে-সুরেশচন্দ্রের বই ছাড়া বি এ পরীক্ষার্থীরা মানসিক কৃষ্টি অর্জন করতে পারে না বলে দিদিমার মুখে শুনেছিলাম, সেই সুরেশচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ জেঠিমা এবং জ্যেঠামশাই সম্বন্ধে গৌরী একটি নিভৃত সত্য লিখে গেছে: "...তাঁর নিরন্তর সহায় ছিলেন শান্ত ধীর সদাপ্রসন্ন অধ্যাপক স্বামীটি। স্বামী-স্ত্রীতে সংসার পরিচালনা ছাড়াও জাগতিক পরমার্থিক অন্য নানা ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করছেন, একসঙ্গে কিছু পড়ছেন, এমনটা আমাদের ছেলেবেলায় খুব বেশি দেখতে পেতাম না। জ্যেঠামশাই জেঠিমা এ ব্যাপারে ব্যাতিক্রম ছিলেন। খবরের কাগজই হোক, বা সাহিত্যই হোক, কিংবা মনোবিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধই হোক, অনেক সময় তাঁরা একসঙ্গে পড়তেন, আলোচনা করতেন, আবার একই খাতায় কখনও ইনি কখনও বা উনি মনের কথা লিখে রাখতেন।"

গৌরী এক জায়গায় লিখেছে, "তাঁদের দাম্পত্য আকৈশোর আমার আদর্শ হয়ে আছে।" এই কথাটায় আমি পরে আর একবার ফিরে আসব।

সিঙরৈলের বাড়ির ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে আর একজন সুরেন্দ্রমোহন, বয়োজ্যেষ্ঠ, বিদ্যাবত্তায় কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক বিচারে কিছুই নন। কিন্তু তাঁকে সমস্ত কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহের হিন্দুসমাজ মাথায় তুলে রেখেছিল সম্মানে, শ্রদ্ধায়, আশ্রমপিতার মতো গুরুত্বে। বঙ্গীয় কায়স্থসমাজ নামক বহুপূর্বে বিলুপ্ত একটি সমাজ সংস্কারের প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-নায়ক। হিন্দু মহিলাদের, বিশেষত কায়স্থ ঘরের মেয়েদের বন্ধনমুক্তি ঘটানো, তাদের উপযুক্ত শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাঁদের ব্যায়াম শিবির প্রতিষ্ঠা করা, বালবিবাহ রোধ এবং বিধবাবিবাহে উৎসাহদান ইত্যাদি তৎকালে মহনীয় বলে বিবেচিত কর্মসূচীর পিছনে ছিটগ্রস্ত হয়ে আজীবন অসম্ভব ছুটোছুটি করে, ইস্তাহার ছাপিয়ে, দূরদূরান্তের গ্রামের স্কুলে সন্ধ্যাবেলায় হ্যারিকেন, কিংবা হ্যাজাক্ লাইটের তলায় সমবেত ছায়াপিণ্ডের মতো কয়েক শত স্ত্রী পুরুষের সম্মুখে বক্তৃতা দিয়ে এই ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়িপরা সুরেন্দ্রমোহন মাথার চুল এবং চিবুকের দাড়ি দুই-ই পাকিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থরা যেকে সেই থেকে গেল। অনেকের মতোই ঈশ্বর তাঁর প্রতি প্রসন্ন না থাকার দরুনই বোধ হয়, তাঁর দীর্ঘায়ু জীবনটা অকারণ অতিশয়োক্তির মতো ১৯৪৭ সনের বঙ্গভঙ্গ অতিক্রম করেছিল। বর্ষায় প্রসন্ন, শ্যামহিরণ্য মাখা, নদী মেখলা সিঙরৈল পরিত্যাগ করে, বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের অসমাপিকা ক্রিয়াটিকে বার্ধক্যগ্রস্ত স্মৃতির পোঁটলায় বেঁধে নিয়ে সুরেন্দ্রমোহন 'রিফিউজি' হলেন সাধন দত্তর টালিগঞ্জের বাড়িতে। স্বাস্থ্য তখন গেছে, মৃত্যু আসতে অনাবশ্যকভাবে বিলম্ব করছে, মাথার মধ্যে মৃত আশা এবং পুরাতন স্মৃতি জট পাকিয়ে সুরেন্দ্রমোহনের ক্ষুদ্রায়ত দেহ তখন অস্থিসার। কিন্তু কণ্ঠের দুর্জয় তেজ? পার্টিশান তাকে কেড়ে নেবে কী করে?

উনি এবং ধীরেন্দ্রমোহন ছিলেন রাজনীতির মানুষ। বিচারশীল, বিচারপ্রবণ তুলাদণ্ড হাতে ধরে নিষ্কম্প চিত্তে এঁরা দু'জনেই ন্যায়-অন্যায় অতি সূক্ষ্মমাত্রায় মাপতে পারতেন। সুরেন্দ্রমোহনের নৈতিক শুদ্ধাচারিতার মধ্যে গান্ধীর নীতিশাস্ত্র প্রবেশ করেনি, ধীরেন্দ্রমোহনের সমস্ত চিত্তাকর্ষটিই আবৃত ছিল গান্ধীধর্মে, গান্ধীর ন্যায় আপোষহীন সত্যপরীক্ষার সংগ্রামে। হৃদয়কে দৃঢ় এবং আশাকে নিঃস্বার্থ করার সঙ্কল্প তিনি নিয়েছিলেন প্রথম যৌবনে, বোধহয় বিংশতিবর্ষে পদার্পণের প্রায় সমসময়ে। আর কখনও ফিরে তাকাননি। সাংসারিক ক্ষুদ্রতা, সন্তানদের ভিন্নগামিতা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের নিষ্প্রভ স্বাধীনতা কিছুই তাঁকে আর বিচলিত করতে পারেনি। ব্যক্তির জীবনের যে সরল মহনীয়তা গান্ধী অর্জন করতে চেয়েছিলেন ধীরেন্দ্রমোহন সেই ব্রতকে নিজের উপবীত ও ইষ্টমন্ত্রের মতো গ্রহণ করে ক্ষমাহীন, মমতাহীন ঊষর কিন্তু সুউচ্চ একটি পর্বতের মতো ধীরেন্দ্রমোহন নিজের জীবনকে দাঁড় করালেন—আমাদের নিকটাত্মীয় পরিবার এবং সমাজমধ্যে একাধারে একটি প্রকাণ্ড আদর্শ এবং একটি অলঙ্ঘণীয় নিষেধাজ্ঞার মতো। ধীরেন্দ্রমোহন এবং তদীয় কন্যা গৌরী আমাদের জীবনের অন্যতম প্রধান বিস্ময়।

আমরা বাঙালিরা, বিশেষত আমার মতো মধ্য-চল্লিশে ম্যাট্রিক পাশ-করা ব্যক্তিরা বহু বিগ্রহ এবং বহু নৈতিকতাকেই 'পায়ের ভৃত্যের' মতো ঠেলে ফেলে দিয়েছি। নিষেধাজ্ঞার চিতাবহ্নি জ্বালিয়ে যৌবনে অনেক উত্তাপ সংগ্রহ করেছি। এই করে, কখন যে অজ্ঞাতে মনটা নীতিশিথিল, প্রশ্নসঙ্কুল, দ্বিধাগ্রস্ত, সর্বতোমুখিতার আদর্শে ডুবে গেছে তা বুঝতেও পারিনি। (এতই সে সংজ্ঞাবর্হিভূত হয়ে গেছে যে অব্যবহিত আগের বাক্যটি অনেক ভেবেচিন্তে তৈরি করতে হয়েছে।) অথচ ১৯৪২—'৫০ সালে আমি যে সঙ্কল্পের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার থেকে ধীরেন্দ্রমোহনের নীতিনিষ্ঠ জীবন এবং গৌরীর জীবনদর্শন মোটেই দূরবর্তী ছিল না। (আমার মাতামহী তাঁর মনকে বহুকাল সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছিলেন যে, আমি তাঁর কোলেকাঁখে করে মানুষ করা ভাইটারই পদাঙ্ক অনুসরণ করব।) গৌরী যখন প্রবেশিকা পাশ করে বিহারের কর্কশ মাটি থেকে সজল বঙ্গদেশে এল, তখন কার না মনে হয়েছে যে, ও নীরবে পিতার ইষ্টমন্ত্র জপ করেই ও অলক্ষে অসাধারণ তপস্বিনী হয়ে উঠবে? তখন আমি কলকাতার পাড়ায় পাড়ায়, বিশেষত বস্তি অঞ্চলে দলবল এবং চরখা কাঁধে নিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে, গান গেয়ে (ভাবতাম) দেশোদ্ধার করছি। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে শুধু আমাদের খদ্দর এবং গান্ধীচিন্তা দেখলে মনে হত আমরা তিনজন যে খুব কাছের লোক তা তো বটেই, একই সংস্কৃতির মধ্যে আমরা জীবন কাটিয়ে দেব নিঃসন্দেহে।

কিন্তু গৌরী এবং ধীরেন্দ্রমোহন ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। এদের দু'জনের কেউই মাটির তৈরি নয়। অনেক তাপে পুড়িয়ে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটাও নয়। পিতা এবং কন্যা কৈশোর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের ভিতরের উত্তপ্ত ইস্পাতকে ক্রমাগত শাণিত করে গেছেন। একদিনের জন্যও, কোনও নৈতিক প্রশ্নে, দ্বিধায় কিংবা সঙ্কটে সে ইস্পাত ভোঁতা হয়নি। ওই ইস্পাতের জন্যই গৌরী, আইয়ুবের পরিণয়বদ্ধ হল। ওই ইস্পাতের জন্যই ধীরেন্দ্রমোহন আর তার মুখদর্শন করলেন না।

অথচ কী আশ্চর্য, গৌরীকে দেখলে মনে হত সে মাতৃস্তন পরিত্যাগ করার পূর্বেই দার্শনিক মননশক্তি লাভ করেছিল। আমার এই অলৌকিক বিশ্বাসটি ঘনীভূত হল যেদিন প্রথমযৌবনে আমি আমার সমবয়স্কা মাসি গৌরীর চোখে চোখ রাখলাম। কী প্রশান্ত, উদার, মায়াভরা তার চোখ। দার্শনিক মননস্বভাব না থাকলে কারও চোখে কি ওই নিরুত্তাপ, দশমীর রাত্রির জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধতা বাসা নেয়? আরও আশ্চর্য, কত অল্প বয়সে ওর চোখে ওই নিশীথিনী আলো ঢুকে গিয়েছিল! যখন আমাদের চোখে লালসার কবিতা, চঞ্চল গদ্য এবং বিতর্কের ধূমায়িত অসন্তোষ তখন ওই স্নিগ্ধনয়না, মৃদুভাষিনী তরুণীটি তার হৃদয়ের মধ্যে একটি ছোট ইস্পাতের কারখানা তৈরি করছে। কেননা, সেটা তার পৈত্রিক সম্পত্তি।

ওই কারখানায় ইস্পাত পিটিয়ে বিবিধ নীতি ও আদর্শানুগত সিদ্ধান্ত তৈরি করা হচ্ছিল — ঠিক যেমন হয়েছিল পিতার ক্ষেত্রে, তেমনই কন্যার বেলায়ও।

আলোচ্য প্রিয়দর্শিনী কোনও দিনই প্রকাশ্যে পিতৃ মতবিরোধিতায় অবতীর্ণ হবেন, একথা অচিন্তনীয় ছিল। পরবর্তীকালে গৌরীকে দেখে মনে হয় যে, এইরূপ পিতা এবং এইরূপ কন্যার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান হয়ে যায় কী কারণে। তার কারণ, পিতার চরিত্রের এবং চারিত্রাশক্তির সে উপাসক ছিল বটে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে পিতার নীতি বা অভিমতকে অন্ধ আনুগত্য দিতে হবে, এমন মানসিকতা গৌরীর মস্তিষ্কে কদাপি স্থান পায়নি।

ধীরেন্দ্রমোহন যে-শ্রেণীর আদর্শবাদী, তাঁর পক্ষে একজন ছাত্রী এবং তদীয় শিক্ষকের মধ্যে প্রণয় এবং পরিণয় কিছুতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ধীরেন্দ্রমোহনের চারিত্রাশক্তির সামান্য পরিচয় যাঁরা রাখেন, তাঁদের কাছে বিষয়টি মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, এই ব্যাপারের পর উনি আইয়ুবকে চরম অশ্রদ্ধার এবং নিজ কন্যাকে বিপথগামিনী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। গৌরীর কাছে একথা তো অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি, কেন সে পিতার ওই অচঞ্চল নীতি অমান্য করল, তা আমি যে ওর এত কাছের লোক, আমার কাছেও কোনও দিন পরিষ্কার হয়নি। যাঁরা ধীরেন্দ্রমোহনের ঋজুতার প্রতিকৃতি দেখেননি, কিংবা তাঁর সবরমতি আশ্রমের দীক্ষার কথা জানেন না — পরিবারের ভিতরে এবং বাইরে — তাঁদের অনেকে মনে করেছেন, এই বিবাহে পারিবারিক বাধার মূল কারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাহের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত হিন্দুর সংকীর্ণ কুসংস্কার। ধীরেন্দ্রমোহন ওই শ্রেণীর সংকীর্ণতার বহু উর্ধ্বে জীবনযাপন করেছেন।

বিবাহের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আমার মন নিঃশব্দে কাঁদছিল। তার আগে পনেরো দিন গৌরীর সঙ্গে অনেক অশান্ত তর্ক-যুক্তির যুদ্ধ করেছিলাম। শেষ দিন ওই হৃদয় ঝাপটানোতে রাত ৪টে হয়ে গেল। গৌরীকে আমি বারবার বলেছিলাম, "বয়সে ২৫ বছরের পার্থক্য এ কী সোজা কথা। ২৫ ও ৫০ এর পার্থক্য যত তীক্ষ্ম, ২৫ এ — ৪৩ এ তত নয়। ৬০ এ — ৮৫তেও নয়। সোনা মাসি আমার, প্লিজ, আর একবার ভেবে দেখ।" আইয়ুবের রোগজীর্ণ শরীরে তখন সামর্থ্য এত কম যে দিনে একবারের বেশি বিছানা থেকে উঠতেও তার ভাল লাগত না। সাক্ষাতাদি ছিল নিয়ন্ত্রিত। তিনটি শক্তিক্ষয়ী নিদারুণ রোগ তখন তাঁকে প্রায় মুমূর্ষ অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ফুসফুস তো অনেক আগেই অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মাত্র একদিকে ধুক্‌পুক্‌ করছিল। "তাঁর সেবাই যদি তোমার একমাত্র কাম্য হয়, বিয়ের দরকার কী?" এই প্রশ্নটা মূর্খের মতো বার বার মনের মধ্যে আলোড়ন তুলছিল। জানতাম, তৎকালের সমাজ হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ যদিবা ঘৃণাচ্ছলে উপেক্ষা করে, অবিবাহিত দাম্পত্য মেনে নেবে না।

কিছুতেই যখন গৌরীর মন পালটানো গেল না, — সে তো ইস্পাতের তৈরি সিদ্ধান্ত, কীভাবেই বা পালটাবে — আমিই ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "ছয় মাস না ঘুরতে তুমি বিধবা হয়ে ফিরবে নিশ্চিত। তবে তাই হোক।" গৌরীর বিয়েতে পিতৃকুলের কেউ থাকবে না, আমার মন আবার তাতেও রাজি হতে চাইছিল না। ও অনুরোধ করেনি, আমি নিজেই বললাম, "তোমার পাশে থাকব।"

আজ অনস্বীকার্য ভাবে মনে আসছে যে, আইয়ুবের সহধর্মিনী ধীরেন্দ্রমোহনের সহমর্মিনী বিয়ের দিনেও ছিলেন, মৃত্যুর দিনেও ছিলেন। মাঝখানে হয়ত আরও বেশি। আর, ওই যে ওর বিয়েতে যুক্তিবাদী আমি এত আপত্তি করেও ভালবাসার আমি সাক্ষী দিতে গিয়েছিলাম, তার হয়ে বলছি, ভাগ্য ওর প্রতি কী সুপ্রসন্ন ছিল। বিয়ে না হলে এই ভুবনে ও তো সাহস করে পৃষনের মতো একটি অর্জুনকে গর্ভে ধারণ করতে পারত না।

গৌরী যে কত 'প্রাইভেসি কন্‌শাস্‌' ছিল — ব্যক্তিগত বিষয় এবং শারীরিক ব্যাপারে কথা বলা, কিংবা ছাপার অক্ষরে ওই সব বিষয় প্রকাশ করার ব্যাপারে সে যে কী শুচিতার ভক্ত ছিল — তা অনেকের কাছে অজ্ঞাত নয়। রবীন্দ্রনাথ ও

ওকাম্পোর জীবনের একাংশ যা কেতকী কুশারী আলোচনা এবং উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন, সে সম্বন্ধে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় গৌরীর লেখা একটি প্রবন্ধ বহু লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই কোমল, আত্মসম্বৃত রুচির কথা মনে রেখে এই বিবাহ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা আমি মনের মধ্যে ছিপি পরিয়ে রাখলাম। বিবাহের দিনই হবে হয়ত, বিকালে একটা চা পানের আসর বসেছিল পার্ল রোডের বাড়িতে। বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে ছিলেন। সেকথা পরে শুনেছি আইয়ুবের কাছেই। ওই উপস্থিতিতে গৌরীর চেয়ে তার স্বামীও বেশি আহ্লাদিত এবং মুখর হয়েছিলেন। ওই উৎসবে যোগ দিতে আমার মন সায় দেয়নি।

ধীরেন্দ্রমোহন ছিলেন মহীরুহের মতো, কিন্তু আকাশচুম্বী। আইয়ুবও অনেকটা সেইরূপই — প্রকাণ্ড এবং গগনাবৃত বিস্তার তাঁর। গৌরীর বাবা ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী। স্বামী কাউকে কটুকথা বলেছেন, এমন হতেই পারে না। লখনউওয়ালার খানদানি সৌজন্যের উপর শিক্ষিত বাঙালি ব্রাহ্মপনার একটা পালিশ এমনভাবে পড়েছিল যে, কোনটা আসল বর্মা কাঠের ঝিলিক, কোনটা পালিশের মাহাত্ম্য তা বুঝবার সাধ্য ছিল না। তদুপরি, ওই সময় গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, আয়তাকার, উন্নতনাসা এই বুদ্ধিজীবী মানুষটির সর্বাঙ্গে ছিল কাব্যময় একটি দূরাগত মরণের ছায়া। স্ত্রী, পুরুষ, কে তাঁর ওই 'শেলিয়ানার' মোহজাল কেটে বেরোতে পারে, বিশেষত যেহেতু ওই দেহটি ধারণ করে রেখেছিল বহু অধীতবিদ্যার প্রজ্জ্বলন্ত একটি সৌরমণ্ডল। (আমার দুইটি বাংলা উচ্চারণ আইয়ুব শুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, তাতে আমার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।)

কিন্তু একটি মহীরুহের ছায়াতলে যে তরুণীর জীবন বিপন্ন, সে সমস্ত বঙ্গদেশ খুঁজে আর একটি মহীরুহকে কেন বিবাহের জন্য নির্বাচন করল? এই প্রশ্নটির সদুত্তর গৌরী রেখে যায়নি। কাজেই একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না, সে কি আধুনিকা তরুণীর মতো আইয়ুবের প্রেমিকা হতে চেয়েছিল? অথবা, তার অন্তরের মধ্যে ছিল — জ্যোতি দত্ত লিখেছেন — মধুবনীর রাধিকা। কৃষ্ণকামনাই তার বিধাতা।

নিজের জেঠিমা সম্বন্ধে সে লিখেছে, ওই বিধিনির্দিষ্ট এবং ঐতিহ্যপন্থী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভক্তি মিশ্রিত দাম্পত্যই গৌরীর আদর্শ মনে হয়েছিল। খুব সম্ভবত এই অনুমান সত্য যে, আইয়ুবের সঙ্গে এবং তার কাছ থেকে ওই প্রকারের দাম্পত্যসুখই গৌরী লাভ করেছিল। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের প্রশ্নটি অন্য জায়গায়। নিজের বিবাহের বহু বৎসর পরে গৌরী ওই জেঠিমা-জ্যেঠামশাই-এর প্রতিকৃতিটি অন্তর দিয়ে আঁকে। এই চিত্রটি এঁকেও কি একটা সমান্তরাল দাম্পত্যের সান্ত্বনা পেতে চাইছিল? যৌবনোন্মত্ত প্রেম, আধুনিক দাম্পত্য কোনও দিনই সে মনের মধ্যে স্থান দেয়নি, এই কি সত্য? অথবা, তারুণ্যের রক্তোচ্ছল দয়িতা সে হতে পারেনি বলেই জেঠিমার দাম্পত্যজীবনকে আদর্শের পিঁড়িতে বসিয়েছিল? সুরেশচন্দ্র এবং অমিয়বালা তৎকালের বিচারে একটি স্নিগ্ধ এবং লাবণ্যময় আধুনিকতায় নিজেদের দাম্পত্য জীবন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তার দুই প্রজন্ম পরে, একজন সমাজসংস্কারক তেজিয়ান মহিলার হৃদয় ওই ধরনের দাম্পত্যকে আদর্শ বলে ঘোষণা করছে কেন?

গৌরীর জীবনের অন্যান্য বিদ্রোহ, বিপ্লব, সংস্কার ও খ্যাতি লক্ষ করলে দেখা যাবে, সম্পূর্ণই সিঙরেলের বাড়ির চরিত্রপন্থী — এই বাড়ির লোকেরা প্রত্যেকেই সঙ্কটেও মধুরভাষী, আত্মস্বার্থহানিতেও দৃঢ়মনা। তাঁরা পরহিতৈষী এবং সঙ্কল্পবদ্ধ। এই দত্তদের সকলেই সহাস্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জীবনযাপন করে গেছেন। গৌরীও। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এই প্রতিশ্রুতির বৃক্ষটি পাল্টেছে। জনকল্যাণব্রতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবনে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে, কিন্তু সকলেই ব্রতচারী জীবনে অঙ্গীকারবদ্ধ থেকেছেন। গৌরীও থেকেছে, ধীরেন্দ্রমোহনও থেকেছেন। সেই অর্থে আইয়ুবের সঙ্গে বিবাহ সত্ত্বেও গৌরীর নৌকো ছিল পিতৃকুলের ঘাটে বাঁধা। ওর রাজনীতির মধ্যে আইয়ুবের মনোভঙ্গির সাদৃশ্য যে অতি অস্পষ্ট ছিল, তা অস্বীকার করব কী করে?

সাহিত্যরসিক, বিদ্যাবত্তার প্রখর অধিকারী, দর্শনের আচার্য, অন্যতম লোকশ্রেষ্ঠ মানুষ আইয়ুবের মধ্যে দীপ্যমান দেশাত্মবোধ ছিল না, কিংবা র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্টদের চিন্তার সংস্পর্শে এসে তিনি রাজনীতির একটি ধূসর নদীকূলে এসে কিছুদিনের জন্য দাঁড়াননি, একথা কেউ বলবে না। সেই অর্থে দীপ্যমান দেশচেতনা কি বুদ্ধদেব বসু, কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তর ছিল না? তাঁরা যে অর্থে, যে সংজ্ঞায় রাজনীতি এবং দেশচেতন ছিলেন, সেই অর্থে আইয়ুবও রাজনীতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু গৌরীর দেশপ্রেম-পিপাসা ছিল তার চেয়ে বহু গুণ বেশি। গৌরী আপনাকে তাঁর দেশের জন্য উৎসর্গ করেই রেখেছিল, কিন্তু প্রথম জীবনে দাম্পত্য এবং পরবর্তীজীবনে ওই দুরারোগ্য এবং দুঃসহ অস্টিও-আরথেরাইটিসের বেড়া ডিঙিয়ে বেচারি প্রত্যক্ষ এবং সংঘর্ষমূলক রাজনীতির ময়দানে পৌঁছতে পারল না। তথাপি, ১৯৭৫–'৭৬ এ ভারতীয় এমারজেন্সির অমাবস্যার বৎসরটিতে যাঁরা গৌরীকে কলকাতায় সহযোদ্ধা হিসাবে পেয়েছেন — যেমন, গৌরকিশোর ঘোষ ও তদীয় পত্নী শীলা, অথবা জ্যোতির্ময় দত্ত ইত্যাদি — তাঁরা জানেন রাজনীতির ব্যাপারে গৌরী ছিল প্রত্যক্ষবাদী, কর্মিষ্ঠ এবং এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ যারা 'নামে' ঢেউ ভরা সমুদ্রে অনিবার্য তাড়নায়। এবিষয়ে অধ্যাপক এবং তাঁর সেবিকা ছিলেন দুই ভিন্ন জগতের মানুষ।

গৌরী কতটা আইয়ুবের সংস্কৃতির সাধিকা হয়ে উঠেছিল, কতটা তাঁর প্রিয়সখী, চিন্তার বান্ধবী, অথবা কতটা সে ছিল ওই উপভোগ্য আইয়ুব-কৃষ্টির একজন উচ্চশ্রেণীর সমঝদার ভোক্তা মাত্র তা বলা কঠিন। জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে ও যে সমাজহিতৈষণায় প্রত্যক্ষকর্মী হয়ে রাস্তায় নেমেছিল, তাতে একটা বিষয় সুস্পষ্ট। ওই নীলগঞ্জ স্টেশন থেকে নেমে, কোনও এক ধানভরা খালপথে, শ্যাওলা ও শামুকের জলেভাসা জঙ্গল পেরিয়ে ও যেতে চেয়েছিল সিঙবৈলের পাটে। ওখানে তালগাছওড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাটে নিশীথিনীর ছায়ায় কে জানি পুরুষকণ্ঠে গৌরীকে ডেকেছিল সেদিন: "আবার এসেছ ফিরে?" □

মহিমময়ী পরমাত্মীয়া

গৌরী আইয়ুব

অমিয়া দেবী (জন্ম: ১০ শ্রাবণ ১৩০৬ □মৃত্যু: ২০ আষাঢ় ১৩৮২) ছিলেন গৌরী আইয়ুবের জেঠিমা। জ্যাঠামশাইয়ের নাম অধ্যাপক সুরেশমোহন দত্ত। এই জেঠিমা এবং জ্যাঠামশাইয়ের একমাত্র পুত্র সাধন দত্ত বর্তমানে বাংলার বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে অন্যতম। গৌরী আইয়ুব তাঁর প্রিয় জেঠিমার মৃত্যু উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে যে রচনাটি লিখেছিলেন সেটি একটি পারিবারিক স্মৃতি আলেখ্যে গ্রন্থিত হলেও এখনও পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এই শ্রদ্ধাঞ্জলি মূলত পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত হলেও গৌরী আইয়ুবের মানসিক বিকাশের পটভূমি বোঝার ক্ষেত্রে রচনাটি বিশেষ সহায়ক। রচনাটি শ্রী অমিতাভ চৌধুরীর (শ্রীনিরপেক্ষ) সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—সম্পাদক

মৃত্যু যে দূরত্ব সৃষ্টি করে তার ফলে একটি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দেখা সহজ হয়। চিরদিনের চেনা মানুষটিই যখন ঢেউয়ের এক ধাক্কায় অনেক দূরে সরে যান তখন যেন একটা বিরাট পটভূমিকার মাঝখানে একেবারে পরিপূর্ণ করে দেখতে পাই তাঁর চেহারাটি। তেমন করেই দেখতে বসে জেঠিমার ব্যক্তিত্বের কত দিকই না চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আজ। তবে দুহিতা জায়া জননীর নানা ভূমিকার ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে প্রকাশটি আমার চোখে ধরা পড়েছে তা এক বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয়বতী মহিলার। মহিলাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে সাধারণত কেউ মাথা ঘামান না। বুদ্ধির প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেই সব মহিলাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নয় যাঁরা একান্তই গৃহবদ্ধ। তাছাড়া এমনতর একটা কথা অনেকে মেনেও নিয়েছেন যে সংসারের পরিচালনায় হৃদয়াবেগই যথেষ্ট, বুদ্ধি একটা অবাঞ্ছিত উপসর্গ। পুরুষ বুদ্ধি দিয়ে যতটা বোঝে নারী হৃদয় দিয়েই নাকি তা অনুভব করতে পারে। তাই তীক্ষ্ণধী মহিলাদের কেউ কেউ যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলেই মনে করেন। কিন্তু সেটা বোধ হয় ঠিক নয়।

বুদ্ধি আর হৃদয়ের সুষম মিলন হয় যে মানুষে তিনি নারীই হন আর পুরুষই হন, তাঁকে শ্রদ্ধা না করে, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে থাকা যায় না। আমাদের জেঠিমা এই ধরনের মানুষ ছিলেন। তাঁর হৃদয়ের প্রাচুর্যের ভিতর দিয়েও বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পেত। যে বুদ্ধি অপরকে আঘাত করতে সুতৎপর, যে বুদ্ধি নিজের স্বার্থরক্ষায় তৎপর, যার প্রাখর্য্য ভীতির সৃষ্টি করে, এ সে বুদ্ধি নয়। বরং যে বুদ্ধি পরের দুর্বলতাকে সস্নেহে গোপন করত পারে, যে বুদ্ধি সযত্নে আপনপর সকলকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যে বুদ্ধি পরের স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ বলে আভাসিত করতে যত্নশীল, এই মহিলা সেই বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন। কত সময়ে তাই লক্ষ করেছি যে কারুর জন্য কিছু করে, বা অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেও এমন ভাব করেছেন যেন বা তিনি নিজেই উপকৃত হলেন, ধন্য হলেন। ফলে সত্যিই যে উপকৃত হল তার মনেও কিন্তু কোনও দীনতার প্রকাশ হল না। হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে বুদ্ধি যখন যথাপথে পরিচালিত করে তখনই এমনটা সম্ভব হয়।

জেঠিমার প্রাতিষ্ঠানিক বা অ্যাকাডেমিক শিক্ষাদীক্ষা বেশি দূর নয়। কিন্তু বুদ্ধি ও আগ্রহের প্রাচুর্যে তাঁর জানবার বুঝবার প্রয়াস ছিল অসাধারণ। এ বিষয়ে নিরন্তর সহায় ছিলেন শান্ত ধীর সদাপ্রসন্ন অধ্যাপক স্বামীটি। স্বামী-স্ত্রীতে সংসার পরিচালনা ছাড়াও জাগতিক পারমার্থিক অন্য নানা ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করছেন, একসঙ্গে কিছু পড়ছেন, এমনটা আমাদের ছেলেবেলায়

খুব বেশি দেখতে পেতাম না। জ্যাঠামশাই জেঠিমা এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিলেন। খবরের কাগজই হোক, বা সাহিত্যই হোক, কিংবা মনোবিজ্ঞান বিষয়ে কোনও প্রবন্ধই হোক, অনেক সময় তাঁরা একসঙ্গে পড়তেনও, আলোচনা করতেন; আবার একই খাতায় কখনও ইনি কখনও বা উনি মনের কথা লিখে রাখতেন। কিশোর বয়সে যখন এসব দেখতাম তখন খুব অনুপ্রাণিত বোধ করতাম, আজ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসেও সে কথা স্মরণ করে মন আবেগে সঞ্জীবিত হচ্ছে। একথাও স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে যে আমাদের জ্যাঠামশাই সে জাতীয় পুরুষ ছিলেন না যাঁরা স্ত্রীবুদ্ধিকে সন্দেহ করা বা অবজ্ঞা করাকেই পৌরুষ প্রকাশের মোক্ষম উপায় জ্ঞান করতেন। সঙ্গেহে সযত্নে স্ত্রীকে সখী সচিব প্রিয়শিষ্যা করে তুলতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁদের দাম্পত্য আকৈশোর আমার আদর্শ হয়ে আছে।

জ্যাঠামশাই যখন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী, কথাটি পর্যন্ত ভাল করে বলতে পারেন না, তখন দেখেছি কিভাবে দিবারাত্র জেঠিমা তাঁর পরিচর্যা করেছেন। আত্মীয় পরিজন ছাড়াও পরিচারক পরিচারিকার তো অভাব ছিল না, কিন্তু একদিনের জন্যও জেঠিমা তখন বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাননি। রাত্রেও ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্বামীর সেবা করেছেন। এত পরিশ্রম অল্প বয়সে যদি বা সহ্য হয়, ওই বয়সে উনি কি করে এত করছেন তা ভেবে আমি বিস্ময় বোধ করতাম। তখন তাঁর বয়স নিশ্চয়ই পঁয়ষট্টি পার হয়ে গেছে। এক সময়ে দেখলাম শারীরিক দুর্বলতার জন্য ঘাড়টা সোজা করে তুলতে পারছেন না, তারও চিকিৎসা করাতে হল। কিন্তু ওইটুকু ছোটখাটো মানুষের মনের জোর ছিল অপরিসীম। তাই শেষদিন পর্যন্ত স্বামীর সেবা করতে পেরেছেন স্বহস্তে। সহায়িকার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতে রাজি হননি নিজে। দীর্ঘদিনব্যাপী এই কঠিন কর্তব্যের ধৈর্য হারাননি।

আত্মীয় পরিজন অতিথিসজ্জন চিরকাল তাঁর সংসার ঘিরে রেখেছেন। দেহে সৌজন্যে পরিচর্যায় যে শুধু আকৃষ্ট করেছেন সকলকে তাই নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা চৌম্বকশক্তি ছিল। তা ছাড়াও ছিল একটি পরিশীলিত স্বচ্ছ দৃষ্টি। কখনও কখনও সবিস্ময়ে লক্ষ করেছি যে তাঁর কনিষ্ঠরাও যে সব সংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করতে পারেননি তিনি তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধির গুণে সে সব থেকে আশ্চর্যভাবে মুক্ত করে ফেলেছেন মনকে। পুতুলের মতো ছোট্ট একটি মানুষটির গুণগ্রাহীর বৃত্ত কিন্তু ছিল মস্ত বড়। একেক জনকে বলতে শুনেছি, "ওঁকে একবারই দেখেছি, কিন্তু কী সুন্দর মানুষ, ভোলা যায় না!" হাওড়ায় গঙ্গার ধারে একটি পরিসর কোয়ার্টারে যখন থাকতেন, প্রায়ই তখন অনেকে তাঁদের কাছে যেতেন সারাদিন কাটাতে। তখন দেখতাম কি অক্লান্ত পরিশ্রমে কত সুখাদ্য তৈরি করতেন মাতা ও জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁদের কোনও ক্লান্তি বা বিরক্তি দেখতাম না। আমরা কত সহজেই অতিথিদের সময়জ্ঞানহীনতায় বিরক্ত হই, ক্লান্ত বোধ করি। উনি কখনও করতেন না। আবার রান্নার ব্যাপারে জেঠিমার উদ্ভাবনীশক্তির খুব প্রকাশ হত। গতানুগতিক রান্নাতেই এটা সেটা যোগ করে কেমন অপূর্ব করে ফেলতেন। ইদানীং অবশ্য তাঁর স্বাস্থ্যও তেমন ছিল না, তা ছাড়া সুনিপুণা পুত্রবধূর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তও ছিলেন তাই তাঁর সেই চারদিকে সব ছড়িয়ে মাঝখানে মোড়ায় বসে রান্না করার চেহারাটি আর দেখতে পেতাম না। কিন্তু এক মাস আগেও, যেদিন বিকালে তাঁর ই সি জি করার কথা হল, সেদিনও সকালে বুকে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ রেখেছেন যে যাঁরা তাঁকে দেখতে এসেছেন তাঁদের আপ্যায়নের ত্রুটি ঘটল না তো। যখন তিনি চৈতন্য-অচৈতন্যের দোলায় দুলছেন, কণ্ঠ ক্ষীণ অস্পষ্ট হয়েছে, তখনও একটু সচেতন হলেই খোঁজ নিয়েছেন কে এল, তার যাবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা আছে কিনা।

বলার কথা এত আছে যে শেষ করা সহজ নয়। একটুখানি ব্যক্তিগত কথা বলে শেষ করব। বছরখানেক আগে একদিন বলছিলেন, "তোমার ছেলেবেলার একদিনের চিৎকার এখনও আমার কানে আসে।" অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলাম কিসের জন্য চিৎকার। বলেছিলেন, আমার ছোট ভাই বিজুর জন্ম হয় গৌহাটিতে ওঁর কাছে। তখন আমার বয়স দেড় বছরও হয়নি। আমাকে জেঠিমাই দেখাশোনা করতেন, আমি সারাদিন ওঁর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করতাম। কয়েক মাস পর যেদিন আমরা গৌহাটি থেকে পাটনা ফিরব সেদিন জেঠিমা আমাকে কোলে করে নাকি পাড়ু পর্যন্ত এসেছিলেন স্টীমারে তুলে দিতে। স্টীমার ছাড়বার ঠিক আগে আমাকে কোল থেকে নামিয়ে মার কাছে দিতে যেতেই আমি নাকি তীক্ষ্ণ চিৎকারে চতুর্দিক সচকিত করেছিলাম এবং স্টীমার থেকে নামতে নামতে সে চিৎকার শুনে তাঁর চোখে জল এসেছিল। আজ আমাদের জীবনের তরণী চলেছে এগিয়ে, তিনি স্তব্ধ মধ্যরাত্রে কোন তীরে এককাকী নেমে মিলিয়ে গেছেন কোন অন্ধকারে। কিন্তু চির-বিচ্ছেদের দুঃখ আর তো তেমন চিৎকার হয়ে বার হয়ে আসে না; চোখ শুধু সজল হয় তাঁর অসংখ্য স্মৃতিতে।

পৃথিবীর সব মন্দির মসজিদ গির্জা থেকে নিজেকে আমি নির্বাসিত করেছি অনায়াসে। মাথা নত করবার মতো কোনও দেবতা তো পাই না কোনও দেবালয়ে। বরং আমার পথের ধারেই এসে দাঁড়িয়েছেন কিছু প্রণম্য মানুষ। তাঁদের পায়ে মাথা রেখে আমি শান্তি পাই। আমাদের এই পরমাত্মীয় তাঁদেরই একজন। □

আত্মবিশ্বাসে সহজ

শঙ্খ ঘোষ

১৯৫৩ সালের বসন্তোৎসবের সময়ে শান্তিনিকেতনে তিনদিনের এক সাহিত্যমেলার আয়োজন হয়েছিল। স্বাধীনতার পর পাঁচ বছর জুড়ে এ-বাংলায় ও-বাংলায় কেমন সাহিত্যচর্চা হল, তারই একটা হিসাব নেবার জন্য সেই মেলা, সেই সম্মেলন। এর পরিকল্পনার বা এর আয়োজনের মূলে নিশ্চয় ছিলেন প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত মানুষেরাই, কিন্তু এর প্রত্যক্ষ কর্মভার এসে পড়েছিল দুটি যুবকযুবতীর উপর। ওই তিনদিনে সেই দুজনকে দেখা যেত সবসময়েই, সভায় আর সভার বাইরে, আমন্ত্রিত অভ্যাগত লেখকদের তত্ত্বাবধানে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা নরেশ গুহদের মতো সেই সময়কার কয়েকজন তরুণকে নিয়ে গোটা শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখাবার, কখনও নন্দলাল কখনও রামকিঙ্করের মুখোমুখি করে দেবার, আপ্তমিক আতিথ্যের একটা আবহাওয়া তৈরি করে তুলবার যেন সন্তর্পণ একটা দায়িত্বে ছিলেন সেই দুজন। দুজনের একজন নিমাই চট্টোপাধ্যায়, আর অন্যজন গৌরী দত্ত, উত্তরকালের গৌরী আইয়ুব।

আমার চেয়ে ঠিক এক বছরের বড় সেই গৌরীদির চলাফেরা বা কথাবার্তার সেদিনকার রূপটা আজও মনের মধ্যে যেন স্থির হয়ে আছে। অনেক মানুষকেই দেখেছিলাম সেই তিনদিনে, অনেক ঘটনাই ঘটেছিল তখন। কিন্তু সবই কি আর তেমনভাবে বেঁচে আছে মনে? সাইকেল ধরে হেঁটে যাওয়া গৌরীদির ছবিটা তবু যে রয়ে গেছে এইভাবে, তার নিশ্চয় কারণ ছিল কিছু। ঠিক সেই সময়েই যে তেমন কোনও কারণের বিশ্লেষণ করে ভেবেছি তা নয়। পরে মনে হয়েছে, একই সঙ্গে শান্ত আর দীপ্ত এ-রকম ব্যক্তিত্ব বড় সুলভ নয়, সুলভ নয় বুদ্ধিতে সংস্কৃতিতে সুরুচিতে কমনীয় এক স্বচ্ছ কোনও মুখশ্রী। কমল-হীরের পাথর থেকে যে আলো এসে পৌঁছবার কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই আলোর যেন আভাস ছিল সেদিনকার সেই কর্মসচল স্মিতমুখ মেয়েটির মধ্যে।

প্রথম দেখার পরে এই পঁয়তাল্লিশ বছরের যে সময়টা কেটে গেল, তার মধ্যে আরও বেশ কয়েকবার তাঁকে দেখবার, তাঁর কথা শুনবার সুযোগ হয়েছে আমার, আরও অনেকের মতো; আর এই সময়টা জুড়ে প্রথম দিনের সেই জানাটাই সত্যতর হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। সেই বসন্তোৎসবে দেখেছিলাম কত সহজে তিনি চাপা পরিহাসও করতে পারেন, আবার পরের মুহূর্তেই সে সহজতা নিয়ে ঘুরে যেতে পারেন শিল্পরহস্যের কোনও আলোচনায়। পরে একদিন বুঝতে পেরেছি এই সহজের ভিত্তি হল তাঁর মস্ত বড় এক আত্মবিশ্বাস, আর সেইসঙ্গে এক মর্যাদাবোধ। গৌরী দত্ত ততদিনে গৌরী আইয়ুব নামে সংস্কৃতিজগতে সর্বপরিচিত এক নাম; তাঁর সমাজ-সংগঠনের কাজে, সম্প্রদায়-সম্প্রীতির কাজে, তারও চেয়ে বেশি হয়ত আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো একজন মানুষকে এক শান্ত নির্ভরতা দেবার কাজে তাঁকে প্রায় মহিমময়ী মনে হচ্ছে তখন। আইয়ুবের কাছে আমরা কেউ কেউ যখন গিয়েছি কোনও সময়ে — চিরকৃণ্ণ আইয়ুবের কাছে — আমাদের জায়গা মতো এগিয়ে দিয়ে গৌরী আইয়ুব তখন প্রায়ই থেকেছেন পটভূমিকায় প্রচ্ছন্ন, যেন আমাদের সংলাপের মধ্যে কোনও অন্তরায় তৈরি করবেন না। অথচ ওরই মধ্যে, ধীর পায়ে শুশ্রূষার্থে কখনও কখনও এসে, একটি দুটি কথার খেই ধরিয়ে দিয়ে, একটি দুটি চকিত প্রশ্ন বা মন্তব্যের মধ্য দিয়ে, উন্মোচন করে দিয়েছেন তাঁর নিজস্ব মননের ইঙ্গিত। এমনই ভঙ্গিতে বলেছেন সেসব কথা, যেন তিনি এই আলোচনার মধ্যে নেই, যেন তিনি নিছক একজন শ্রোতাই মাত্র।

কোনও কোনও মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সহজেই একটা স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ আসে। গৌরী আইয়ুব ছিলেন তেমন একজন মানুষ। দিনযাপনের মধ্যে প্রায়ই তো আমরা বিপর্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করি? আমাদের সমাজজীবনের মধ্যে চাপা একটা হিংস্রতা তো আছে? ক্ষমতার প্রতি ধারমান উন্মুখতা আছে সেখানে, সমযোগিতার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিযোগিতার উন্মাদনা আছে সেখানে। আর সামগ্রিক এই অবস্থানের চাপে কেবলই আমরা ক্রুদ্ধ অথবা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি, দমিত অথবা আক্রান্ত বোধ করি কেবলই। এ-রকম সব অনুভবের সময়ে, এর একেবারে বিপ্রতীপে পাঁচ নম্বর পার্ল রোডের বাড়িতে পৌঁছলে মাথার মধ্যে একটা শান্তি নেমে আসত মনে হয়। সে কেবল আবু সয়ীদ আইয়ুবের জন্যেই নয়, গৌরী আইয়ুবের জন্যেও। যখনই তাঁকে দেখেছি বা কথা বলেছি তাঁর সঙ্গে, তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডলে তখন লেগে থেকেছে একটা হাসির আভা, মৃদু উচ্চারিত তাঁর নিরভিমান কথাগুলির মধ্যে

থেকে গেছে একটা সযত্ন সহমর্মিতা, যুক্তিময় তাঁর চিন্তার মধ্যে একটা সত্যবোধের অভিমুখিতা। সমস্তটা মিলিয়ে তাঁর সেই স্নিগ্ধ আত্মস্থতার অল্প সামীপ্য পেলেও, এমনকী কখনও কখনও দূরভাষণে কয়েকটি কথা শুনতে পেলেও, জীবন বিষয়ে যেন একটা ভরসা ফিরে আসত মনে হয়।

গৌরীদি এখন আর নেই। কিন্তু তিনি যে ছিলেন, আমাদের এই সমাজে তাঁর মতো একজন মানুষের অস্তিত্ব যে সম্ভব হয়েছিল, এই ভাবনাটাই আরও অনেকদিন সে-ভরসা জাগিয়ে রাখতে পারে আমাদের মনে, জাগিয়ে রাখতে পারে বসন্তোৎসবের অর্জিত এই বিশ্বাস যে জীবনটা শিল্পরূপময়। □

গৌরীদিকে যেমন বুঝেছি

আবদুর রউফ

গৌরী আইয়ুবের কথা মনে হলেই যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের চিত্তে যে ভাবের উদয় হয় তার নাম শ্রদ্ধা। এটাই প্রমাণ তিনি বড় মাপের মানুষ ছিলেন। অথচ তাঁর এই 'বড়ত্ব' বা 'বিরাটত্ব' আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছুই ছিল না। তিনি সাধারণ বাঙালি রমণীদের তুলনায় উচ্চতায় কিঞ্চিৎ খাটোই ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির বহর তাঁর এমন কিছু ছিল না। চাকরিও করেছেন খুব সাধারণ মাপেরই। কিছু কিছু অনবদ্য প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি লিখে থাকলেও সেসবের পরিমাণ এত বেশি নয় যার জোরে তাঁকে একজন খ্যাতিমান বড় লেখিকা হিসাবে গণ্য করা যায়। অর্থনৈতিক বিচারেও তিনি ছিলেন নিতান্তই সাধারণ মধ্যবিত্ত গোত্রের মানুষ। এসব দিক থেকে বিচার করলে তাঁকে 'বড়লোক' বলার কোনও উপায় নেই।

কেউ কেউ তাঁকে সমাজসেবিকা এবং সমাজসংস্কারক হিসাবে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন। আমার ধারণা, তাঁর সামনে কেউ তাঁকে এধরনের বিশেষণে বিশেষিত করতে চাইলে তিনি ঘোরতর আপত্তি জানাতেন। আমি কেন এমন কথা বলছি তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝবেন। তাঁর বহু আন্তরিক প্রয়াসকেই সমাজসেবামূলক কিংবা সমাজসংস্কারমূলক বলা যায় ঠিকই, কিন্তু সমাজসেবী কিংবা সমাজসংস্কারক হয়ে ওঠার বাসনা থেকে এসব কাজ তিনি কখনওই করেননি। বিশেষ করে সমাজসেবা তো ইদানীংকালে একটি পেশার নাম। পেশাদার সমাজসেবীদের সঙ্গে সমগোত্রীয় করতে না চাইলেও এধরনের বিশেষণের দ্বারা তাঁর মহত্ত্বকে ছোট করে ফেলা হয়।

দুঃস্থ মানুষের সেবামূলক কাজ তিনি যা কিছু করেছেন, সবই করেছেন গভীর হৃদয়বত্তার কারণে। ইদানীংকালে সংসারে সচরাচর যা দেখা যায় না সেই দুর্লভ হৃদয়বত্তার অধিকারী হওয়ার কারণেই দুঃস্থ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম দরদ। এই দরদবোধের তাড়না থেকেই তিনি তাঁর পরিচিত, অর্ধপরিচিত, এমনকী অপরিচিত মানুষদের ও যাঁরাই তাঁর সামিধ্যে এসে হাজির হত তাঁদের দুঃখ লাঘবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভেবে দেখার প্রয়োজনই বোধ করতেন না। আর্ত মানুষ তাদের বেদনার কাহিনী তাঁকে শুনিয়েও শান্তি পেত। অসীম ধৈর্য সহকারে তিনি শুনতেন সেসব কথা। নিজের জরুরি কাজকর্ম পণ্ড করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু নিজের দরদি মনের সাহচর্য দিয়েই তিনি অনেকের হৃদয়ের ভার লাঘব করতেন। এতে তাঁর কোনও ক্লান্তি ছিল না। আমরা নিজেরাও তাঁর এই দরদি মনের দাক্ষিণ্য পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেছি। দরদি অন্তঃকরণের কারণেই তিনি ছিলেন অসাধারণ স্নেহময়ী। তাঁর স্নেহের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে গেছেন বহুমানুষ। সেসব স্পর্শ দুর্লভ স্মৃতি। তাঁর এই দরদি অন্তঃকরণের কারণেই আর পাঁচজন হিসেবি সমাজসেবীদের তুলনায় অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন।

গৌরী আইয়ুবের এই অপরিসীম স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রখর যুক্তিবাদী মানসিকতা। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি স্নেহার্দ্র হয়ে যে মানসিকতাকে তিনি কোনও সময়েই বিসর্জন দেননি। ফলে অতি নিকটজনের, পরম আত্মীয়ের কিংবা বন্ধুজনের অযৌক্তিক বক্তব্য কিংবা মতবাদের একদেশদর্শিতা খণ্ডনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিরলস তার্কিক। তাঁর তর্কে উগ্রতা থাকত না, অন্যের বক্তব্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও তাচ্ছিল্য থাকত না। কিন্তু সেই বক্তব্যের অযৌক্তিক দিকগুলি তিনি অত্যন্ত নম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে নস্যাৎ করে দিতেন। এই নম্রতার কারণেই তাঁর তর্কপূর্ণ প্রবন্ধগুলির মধ্যে দেখা দিত অসাধারণ এক প্রসাদগুণ যা পাঠককে আকর্ষণ করত। মূলত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলিই যেহেতু ছিল তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, তাই কখনও কখনও মনে হওয়াই স্বাভাবিক,

তিনি বোধ করি সমাজসংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি সত্যিই সেরকম কোনও ভূমিকা নেওয়ার বাসনা গৌরী আইয়ুবের আদপেই ছিল না। আসলে তিনি চাইতেন সবার মধ্যেই যুক্তিবাদী মননশীলতা গড়ে উঠুক — তারপর যা হওয়ার আপনিই হবে। এই যুক্তিবাদী মননশীলতা গড়ে তোলার প্রয়োজনে তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মীয় এবং সামাজিক ধ্যান-ধারণায় যেসব যুক্তিহীনতা এবং অমানবিকতা রয়েছে সেগুলিকে সমালোচনার বিষয়বস্তু করে তুলতেন। এই সমালোচনা সামনাসামনি বিতর্কে কিংবা লেখালিখিতে যেভাবেই প্রকাশ পাক, সব সময়েই তাতে তাঁর মানববাদী দরদি হৃদয়ের স্পর্শ লেগে থাকত।

এ ধরনের সমালোচনার প্রশ্নে মুসলমানদের সংখ্যালঘুসুলভ মানসিকতার স্পর্শকাতরতা তিনি বুঝতেন। যে কারণে ধর্মীয় ব্যাপারে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার পক্ষপাতী মুসলমানরাও তাঁর সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার অবকাশ পেতেন না। তাঁরা বুঝতেন গৌরী আইয়ুবের সমালোচনায় তাঁদেরও বক্তব্য অনুধাবন করার আন্তরিক প্রয়াসে কোনও ঘাটতি থাকত না। ফলে তাঁর সমালোচনা ছিল অনেক বেশি কার্যকরী। বিশেষ করে তাঁর সংস্পর্শে আসা মুসলিম তরুণদের মধ্যে যুক্তিবাদী মননশীলতা বিকশিত করার প্রশ্নে এই সমালোচনার প্রভাব ছিল অমোঘ। তার ফলে এই পশ্চাদপদ সমাজে সংস্কার কিছু ঘটে থাকলে সেটা ঘটেছে উল্লেখিত মননশীলতার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে। এর জন্য গৌরী আইয়ুবকে সমাজসংস্কারক হিসাবে বড় করে দেখাতে চাইলে তিনি যে-বিশেষণ কখনওই গ্রহণ করতে সম্মত হতেন না সেটাই তাঁর উপর আরোপ করা হয়।

সমাজসংস্কারক হতে না চাইলেও দুঃস্থ মানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রশ্নে তাঁর কখনওই আগ্রহের অভাব ঘটেনি। সেই ১৯৬৪ সালের বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় থেকে তাঁকে এই ভূমিকায় অক্লান্ত এবং অবিচল থাকতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই সময় মৈত্রেয়ী দেবীর সহযোগী হিসাবে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী সম্প্রসারণ সমিতির কাজে তাঁর সুগভীর নিষ্ঠা ছিল আমাদের কাছে প্রেরণার বস্তু। বস্তুত আমাদের ছাত্রাবস্থায় উল্লেখিত সমিতির কাজের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শ আমাদের এমনভাবে অভিভূত করে যে তাঁকে নিতান্ত আপনজন ছাড়া আমরা অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। আমাদের তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করার ভাষা আমার আয়ত্তে নেই। ভয়াবহ দাঙ্গার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় আমরা তখন বিহ্বল এবং দিশেহারা। সেই দুঃসময় দিনগুলিতে গৌরীদির মতো পরম আপনজনের স্নেহস্পর্শে আমাদের হৃদয়ের ভার অনেকখানি লাঘব হয়ে গিয়েছিল। সম্বোধনে দিদি বললেও আমরা তাঁকে মাতৃস্বরূপিনী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনি।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময় মৈত্রেয়ী দেবীর সহযোগী হিসাবে অনাথ বালকবালিকাদের লালনপালনে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তাতেও আমরা তাঁকে পেয়েছি আর্ত মানবতার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ জননী রূপেই। কেবলমাত্র অনাথ বালক-বালিকারাই নয়, যে-কোনও আর্ত মানুষ যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে তারা সবাই তাঁকে পেয়েছে কল্যাণময়ী জননী রূপে। এরকম কল্যাণময়ী জননীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাঁর নিজের সময় বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। যেসব লেখা তিনি চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর লিখে শেষ করবেন বলে ভেবেছিলেন সেসব করে ওঠার আর সময় পাননি। যতখানি সময় পেয়েছেন তার অধিকাংশই ব্যয় করেছেন তাঁর সংস্পর্শে আসা আর্ত অভাবগ্রস্ত, সমস্যাপীড়িত মানুষদের সেবায়, তাদের ব্যথা-বেদনা লাঘব করার কাজে। জীবনের শেষ দিকটায় এটাই হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ্য ভূমিকা। তাই তাঁর অনুরাগীদের কেউ কেউ তাঁকে একজন বড় লেখিকা হিসাবে না পাওয়ার কারণে বেদনা অনুভব করেছেন। কারণ, একজন বড়মাপের লেখিকা হয়ে ওঠার জন্য যে ধরনের যোগ্যতা এবং উপকরণের প্রয়োজন হয় সেসব তাঁর প্রভূত পরিমাণেই ছিল। কিন্তু যাঁরা তাঁকে মহৎহৃদয় জননীরূপে পেয়েছেন, যাঁরা তাঁর কল্যাণময়ী রূপের দীপ্তি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাই জানেন যে কোনও খ্যাতি-প্রতিপত্তির অধিকারী লেখক কিংবা বুদ্ধিজীবীর তুলনায় তিনি কতখানি উঁচুদরের মানুষ ছিলেন।

অত্যন্ত উঁচুদরের মানুষ ছিলেন বলেই খ্যাতির মোহ বা যশোলিপ্সা তাঁকে কোনও দিনই পেয়ে বসেনি। নিজের কাজকর্ম প্রসঙ্গে পরিকল্পিতভাবে যে ধরনের ভূমিকা নিলে মানুষের নাম দ্রুত সবার নজরে আসে তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে সেগুলি এড়িয়ে চলতেন। আকাশবাণী, দূরদর্শন, খবরের কাগজ ইত্যাদি সংবাদমাধ্যমগুলিকে তিনি যশ অর্জনের জন্য কখনওই ব্যবহার করার কথা ভাবেননি। কোনও কোনও ইস্যুতে নিজের অত্যন্ত ন্যায্য বক্তব্য তুলে ধরার জন্য তিনি এসবের সহায়তা নিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সংবাদমাধ্যমগুলিকে তার বেশি পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন তিনি কখনও অনুভব করেননি। তিনি নিজে প্রচার না চাইলেও কোনও কোনও বহুলপ্রচারিত পত্রিকা কিংবা টেলিভিশনের বিশেষ বিভাগ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে গৌরী আইয়ুবকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনার জন্য কখনও কখনও তৎপরতা দেখিয়েছে। কিন্তু কোনও কোনও সময় তাদের অসৌজন্যমূলক আচরণে তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হত। নির্দিষ্ট সময় পূর্ব-নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও এইসব মিডিয়ার লোক অসময়ে

এলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। বলতেন, 'এরা হয়ত ধরে নিয়েছে, ব্যক্তিবিশেষকে প্রচারের আলোয় এনে ফেলার ক্ষমতা যেহেতু এদের আছে তাই কৃতার্থ বোধ না করে এদের অসৌজন্যমূলক আচরণে ক্ষুব্ধ হওয়ার অধিকার কারও নেই। কিন্তু এমন মানুষও যে আছে যারা প্রচার পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে নেই, কৃতার্থও হতে চায় না — সেটা এদের বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।' সত্যি সত্যি তিনি যে সেটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন এমন অন্তত দুটি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নিজে। অথচ সাধারণ আর্ত মানুষের ক্ষেত্রে তাঁর কাছে আসার জন্য সময়-অসময় বলে কিছু ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল, তিনি যে মানুষকে শুধু আদর করতেন তাই না, দুষ্টপ্রকৃতির মানুষদের ভর্ৎসনা করতেও তাঁর এতটুকু দ্বিধা ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভর্ৎসিত মানুষদের দ্বারা তাঁর অখ্যাতি হত। কিন্তু তিনি সেটার পরোয়া করতেন না। গৌরী আইয়ুব জীবিতকালেই সত্যি সত্যিই খ্যাতি-অখ্যাতির ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন।

এরকম হওয়ার কারণ, নিজের জীবনে তিনি যা কিছু পেয়েছিলেন তাতেই পরিতৃপ্ত এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর কোনও অভাববোধ ছিল না। যে ধরনের স্বামী এবং সন্তান নিয়ে যে স্বপ্নের সংসার তিনি কামনা করেছিলেন, তেমন প্রাপ্তি তাঁর জীবনে সম্ভব হয়েছিল অনেকখানি তাঁর নিজের গুণে। আইয়ুবকে তিনি ভালবেসেছিলেন নিজের প্রাণের সবটুকু সুধা উজাড় করে দিয়ে। সেই মহান ভালবাসাকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করার যোগ্যতা আইয়ুবেরও কোনও অংশেই কম ছিল না। ভালবাসা তাই শতদল পদ্মের মতো তাঁদের জীবনে বিকশিত হয়েছিল অপার মহিমায়। ভালবাসার এই মহিমাই জীবনের আর সব ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকাকে মহিমান্বিত করে তোলার মূলে তাঁকে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছিল। এভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার কারণে এবং সচেতন অনুশীলনের ফলে অত্যন্ত উন্নতমানের রুচি-সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করত তাঁর প্রতিটি আচার-আচরণ। কোনও রকম ক্ষুদ্রস্বার্থবুদ্ধি তাঁর চিত্তকে স্পর্শ না করার কারণে যেসব মূল্যবোধকে তিনি অনায়াসে সারাজীবন লালন করে গেছেন, কেবলমাত্র সেই নিরিখে বিচার করলেও বোঝা যায় তিনি কতখানি বড় মাপের মানুষ ছিলেন। □

গৌরী আইয়ুব : এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

কামাল হোসেন

But the fountain sprang up and the bird sang down
Redeem the time, redeem the dream
The token of the world unheard, unspoken

—T.S.Eliot

পৃথিবীর অনেক ঋতুর জল-বায়ু, রৌদ্র-ছায়া অতিক্রম করে একটি স্বনির্মিত পথ ধরে তিনি হেঁটে আসছিলেন। স্মারক স্তম্ভে কোনও অমর অক্ষর লেখা হল কিনা, সেদিকে তাকানোর মতো অবকাশ কখনও পাননি। ঘরসংসার, কর্মজীবন, সাহিত্যচর্চা কিংবা সমাজসেবা — সব কিছুর অজস্র ব্যস্ততার সান্নিধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত ছুটি নিয়ে চলে গেলেন আমাদের গৌরীদি — গৌরী আইয়ুব।

আমরা, যারা গৌরীদির কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আমার ধারনা, আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করি, 'আমাকেই তিনি সব থেকে বেশি ভালবাসতেন।' আসলে তাঁর হৃদয়টি ছিল এত উদার, সকলের প্রতি সমানভাবে স্নেহ-ভালবাসা বিতরণে সেখানে কোনও কার্পণ্য ছিল না।

আমার সব সময় যেটা আশ্চর্য লেগেছে, যে-যেমন মানুষ, তার বুদ্ধিবৃত্তির সেই স্তরে দাঁড়িয়ে তিনি তার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলেছেন, মিশেছেন। ব্যক্তিত্বের এই ফ্রেকসিবিলিটি খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁর বন্ধু তালিকায় অন্নদা দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, শিবনারায়ণ রায়, আরতি সেনের মতো বুদ্ধিজীবীর দেখা যেমন আমরা পাই, তেমনই খুব সাধারণ

গৃহবধূ কিংবা গৃহপরিচারিকা মনার মাও তাঁর কাছে মনের সব সুখ-দুঃখের গল্প শুনিয়ে তৃপ্তি পেতেন। সকলের সঙ্গেই কথা বলার সময় মুখে উপস্থিত সেই পরিচিত মিষ্টি হাসি।আর তাঁর আতিথ্যের আন্তরিকতা থেকে দুই বাংলার কেউ কখনও বঞ্চিত হয়নি। একথা অবশ্যই বলা যায়।

গৌরীদির কথা স্মরণে এলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের সেই সব বহু বর্ণের ছটা আমাকে সম্মোহিত করে রাখে। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় অধ্যাপিকা, খ্যাতনামা সমাজসেবিকা। একসময় কলকাতার মুসলমান বস্তিগুলিতে মেয়েদের কাছে গিয়ে বুঝিয়েছেন জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকারিতা। 'জাতীয় সংহতি'র উপর ব্যাপক আলোচনার সূচনা করে একই মঞ্চে তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন বিতর্কিত শিখ বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে মার্কসবাদী শিক্ষাবিদকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তরুণ ছেলেরা যাতে ঠিক মতো তৈরি হয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগ দিতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের ব্যাপারেও তিনি সরাসরি সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। জরুরি অবস্থার সময় যে-কজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী স্বাধীন মনন আর আত্মা নিয়ে বাহুবলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভীত হননি, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে এসপ্ল্যানেড ইস্টে অসুস্থ হাঁটু নিয়ে লাঠি হাতে উপস্থিত থাকেন তিনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার নির্বাদ, নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদে বিপন্ন মানবতার পাশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একত্রিত করতে সবার আগে তিনি এগিয়ে এসেছেন।

অথচ এত কিছু কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে কোথাও নেই আত্মপ্রচারের উৎকট উৎসাহ কিংবা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীসুলভ ঔদ্ধাসিকতা। বস্তুত মনীষী দার্শনিক আবু সয়ীদ আইয়ুবের বিদুষী স্ত্রী হিসাবে তাঁর যত না পরিচিতি, নিজস্ব চারিত্রিক ঋজুতায় একালের বাঙালি সমাজজীবনে কিংবদন্তির মতো এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁকে আমরা চিনি।

জন্ম বিহারের পাটনা শহরে। ১৯৩১-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি। বাবা দর্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত। মা নিরুপমা দেবী। গঙ্গার কাছাকাছি পাটনার বাড়ির গল্প অনেকবার তাঁর কাছে শুনেছি।

১৯৪৭-এ বাঁকিপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। ১৯৪৮-এ মগধ মহিলা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট। পরের বছর পাটনা কলেজে ফিলসফিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। এসময় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন 'স্টুডেন্ট ফেডারেশন'-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। এই আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য বাঁকিপুর সেন্ট্রাল জেলে দু'দিন কারাবরণও করেন।

গান্ধীবাদী বাবা মেয়ের এই বামমার্গী আচরণ মোটেই মেনে নেন না। এই ঘটনার পরেই পাটনা কলেজে পড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেক সাধ্যসাধনার পর দুটি সুযোগ তিনি দেন। হয়, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, নাহলে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। খুব দ্রুত মনস্থির করে গৌরীদি সেদিন ভেবেছিলেন, 'Apolitical হলেও শান্তিনিকেতনেই বরং নিঃশ্বাস ফেলা যাবে।'

১৯৫০-এর জুন মাসে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে ভর্তি হলেন দর্শন বিভাগে। সে সময় অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুবও শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রীর বয়সের ব্যবধান ছিল। তবু কোন অদৃশ্য রসায়নে দুজন মানব-মানবীর মন কাছাকাছি এসে যায়, তার সব রহস্যের সমাধান বোধকরি ঈশ্বরেরও জানা নেই। তাঁদের প্রেমের গভীরতা জীবিতকালেই মিথ-এর সৃষ্টি করেছিল।

এক বছরের মধ্যেই অসুস্থ আইয়ুব বিশ্বভারতী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৫২ সালে গৌরীদি বি.এ. পাশ করলেন। ১৯৫৩ সালে বিনয় ভবন থেকে বি.টি. ইতিমধ্যে আইয়ুবের সঙ্গে কন্যার সম্পর্কের কথা পিতার কানে পৌঁছেছে। সেজন্য তিনি চাইছিলেন না মেয়ে কলকাতায় এম. এ. পড়তে আসুক। পরিবর্তে মেয়েকে ইংল্যান্ড পাঠাতে চেয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার জন্য।

বিদেশে না গিয়ে ১৯৫৪ সালে আসানসোলের কাছে উষাগ্রামে মেথডিস্ট মিশন স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিলেন। সেখান থেকে কলকাতায় আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ হত। প্রায় প্রতি শনিবার রাত ন'টা সাড়ে ন'টার ট্রেনে তিনি চাপতেন। ভোরবেলায় ট্রেন এসে পৌঁছত হাওড়া স্টেশনে। তারপর ট্রাম ধরে ৫ নম্বর পার্ল রোডে আইয়ুবের কাছে। সারাদিন কাটিয়ে বিকালে আবার হাওড়া স্টেশন।

ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এডুকেশন' বিষয়ে এম.এ. পড়বেন ঠিক করলেন। সাড়ে তিন মাসের মধ্যে উষাগ্রামের চাকরি ছেড়ে পিতার মতকে অগ্রাহ্য করে তিনি কলকাতায় চলে এলেন। এসময় ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আইয়ুব ছিলেন রকফেলার ফাউন্ডেশনের ফেলো। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল: Marxist Theory of Value।

বস্তুত সে সময় গৌরীদির ইউনিভার্সিটির মাইনে, হসটেলের খরচ এবং হাত খরচের মতো আর্থিক দায়িত্ব আইয়ুবই পালন করেছিলেন।

১৯৫৫ সালে এম.এ. পাশ করার পর সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুলে চাকরি। গৌরীদির ভাষায়, " এরপর বিবাহ সম্বন্ধে আইয়ুবের দ্বিধা অনেকটা কেটে গেল। আমি ততদিনে এম.এ., বি.টি.

পাশ করা পঁচিশ বছরের একটি সাবালিকা। এবং চাকরি করে স্বনির্ভর হয়েছি। সুতরাং নাবালিকাকে ফুসলাবার অভিযোগ নিশ্চয়ই ধোপে টিকবে না, এই ছিল আইয়ুবের ভরসা। অতএব সেবার মার্চ মাসে বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতনে গিয়ে ঘনিষ্ঠ দু-চারজন বন্ধুকে জানিয়ে এলাম যে এবার আমরা বিয়ে করছি।"

১৯৫৬ সালের জুন মাসে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল ৫, পার্ল রোডের বাড়িতে। ভাসুর প্রখ্যাত সি পি আই নেতা ডা. এ.এম.ও. গনির বসার ঘরে বিবাহের আসর সাজানো হয়েছিল। বিবাহে সাক্ষী দিলেন ডা. গনি, ভাইঝি মীরা বালসুব্রহ্মণ্যম ও আত্মীয় খ্যাতনামা সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ)। উপস্থিত ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আরতি সেন।

সে বছরই আইয়ুবের রকফেলার ফাউন্ডেশনের ফেলোশিপের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। এই বৃত্তির সাহায্যে মার্কসবাদ বিষয়ে যে কাজ করছিলেন, তা আর শেষ করে উঠতে পারেননি। এ কাজটি এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে, তবে গৌরীদির মুখে শুনেছি, যেসব পণ্ডিতব্যক্তি এই লেখাগুলি পড়েছেন, তাঁদের মনে হয়েছে, অসমাপ্ত থাকলেও এগুলি প্রকাশ করা উচিত, কারণ এতে মৌলিক বক্তব্য যথেষ্টই রয়েছে।

১৯৫৭ সালে পুত্র পৃষনের জন্ম হয়। ৫৮ সালে আইয়ুব 'Quest' নামে ত্রৈমাসিকের দায়িত্ব নেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন অন্নান দত্ত। 'Congress for Cultural Freedom'-এর ভারতীয় শাখার মুখপত্র ছিল এই পত্রিকাটি। পত্রিকার motto ধার করে নিলেন তাঁর প্রিয় দার্শনিক Whitehead-এর কাছ থেকে। পত্রিকার প্রচ্ছদে শিরোনামের পাশে লেখা হল 'An Adventure of Ideas.'

আইয়ুবের সম্পাদনায় 'Quest' বেরিয়েছিল ১৯৫৮ থেকে ৬৭ পর্যন্ত। মাঝে ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতচর্চা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে আইয়ুব গিয়েছিলেন। সঙ্গে গৌরীদি ও পৃষন। বিভাগ প্রতিষ্ঠার এক বছর পরই আবার অসুস্থতার জন্য চলে আসতে হয়। মেলবোর্নের গল্প করার সময় একটি সন্ধ্যার কথা গৌরীদির মুখে শুনেছি। বিকালবেলা একটি চ্যাপেলের পাশ দিয়ে পুত্রের হাত ধরে হেঁটে হেঁটে আসতেন। ধীরে ধীরে শান্তভাবে সন্ধ্যা নামত। ঘরে অসুস্থ স্বামী অপেক্ষায় শুয়ে আছেন। এক নিবিড় আবছায়া অন্ধকারে মাতা ও পুত্রের দ্রুত পথ হাঁটার মধ্যে ধ্বনিত হত প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসার নিশ্চিন্ত আশ্বাস।

এমনই করে কাটছিল দিন। ইতিমধ্যে যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতার পর গৌরীদি ১৯৬৩ সালের ২২ জুলাই যোগ দিলেন শ্রীশিক্ষায়তন কলেজের 'শিক্ষা' বিভাগে। কর্মজীবনের শেষ দিকে ১৯৯১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এখান থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনের পাশাপাশি বিশালভাবে ছড়ানো ছিল তাঁর সামাজিক জীবন। ১৯৬৪ সালে কলকাতায় দাঙ্গার সময় মেত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন। হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক, সম্প্রীতির সদিচ্ছা আনার জন্য তিনি সারাজীবন কাজ করেছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ যদি রাজনীতির মানুষদের ফাঁদে পা না দিয়ে খোলা মনে পরস্পরের কাছে আসে, পরস্পরের সুখ-দুঃখ সহজ ভাষায় পরস্পরের কাছে বলে, নিজেদের জন্মলব্ধ ধর্মীয় পরিচয়ের আবরণটি সরিয়ে 'মানুষ' হিসাবে পরস্পরকে চিহ্নিত করতে পারে, তাহলে কোনও রকম সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, বিদ্বেষ বা হানাহানি হতেই পারে না। এখানে উল্লেখযোগ্য, 'কাউনসিল ফর প্রোমোশন অব কমিউনাল হ্যারমোনি'র তিনি ছিলেন আমৃত্যু চেয়ারপারসন।

এদেশের সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের অস্তিত্বের সংকট ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে বহুবার আলোচনা হয়েছে। আমার ধারণা, এটা ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। পৃথিবীর সব দেশেই সংখ্যালঘুরা একটা আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভোগে। একটা হীনম্মন্যতার কৃষ্ণছায়া সব সময় তাকে আক্রমণ তাড়া করে ফেরে। তার জন্য অনেক সময় কিছু সংখ্যালঘু লেখক ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যায়, নিজের সম্প্রদায়কে সাংঘাতিকভাবে ঘৃণা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিকৃষ্ট ও বর্বর ভাবে দেখাতে পারলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃতি, পুরস্কার ও হাততালি খুব সহজেই পাওয়া সম্ভব। এখন যেহেতু সংখ্যাগুরু সমাজের কোনও ধারণাই নেই সংখ্যালঘুদের অন্দরমহল সম্পর্কে, তাঁরা সরল মনেই বিশ্বাস করেন, এই সব বর্বরদের মধ্যে তবু আলো দেখানোর জন্য একজন রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর জন্ম নিয়েছে, এরকম 'সাহসী' লোককে প্রোটেকশন দেওয়া দরকার, প্রতিষ্ঠার স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছে দেওয়া দরকার, তাহলে আরও কিছু রামমোহন-বিদ্যাসাগর সমাজটাতে জন্ম নেবে, উৎসাহিত হবে।

আসলে পৃথিবীর সবত্রই সংখ্যালঘু সমাজের কিছু উচ্চাভিলাষী মানুষ এই একই ফর্মুলায় 'লড়ে যায়,' গৌরীদি এইসব কাজ-কারবারের মধ্যে বৈপরীত্য নিয়ে খুব কৌতুক অনুভব করতেন। তাঁর পরিচিত এক তথাকথিত আগুনছোটানো মুসলিম প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী একবার কনিষ্ঠ সহোদরের প্রেমজ বিয়ের সময়, পাত্রীটিকে রীতিমতো মৌলবি ডেকে ধর্মান্তরিত করে, নাম পরিবর্তন করে, মুসলমানী কায়দায় বিবাহের ব্যবস্থা করেন। গৌরীদির অনুত্তপ্ত ছিল, ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর ঘরেই, চোখের সামনেই, কারণ মেয়েটি বাপের বাড়ি ত্যাগ করার পর তাঁর কাছেই তাকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাত্রপক্ষের নাকি ভয় ছিল, মেয়ের পিতা যদি কোনও

আইনি পদক্ষেপ নেন, তাহলে ধর্মান্তরিত মেয়েকে ঘরে ফেরাতে তাঁরা পারবেন না।

গৌরীদি হাসতে হাসতে এই সব তথাকথিত প্রগতিশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবীর ঘরে ও বাইরে দুই রকম ব্যক্তিত্বের গল্প শোনাবার সময় বলতেন, 'ভাবো তো, কী সাংঘাতিক পরিশ্রমের কাজকর্ম ওদের করতে হয়! সব সময় ক্যালকুলেশন করে যাও, কীভাবে নিজের সম্প্রদায়কে কদর্যভাবে দেখাতে পারলে সংখ্যাগুরুর গুড বুকে থাকা যাবে। আসলে সমস্যা হচ্ছে, এরা ছেলেবেলা থেকে সংখ্যাগুরুর সঙ্গে খোলামেলা মেশে না বলেই, এরকম সহজ সমীকরণের হিসাবে অঙ্ক কষে মেলামেশা করে। আপাতদৃষ্টিতে এরা যত সফলই হোক, একদিন এদের ফাঁকি সংখ্যাগুরুর চোখেও ধরা পড়ে যায়, আর নিজের সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও এরা যেহেতু অনেক দূরে সরে আসে, তাই শেষ পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড একাকিত্বের মধ্যে এদের শেষ জীবনটা কাটতে বাধ্য।'

তিনি সব সময় চাইতেন, সংখ্যালঘুদের নিজেদের পরিশ্রম করে, প্রতিযোগিতায় নেমে প্রাপ্য সুবিধা আদায় করতে হবে। সেটা অনেক সম্মানের। বলতেন, 'ডমিন্যান্ট মাইনরিটি' হও। নিজের যোগ্যতা দিয়ে মানুষের মন জয় করো। একজন মকবুল ফিদা হুসেন, দিলীপকুমার, বড়ে গুলাম কিংবা আমজাদ আলি খানের ভক্তদের মনে কখনওই এ চিন্তা আসে না, এঁদের জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মপরিচয় কী!'

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজের নবীন প্রজন্মের চিন্তাভাবনায় মুক্তমনের সঞ্চার করেছিলেন গৌরীদি।

এই বিশাল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান নেত্রী তিনিই। স্বাধীনতার পরে যে নতুন প্রজন্ম জন্ম নিয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সেই সব তরুণদের মা ছিলেন তিনি। কাজী আবদুল ওদুদের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ছিল তাঁর খুব প্রিয় বিষয়। 'Emancipation of the Intellect' বাক্যটি বার বার উচ্চারণ করতেন। তাঁর কাছে সকলেই ছুটে আসত। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, পুরুলিয়া থেকে সুন্দরবন কত জনের কত রকম প্রয়োজন। চেষ্টা করতেন সঠিক যোগাযোগের সূত্র ধরিয়ে দিয়ে তাদের উপকার করার। আর চেষ্টা করতেন একজন সমাজবিজ্ঞানী ও মনোসমীক্ষকের ভূমিকায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে। কোনও রকম সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প যাতে তাদের আচ্ছন্ন না করতে পারে, সে ব্যাপারেও সহানুভূতির সঙ্গে তাদের ক্ষোভ, ব্যথা, যন্ত্রণার অংশীদার হবার চেষ্টা করেছেন। পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজের গভীরে তাঁর এই বিশাল বৈপ্লবিক ভূমিকা গত চল্লিশ বছরে যে নিবিড়ভাবে যথার্থ তৃণমূলে কাজ করে গেছে, তার প্রকৃত মূল্যায়ন একদিন কোনও সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণাপত্রে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

বিচারপতি মাসুদ একবার চেষ্টা করেছিলেন সংখ্যালঘু তরুণদের সঠিকমতো প্রশিক্ষণ ও গাইড দান করতে, যাতে তারা প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। গৌরীদি এই কার্যক্রমে নিজেকে জড়িয়েছিলেন। অনেকদিন ধরে কিছু ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে এসে বিশেষ করে ইংরাজি শিক্ষার পাঠ নিয়ে যেত।

শাহবানু মামলা নিয়ে মুসলিম গণমানসে সে সময়ে চলছে দারুণ বিতর্ক। মৈত্রেয়ীদি তখন জীবিত ছিলেন। প্রথমে গৌরীদির বসার ঘরেই কয়েকটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বেশ তর্ক-বিতর্ক হল। এই সব আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি সংখ্যালঘু—'সাইকি' বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। 'আইডেনটিটি ক্রাইসিসে'র কোন ঘূর্ণিপাকে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে, খুব সহানুভূতির সঙ্গে সেই সব বাধা, অপমান ও যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। এরপর ভারতীয় ভাষা পরিষদে একটি বড় আকারে আলোচনা সভার আয়োজন করলেন। মুক্তবুদ্ধির মানুষদের উপস্থিতিতে সভাগৃহ উপচে পড়েছিল।

একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' গ্রন্থটি নিয়ে যখন হইচই হচ্ছিল। বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল, অপ্রগতিশীল সকল বুদ্ধিজীবীরা রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন 'লেখকের স্বাধীনতা'র সপক্ষে। অবশ্যই এ ক্রোধ ন্যায্য কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, বইটি কেউ নিজে পড়ে দেখেননি। পড়লেও সমস্যা ছিল, পাঠককে অবশ্যই ইসলামিক মিথ ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে কিছুটা জানতে হবে, না হলে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বোঝা সম্ভব নয়, রুশদি খুব সুচতুরভাবে কোথায় মুসলিম বিশ্বাসকে আঘাত করেছিলেন, অপমান করেছিলেন। সে সময় আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অভীক সরকার মূল গ্রন্থটি পড়তে দেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে। সিরাজ শুধু একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকই নন, ইসলামিক মিথ ও ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এদেশে তিনিই একমাত্র লেখক, যিনি 'সাম্প্রদায়িক' শিরোপা পাবার ঝুঁকি নিয়েও রুশদির 'শয়তানী' কাজকর্ম নগ্নভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও সেসব লেখার সঙ্গে তাঁকে বার বার উল্লেখ করতে হত যে ব্যক্তিগতভাবে কোনও ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নেই। গৌরীদি সে সময় এক শনিবার বিকালে সিরাজকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর ঘরের ঘরোয়া বৈঠকে মূল বইটির আপত্তিকর অংশগুলি পাঠ করে ব্যাখ্যা করতে কেন তা মুসলিম মানসকে অপমানিত করছে। সেদিনও গৌরীদির ঘর উপচে পড়েছিল উৎসাহী শ্রোতার উপস্থিতিতে। গৌরীদি নিজেও এ বিষয়ে একটি যুক্তিসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছিলেন চতুরঙ্গে।

হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের অসম্পূর্ণ পরিচয়ের সূত্রে যেসব ভুল বোঝাবুঝি পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রাখে, সে বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'কাবিননামহ্‌ থেকে বসুধারা' ১৯৮৪-এর

সেপ্টেম্বর সংখ্যা চতুরঙ্গ-এ প্রকাশিত হয়েছিল। কবি আল মাহমুদের কিছু অভিমানমাখা বক্তব্য-সূত্রেই খুব বিস্তৃতভাবে বিষয়টি আলোচনা করেছিলেন গৌরীদি। অন্তরের গভীর থেকে চাইতেন, বঙ্গভাষাভাষী একই ভূখণ্ডের দুটি ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি এসে পরস্পরকে চিনুক, পরস্পরের মুখের ভাষায় পরিচিত হোক, পরস্পরকে ভালবাসুক, শ্রদ্ধা করুক, বিশ্বাস করুক। এতদিনের জমা হওয়া সমস্ত গ্লানি, অভিমান, ক্লেদ, ক্রোধ ধুয়ে মুছে যাক ভালবাসার বৃষ্টির জলে স্নান করে।

১৯৮৮-তে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মশতবর্ষে কলকাতায় কোনও সাড়াশব্দ ছিল না। গৌরীদি প্রায় একক প্রচেষ্টায় তাঁর সহমর্মীদের সঙ্গী করে এলগিন রোডের বৈতানিক ভবনে এই শতবর্ষ অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করেছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম থেকেই তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। কখনও মৈত্রেয়ীদির সঙ্গে ওপার থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সেবায় হাত বাড়িয়েছেন, কখনও বর্ডার পেরিয়ে চলে গেছেন যুদ্ধের ফ্রন্টে। মুক্তিযুদ্ধের বড় বড় নেতাদের নিয়মিত আনাগোনা ছিল ৫, পার্ল রোডে আইয়ুবদের ফ্ল্যাটে।

এবছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে যেসব ভারতীয় সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সংবর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করেছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন। অসুস্থ গৌরীদি ওই অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর পক্ষ থেকে সেখানে স্মারকফলক গ্রহণ করি আমি। এ ছিল আমার পরম সৌভাগ্যের মুহূর্ত।

বাংলাদেশ যুদ্ধের পর অনাথ শিশুদের জন্য মধ্যমগ্রামের বাদুর কাছে মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন 'খেলাঘর'। মৈত্রেয়ীদির মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠানের আমৃত্যু চেয়ারপারসন ছিলেন তিনি।

হাজার রকম দায়িত্ব পালনের নিয়মিত ব্যস্ততার আড়ালে ঢাকা পড়ে যেত তাঁর লেখক-অস্তিত্ব। অনেকেরই মনে থাকে না, কী অসামান্য সাবলীল গদ্য প্রাণ পায় তাঁর কলমে। আসলে খুব কম লিখতেন তিনি। কিন্তু যখন লিখতেন, বিষয় আর উপস্থাপনার মৌলিকত্বে পাঠক হিসাবে রীতিমতো অবাক হয়ে যেতে হত।

প্রধানত আইয়ুবের উৎসাহে তাঁর মৌলিক রচনা শুরু। তাঁর বিভিন্ন গল্প বিভিন্ন সময়ে দেশ, আনন্দবাজার, যুগান্তর, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ, অনুক্ত, নবজাতক, সখীসংবাদ, সাপ্তাহিক বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮৬-তে তাঁর পনেরোটি গল্প নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন দে'জ। তাঁর স্বভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে গৌরীদি খুব বিনয়ের সঙ্গে তাঁর গল্প সংকলনের নাম দিয়েছিলেন 'তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ'। তুচ্ছ কিন্তু তুচ্ছ নয়। মানবসংসারের বিচিত্র গলিপথের গোলকধাঁধা থেকে যেসব টুকরো-টুকরো মণিমাণিক্য সংগ্রহ করে তিনি গল্প লিখেছেন, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের এই খরার মরশুমে সত্যি-সত্যিই সেগুলি এক একটি অসামান্য রচনা।

বস্তুত এই গল্পগুলি যেন বাঙালি জীবনের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার টানাপোড়েনের ক্রস-সেকশন। বাঙালি মানে সামগ্রিক হিন্দু-মুসলমানের অস্তিত্বমাখা জনজীবন। বহুতল বাড়ির উচ্চবিত্ত থেকে বস্তির খুপরি পর্যন্ত। সমাজ আর সংসারের বাহির-মহল থেকে কোন রহস্যময় অন্দরমহল পর্যন্ত না তিনি ঘুরে এসেছেন!

আইয়ুবের 'গালিবের গজল থেকে' ও 'মীরের গজল থেকে' শীর্ষক অনুবাদ গ্রন্থদুটিতে গৌরীদির লেখা গালিবের ও মীরের যে জীবনীদুটি যুক্ত আছে, বাংলা ভাষায় গালিবের ও মীরের অত ভাল তথ্যনিষ্ঠ জীবনী আর আমার চোখে পড়েনি।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, স্যুভেনির, সংকলনে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ, গল্প ছড়িয়ে আছে। সেগুলি সংগ্রহ করে সংকলন প্রকাশ করা দরকার। গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের একটি মূল্যবান ভূমিকা তিনি লিখেছেন।

অনুবাদ করেছেন মাৎসুও বাশোউ নামক জাপানি লেখকের 'দূর প্রদেশের সংকীর্ণ পথ'-এর কাহিনী, যে পথে বাশোউ ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন ১৬৮৯ সালে। আর এক জাপানি মহিলা কোউকো নিওয়ার সঙ্গে যৌথভাবে মূল জাপানি থেকে এই অনুবাদকর্মটি সম্পন্ন করেন। বাঙালি পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এক অসাধারণ গ্রন্থের।

শেষ বয়সে নাতনি শ্রেয়া অহনার সঙ্গে গল্প করতে করতে লিখেছিলেন আশ্চর্য শিশুসাহিত্য 'এই যে অহনা'। ইচ্ছে ছিল, এক গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে নাতনিকে নিয়ে যাবেন, তার সঙ্গে আম পাড়বেন, দিনরাত আড্ডা দেবেন, আর লিখে ফেলবেন এই বইটির দ্বিতীয় খণ্ড। অসুস্থতার জন্য সে সাধ আর পূর্ণ হল না।

আমার আইয়ুব ও গৌরীদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ১৯৭০ সালে। তখন আমি বহরমপুরে স্কুলের ছাত্র, নিছক একজন কিশোর। 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা'র অসাধারণ ভূমিকা পাঠ করে স্কুলের সেই ছাত্রটি আইয়ুবের গদ্যের সম্মোহনে তখন রীতিমতো মুগ্ধ। তারপর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' পড়ালেন আমার প্রিয় শিক্ষক ড. অলোক সেন (পরবর্তীকালে আকাশবাণী কলকাতার কমার্সিয়াল ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের স্টেশন ডিরেক্টর)। সবটা বুঝি আর না বুঝি এক নতুন পৃথিবীর সামনে সেই অর্বাচীন পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। সেই মুগ্ধতা ও খানিকটা ছেলেমানুষি মিশিয়ে প্রকাশকের ঠিকানায়

চিঠি দিলাম তাঁকে। কী আশ্চর্য, কিছুদিন বাদেই পোস্টকার্ড পেলাম সুদৃশ্য হস্তাক্ষরে। গৌরী আইয়ুবের লেখা সেই চিঠিতে জানতে পারলাম আইয়ুব অসুস্থ, কলকাতায় কখনও এলে যেন দেখ করতে আসি ৫, পার্ল রোডের দোতলায়।

কিছুকাল বাদেই কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে আসার সুবাদে গৌরীদি এবং আইয়ুবের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হল। তারপর কবে কীভাবে স্নেহ-ভালবাসার কোন রসধারায় এতখানি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল, তা এখনও আমার কাছে এক গভীর বিস্ময়।

ছাত্রজীবন থেকেই মাদার টেরিজার সেবাকেন্দ্রে আমি নিয়মিত যেতাম শুনে খুব উৎসাহ দিতেন। পরে পাশ করার পর ওঁদের দুটি সেবাকেন্দ্রের চিকিৎসার ভার নেওয়াতে আনন্দ পেয়েছিলেন। এর মধ্যে যশোর রোডে 'নির্মলা কেনেডি সেন্টার' তাঁর খেলাঘর-এর যাওয়ার পথে পড়ে। তাই একবার খেলাঘর-এর কয়েকজনকে নিয়ে ওখানে ভিতরে গিয়েছিলেন। আর দেখেওনে এসে বলেছিলেন, 'এসব অনাথ জড়বুদ্ধি মানসিক রোগী মেয়েদের এত সুন্দর চিকিৎসার ও সেবার ব্যবস্থা দেখলে মাদারের উপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।' মাদারকে কেউ অহেতুক সমালোচনা করলে খুব রেগে যেতেন। বলতেন, 'আগে নিঃস্বার্থভাবে একটা মানুষের সেবা করে তারপর সমালোচনা করো।'

আমাদের কবিতা পাঠের একটা প্রহর ছিল। বাংলা ইংরেজি সব ধরনের কবিতাই। ইংরেজি কবিতা পাঠের সময় ব্যাখ্যা করে অনুভূতির গভীরে নিয়ে যেতেন। অনেক ইংরেজি শব্দের সঠিক উচ্চারণ শুদ্ধ করে শিখিয়ে দিতেন। এখন ভাবলে মনে হয়, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেন হেঁটে এসেছি।

আমাদের খুব সুন্দর সময় ছিল গান শোনার। তাঁর ভাষায় 'মিউজিক্যাল সেশন'। টেপ রেকর্ডার ক্যাসেট বাজিয়ে। রবীন্দ্র সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল—সুরের ঝরনাধারায় তো স্নান করার কোনও নিয়মকানুন নেই। এখনও আমার কানে ভাসছে বাখ্-এর ব্রানডেনবার্গ কনচের্টো নাম্বার ফাইভ প্রায় দশ মিনিট ধরে টানা আমরা শুনে যাচ্ছি, গৌরীদির আধবোজা চোখ, চোখে মুখে স্বর্গীয় প্রশান্তি, এ-সব মুহূর্ত তো আমার মতো সামান্য মানুষের সারা জীবনের সম্পদ। অনেকেই জানেন না, আইয়ুবের প্রভাবে গৌরীদি পশ্চিমি ধ্রুপদী সঙ্গীতের একজন সত্যিকারের সমঝদার শ্রোতা ছিলেন।

আমার বেশিরভাগ লেখার প্রথম পাঠক ও সমালোচক ছিলেন গৌরীদি। একটি লেখা বার বার মাজা ঘষা করা, রি-রাইট করার অভ্যাস ওঁর প্রভাবেই আমার মধ্যে এসে গেছে সেটা বেশ বুঝতে পারি। বলতেন, 'তোমাকে নিজেকেই ঠিক করতে হবে, তুমি কোন পথে হাঁটবে। কিছু লেখক আছেন, যাঁরা খুব দ্রুত জনচিত্তজয়ী, দু-তিনশো বইয়ের লেখক, সকলেই তাঁদের নিয়ে মাতামাতি করে, অর্থ-সম্মান-যশ সব দিক দিয়েই তাঁরা খুব সফল মানুষ। এঁদের লোকে ধন্য ধন্য করে। একদিক দিয়ে এই জীবনেই নগদ বিদায় তাঁরা পেয়ে যান। আর এক ধারার লেখক আছেন, যাঁরা জনপ্রিয়তার ধার ধারেন না। কিছু সিরিয়াস পাঠক, সমালোচক তাঁদের মূল্যায়ন করেন। অনেক সময় জীবিত অবস্থায় সঠিক স্বীকৃতিও জোটে না। এই সব লেখকরা মোহহীন। তাঁদের লেখায় থাকে জীবন সম্পর্ক একটা অনুসন্ধান, অন্বেষণ। লেখার ফর্ম নিয়েও তাঁরা দুঃসাহসী ভঙ্গিতে অনেক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেন, যা সাহিত্যকে করে বেগবান, শুদ্ধ। এই লেখকদের পথ অনেক বন্ধুর, অনেক যন্ত্রণার কাঁটা বেছানো। তবে কোয়ানটিটি নয়, কোয়ালিটিই শেষ পর্যন্ত কালের দরবারে বেঁচে থাকে, এ কথা নতুন করে বলার দরকার নেই। এ চিরকালের সত্য।' বিভিন্ন লেখায় তাঁর ছোটখাটো সাজেশান ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত দেখেছি লেখাটার মাত্রা অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে।

১৯৮৬ সালে যুগান্তর আয়োজিত বাংলার বাতায়ন ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভের পর তাঁর ঘরে প্রিয়জনদের মাঝখানে আমাকে সংবর্ধনা দেন। গৌরকিশোর ঘোষ, আবদুর রউফ, ডা. ওয়ালি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। আমি গল্পটি পাঠ করি। প্রচুর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করেছিলেন সেই সন্ধ্যায়।

কিছু দিন আগে দেশের একজন বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক একটি হিন্দি কাহিনীচিত্র নির্মাণের জন্য আমার একটি গল্পের ফিল্মরাইট কিনে নেন। খবরটি শোনার পর থেকে গৌরীদি ছেলেমানুষের মতো প্রায় বলতেন, 'প্রিমিয়ার শো'য়ে আমরা সকলে দলবল বেঁধে যাব সিনেমাটা দেখতে।' গৌরীদির আশা পূর্ণ হল না, সেই খেদ আমার সারাজীবন রয়ে যাবে।

সন্তান জন্মের পর থেকেই তিনি রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর বাবারও এই রোগ ছিল। চিরকালই এই রোগে গৌরীদি কষ্ট পেয়েছেন। মাঝে মাঝে লাঠিরও ব্যবহার করতেন। গত বছর থেকে সেই কষ্ট বেড়ে গিয়েছিল সাংঘাতিকভাবে।

১৯৮২ সালের ২১ ডিসেম্বর আইয়ুব চলে যাওয়ার পর বেশ একা হয়ে গিয়েছিলেন। স্বপ্ন ছিল আইয়ুবের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখবেন। এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিভাজনকে কেন্দ্র করে সব ধর্মের সাধারণ মানুষের জীবনে যে উথাল-পাথাল দেখা দিয়েছিল, এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একটি উপন্যাস লেখারও ইচ্ছে ছিল। হাজার রকম সামাজিক দায়িত্ব ও জীবিকার তাগিদে নিজস্ব সময় খুব কমই পেতেন। অবসর নেওয়ার পর যখন সময় পেলেন তখন অসুস্থতা বেড়ে গেল।

জীবনের শেষ দিনগুলিতে অনুলেখক হিসাবে তাঁর ডিক্টেশনে

লিখেছিলাম অসামান্য স্মৃতিকথা 'সৈয়দ মুজতবা আলী বন্ধু বরেষু'—চতুরঙ্গে কিছুদিন আগে ছাপা হয়েছে।

তারপর শুরু করেছিলাম অনুলিখনে 'আমাদের দু'জনের কথা'। আমার জীবনের এক মহামূল্যবান সম্পদ এই স্মৃতিকথাটি রচনা করার অভিজ্ঞতা। একটি ঘটনার পেছনে আরও কত ঘটনা, একই ব্যক্তিচরিত্রের আরও কত বিচিত্র রূপ, একটি স্মৃতি ছুঁয়ে কত নানা রঙের স্মৃতির পথে তিনি যেভাবে আমাকে হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন, সারা জীবনেও তা ভুলবার নয়। হয়ত কোনওদিন আমার এই অনুলেখক-পর্বের অভিজ্ঞতা দিয়েই রচনা করতে পারি এক বিস্ময়কর অনুভূতিমালার পুনর্নির্মাণের রূপকথাময় ইতিবৃত্ত।

তিনি মুখে বলে যেতেন, লংহ্যান্ডে আমি লিখে যেতাম। বার বার পড়ে শোনাতে বলতেন। সব সময় পরিমার্জনা চলত। চিরকাল নিজের লেখার ব্যাপারে যিনি ছিলেন প্রচণ্ড খুঁতখুতে এবং বার বার পরিমার্জনায় ও পুনর্লিখনে নিরন্তর পরিশ্রমী, এ ভাবে মুখে বলে নির্দেশ দিয়ে মনেরমতো কাজটি ফুটিয়ে তুলতে তাঁর কতখানি মানসিক পরিশ্রম হত, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমি সাধারণত রাত্রে চেম্বার শেষ করে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি অপেক্ষায় শুয়ে থাকতেন, কখন আমি যাব, কাজ শুরু হবে। সকলকে বলতেন, 'কামাল যতক্ষণ থাকে, আমি রোগের যন্ত্রণা সব তখন ভুলে যাই। কীভাবে যে এই দু-তিন ঘণ্টা সময় কেটে যায় বুঝতেই পারি না।' আসলে তাঁর ব্যাপিত জীবনের মাধুর্য এতটাই বেশি ছিল যে সেই জীবনের স্মৃতিচারণেও তিনি অনাবিল আনন্দে ডুবে যেতেন। ফলে রোগযন্ত্রণার কথা তাঁর মনেই থাকত না।

মূল পাণ্ডুলিপির প্রথম দিকের সামান্য অংশ কপি করানো হয়েছে। বাকি অংশটুকু তাঁর মনের মতো পরিমার্জনা করে আমাকে প্রস্তুত করতে হবে। গৌরীদির আশীর্বাদে এই পরম দায়িত্ব নিশ্চয়ই যথাযোগ্যভাবে পালন করতে পারব।

কত সামান্য ব্যাপারেও তাঁর স্নেহ মমতাময় দৃষ্টি থাকত! পরিচারিকা মনার বিয়ে নিজের কন্যার মতো রীতিমতো ধুমধাম করে দিয়েছিলেন। যোধপুর পার্কের একটি নারী সেবা সংঘের এক অনাথ মুসলিম মেয়ের পাত্রও তিনি জোগাড় করেছিলেন। তাদের বিয়েতেও যথেষ্ট হইচই খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। এরকম অসহায় মানুষদের সাহায্য করার আরও কত যে ঘটনা আছে, বলেও শেষ করা যাবে না।

ঈশ্বর কিংবা কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উপর তাঁর কোনও বিশ্বাস ছিল না। স্কুল-কলেজ জীবন থেকেই 'রিলিজিয়নে'র ঘরে কাটাকুটি চিহ্ন দিয়ে এসেছেন। তিনি ছিলেন চূড়ান্তভাবে মানবতাবাদী, নিজের 'মানব' পরিচয়ের উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল। তাই মৃত্যুর পর তাঁর দেহ নিয়ে যাতে কোনও ধর্মীয় শেষকৃত্য অনুষ্ঠান না হয়, সেজন্য মেডিকেল শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিজের দেহদানের অঙ্গীকারপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন ১৯৮৮ সালের ৯ জানুয়ারি। একই সঙ্গে 'আই ব্যাঙ্কে'র জন্য চক্ষুদানের স্বীকৃতি। সুখের কথা, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগেই তাঁর মৃতদেহ সসম্মানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৮-এর ১৩ জুলাই ভোর ৪-৫৫ মিনিটে তিনি চলে গেলেন। মৃত্যুর আগে শেষ দু'টি ঘণ্টা তাঁর বিছানার পাশে বসে ছিলাম আমি আর তাঁর ছোট বোন মনীষাদি। মৃত্যু কত শান্ত, সুন্দর ও ধীর গতিতে মানুষের অস্তিত্বকে মহাশূন্যতার অন্ধকারে বিলীন করে দেয়, এ দুর্লভ ঘটনার সাক্ষী থাকাও এক বিরল অভিজ্ঞতা।

গৌরীদির প্রিয় একটি বাণী ছিল, পালি ভাষায় —'সে করোহি দীপম্ অত্তনা।' আনন্দকে বুদ্ধ বলেছেন, 'নিজেকে একটি দীপের মতো করো'।

সারাটা জীবন ধরে গৌরীদির ব্যক্তিত্বের আলো সেই একক সাধনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। □